গোধূলিয়া

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

এস. দাস এণ্ড কোং
৩৭/৬ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : শুভ অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৬৪

প্রকাশক :
এস. দাস
৩৭/৬ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
রাজেন চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
জে. মাইতি
লিপিমুদ্রণ
৫৮, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

গোধূলিয়া

এখনও কলকাতা যাবার পথে ডিলাক্স একসপ্রেস বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনে থামলেই নেমে পড়ি। না নেমে পারি না। কে যেন আমাকে জোর করে টেনে নামিয়ে নেয়। দু-একবার ভেবেছি, নামব না; সোজা কলকাতা চলে যাই। চেয়ার কার-এ বসে জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে থেকেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিনি। তাড়াতাড়ি স্যুটকেস নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে নেমেছি। নামতেই হয়েছে।

ডিলাক্স একসপ্রেসে চড়ে কলকাতা যাবার পথেই শুধু নয়, দূর থেকেও কাশী আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই তার নিমন্ত্রণ আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না। আমাকে যেতেই হয়। বরাবর। আগেও গিয়েছি, এখনও যাই। কারণ অবশ্য এক নয়। কাজ-কর্ম, দায়িত্ব-কর্তব্যের ফাঁকে অবসন্ন মন একটু মুক্তি পেলেই ভাবি, যাই, দু-চার দিনের জন্য ঘুরে আসি। সত্যি সত্যি যখন সুযোগ পাই, তখন এক মুহূর্তও দেরী করি না। ছোট একটা স্যুটকেসে সামান্য কিছু জামা-কাপড় ভরেই ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশনে ছুটি, টিকিট কাটি, ট্রেনে চড়ি। মনে মনে বলি, তুলসীদাস তুমি ঠিকই বলেছ 'আনন্দ বন গিরিজা পতি নগরী মন কাহে নাহি বাস লগাবত রে'। এই পৃথিবীর কত আনন্দপুরীই ত দেখলাম কিন্তু, কাশী সমান নাহি দ্বিতীয় পুরী। তা না হলে আমার মত অভাগা অপদার্থকে বারবার ছুটতে হয়?

কাশীরাজের তিন কন্যাকে নিয়ে ভীষ্মের পালিয়ে যাবার কাহিনী বা রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প শোনার আগেও কাশীর কথা শুনেছি। তবে ঠাকুমার কোলে বসে বা মার আদর খেতে খেতে নয়, শুনেছি আত্মীয় পরিজনদের ফিস-ফিস আলোচনায়। ছোটবেলায় আমাকে ওরা দেখলেই কি যেন আলোচনা করতেন। কিছুই বুঝতাম না! আস্তে আস্তে বুঝলাম কাশীতে কিছু ঘটেছে। আরো বড় হবার পর জানলাম আমার অতি শৈশবে বাবা বিশ্বনাথ হঠাৎ টিকিট কেটে আবার মাতৃদেবীকে ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অতি দূর সম্পর্কের পিসী-মাসীরা বলতেন, অমন ভাগ্যবতী পুণ্যবতী না হলে কী বাবা তাকে নিজের পায়ে স্থান দেন? এই কাহিনী শোনার পর আমি বুঝলাম, নেশাখোর মানুষ-দের মত নেশাখোর দেবতাদের বিচারবুদ্ধির উপরও আস্থা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আরো একটু বড় হবার পর শুনলাম, আমার পিতৃকুলের আরো কয়েকজন কাশীতে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওপারে যাবার রিজার্ভেশন পেয়েছিলেন! কাশী যাওয়া সম্পর্কে আমাদের পরিবারের নানাজনের নিস্পৃহতা যত দেখেছি, আমার আগ্রহ তত বেশী হয়েছে। তখন বুঝি নি আমি কাশী গেলেই ওপারে যাবার টিকিট না পেলেও বাবা বিশ্বনাথ আমাকে

একেবারে বঞ্চিত করবেন না। এই বিশ্বচরাচরের অনেক রহস্যই মানুষ জেনেছে ও জানবে, কিন্তু বোধকরি মানুষ কোনকালেই তার নিজের মনের রহস্য জানতে পারবে না। ভেবেই পাই না কি করে বাঙালীটোলার অত অলিগলি পার হয়ে ওখানে হাজির হলাম।

এই পৃথিবীতে এসে ঘুম ভাঙার প্রায় পর পরই দেখলাম, মা নেই। আরো একটু বেলা হলে দেখলাম, ঘর খালি। চড়ুই পাখীর মত কখনও এখানে, কখনও ওখানে, কখনো মাসী, কখনো বা দূর সম্পর্কের অন্য কোন উদার আত্মীয়ের কৃপায় নানা জায়গায় উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াবার পর একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমি নাকি শিক্ষিত। এবাব আমাকে নিজের পাখনায় ভর করে অপরিচিত সংসারের মহাকাশে ঘুরে বেড়াতে হবে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। আপনজন কাছে না পেলেও কোন দিনই একা ছিলাম না। এবার সত্যি সত্যি অনুভব করলাম, আমি একা। নিঃসঙ্গ। এমন কী নির্বান্ধবও। বন্ধু হবে কেমন করে? পরিচয় একটু নিবিড় হবার আগেই ত আমার ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের চিঠি এসে গেছে স্কুলের অফিসে।

এক রবিবার সকালবেলায় পিতৃবন্ধু বীরেশ্বরবাবুর ঝামাপুকুরের বাসায় হাজির হতেই উনি বললেন, কাল রাত্রেই খেতে বসে তোর কাকিমাকে তোর কথা বলছিলাম।

এই এত বড় পৃথিবীতে আমার কথা আলোচনা করার মত লোক নিতান্তই বিরল। তাই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন কাকাবাবু?

চাকরি-বাকরি তো নিশ্চয়ই পাস নি?

না।

আমার উত্তর না দিলেও চলত। উনি আপন মনেই বললেন, এই ত কদিন আগে রেজাল্ট বেরুল। এর মধ্যে আর চাকরি পাবিই বা কেমন করে? কাকাবাবু হাতের খবরের কাগজখানা ভাল করে ভাঁজ করে পাশে রেখে ভিতরের দরজার দিকে মুখ করে একটু জোর করেই বললেন, শুনছ, প্রদীপ এসেছে।

ভিতর থেকে কাকিমা আরো জোরে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এসেছে?

প্রদীপ!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আঁচলে ভেজা হাত মুছতে মুছতে কাকিমা ঘরে ঢুকতেই আমি ওঁকে প্রণাম করলাম। উনি আমার মাথায় একবার হাত ছুঁইয়েই বললেন, সেই রেজাল্ট বেরুবার দিন প্রণাম করে যাবার পর আর ত তোর দেখা নেই।

একটু ব্যস্ত ছিলাম।

আমি কথাটা শেষ করার আগেই কাকিমা বললেন, কাল রাত্রেই উনি তোর কথা বলছিলেন।

শুনে খুশী হলাম। বললাম, কাকাবাবুও বলছিলেন।

পালাস না। খাওয়া-দাওয়া করে যাবি।

কাকিমা আর কোন কথা না বলে ভিতরে চলে যেতেই কাকাবাবু বললেন, চাকরি-বাকরি যদ্দিন পাচ্ছিস না ততদিন বরং দু-চারটে টিউশনি কর।

একটা টিউশনি অবশ্য পেয়েছি, তবে মাইনে বড় কম। সিক্স-সেভেনে দুটি ছেলের জন্য তিরিশ টাকা দেবে।

ওটা এখুনি ছাড়িস না। আমি তোর জন্যে একটা ভাল টিউশনিই ঠিক করে রেখেছি। ক্লাস এইটের ছেলে ; পঁচাত্তর টাকা করে দেবে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এ রকম দু-চারটে ছাত্র পেলে ত চাকরি করারই দরকার নেই।

এ আমার এক ছাত্রের ছেলে! বাড়ির অবস্থা খুবই ভাল।

এঁরা কোথায় থাকেন ?

ভবানীপুরে। কাকাবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে খুব জোরে এক টান দিয়ে বললেন, আমি অনেককেই বলে রেখেছি। আরো দু-একটা নিশ্চয়ই পেয়ে যাবি। তবে গরমের ছুটির আগে পেলেই ভাল।

পরের মাসের পয়লা তারিখ থেকে পঞ্চাশ টাকার আরো একটা টিউশনি জোগাড় করে দিলেন কাকাবাবু।

আমি হাতে প্রায় স্বর্গ পেলাম। বেশ আছি। দিনগুলি ভালই কাটছে। কোন কোন রবিবার ছবিঘরে সিনেমা দেখতেও যাচ্ছি। হঠাৎ একদিন কলেজ-ফেরত টুটুন আমার মেসে এসে পিসীর একটা চিঠি দিল, কাশী থেকে আমাদের সেজদি এসেছেন। সেজদির বয়স হয়েছে ; তারপর খুব অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছেন। একা একা যাতায়াত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তুই যদি সেজদিকে পৌঁছে দিস, তাহলে খুব ভাল হয়। উনি যাবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। টুটুনের পরীক্ষা এত কাছে না হলে ওকেই পাঠাতাম। তোর পিসেমশাই ত ছুটিই পাবেন না। তুই ত প্রাইভেটে ছাত্র পড়াস। তাই তোর ত ছুটি নেবার কোন ঝামেলা নেই।…

মনে মনে বললাম, তুমি আমার পিসী না হয়েও যখন কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিয়েছিল, তখন তোমার আদেশ আমি শিরোধার্য করবই কিন্তু ঐসব আজেবাজে অজুহাত দেবার প্রয়োজন ছিল কী ? টুটুনের পরীক্ষার এখনও তিন মাস বাকী। দু-চার দিনের জন্য বেনারস গেলে টুটুনের কোন ক্ষতি হত না। আসল কথা, বিধবা বুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে তার অপমান হবে বলেই সে যাচ্ছে না। আর ছুটি ? অফিসে চাকরি করলেই বরং ছুটি পাওয়া যায় কিন্তু আমার মত নতুন প্রাইভেট টিউটরের পক্ষে ছুটি চাওয়াই অন্যায়। আমি কোন ভূমিকা না করেই বললাম, টিকিট কাটা হলেই আমাকে খবর দিস। আমি ওঁকে পৌঁছে দেব।

আমার আশ্বাসে ও খুশী হয়ে হাসতে হাসতে বলল, আমি যেতে পারছি না বলে তুমি কেন বুড়ীর পয়সায় বেনারস ঘুরে আসবে না ? এই ফাঁকে তোমার বেনারস বেড়ান হয়ে যাবে।

আমি গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আর কোন হিতোপদেশ দিবি ?

আমার কথায় টুটুন একটু দমে গেল। বলল, তুমি ত বিশেষ কোথাও বেড়াতে যাও নি, তাই বলছিলাম···

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এ সুবর্ণ সুযোগ তোরা যাকে ইচ্ছে দিয়ে দিস। এখন বেনারস বেড়ানোর চাইতে আমার নতুন টিউশনি বজায় রাখা অনেক বেশী···

টুটুন ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি আমার দুটো হাত ধরে বলল, তুমি আমার 'পর রাগ করলে ছোড়দা ?

আমাকে এখন বেরুতে হবে। টিকিট কাটা হলে খবর দিতে দেরী করিস না।

টুটুন চলে যেতেই আমি জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে মনে প্রশ্ন করলাম বাবা বিশ্বনাথ, কী মতলবে আমাকে তোমার কাছে টানছ বলতে পার ? আমাকেও কী টিকিট কেটে মা'র কাছে পাঠিয়ে দেবে, নাকি গাঁজায় দম দিয়ে অন্য কোন ফন্দি এঁটেছ ? যাকগে ভালই হল। ছোটবেলা থেকেই ত তোমার গুণকীর্তন শুনেছি। তোমাকে দেখার শখ আমারও কম না কিন্তু এতকাল যেতে পারি নি। এবার যখন সুযোগ পেয়েছি তখন ছাড়ছি না। বিধবা বুড়ীর সঙ্গে দেশভ্রমণ খুব লোভনীয় না হলেও কেন জানি না মনটা খুশীতে ভরে উঠল। মনে মনে ঠিক করলাম যদি পিসীর সেজদি ভাল ব্যবহার করেন, তাহলে দু-একদিন থাকব ; নয়ত বুড়ীকে পৌঁছে দিয়েই পত্রপাঠ রওনা দেব।

টুটুন ওঁকে নিয়ে আগেই স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি বোম্বে মেলের কামরায় উঠেই ওদের দেখা পেলাম। আমি সুটকেশটা নামিয়ে রেখেই বুড়ীকে একটা প্রণাম করলাম। বুড়ী আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, শিবরাত্তিরের সলতে ! বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক।

আমি চমকে উঠলাম। মনে হল, এমন আন্তরিকভাবে মন-প্রাণ দিয়ে কেউ ত আমার কল্যাণ কামনা করেন নি। গুরুজনদের প্রণাম করলেই ত আশীর্বাদ পাওয়া যায় কিন্তু ক'জনের আশীর্বাদে মনের শান্তি, প্রাণের তৃপ্তি হয় ? এতকাল ত পরের বাড়িতেই থেকে-খেয়ে বড় হলাম কিন্তু কই কাকিমা ছাড়া আর কেউ ত আমাকে খাইয়ে তৃপ্তি পান বলে মনে হয় না। স্নেহ-ভালবাসার স্বাদই আলাদা ! যে পায় নি, সে-ই শুধু এর রস উপভোগ করতে পারে।

টুটুন আর এক মুহূর্ত দেরী করল না, চলে গেল। আমি ওঁর পাশে বসলাম।

তোকে খুব কষ্ট দিলাম, তাই না বাবা ?

না না, কষ্ট কি ?

আমার মত একটা বুড়ীকে নিয়ে যাওয়া আসা কষ্টকর বৈকী ! তাই ত কেউ আসতে চাইল না।

বুড়ীর কথাবার্তার সুরই আলাদা। বড় ভাল লাগল। বললাম, বিশ্বাস করুন, আমার কোন কষ্ট হবে না।

কিন্তু আমার জন্যে ত তোর ছাত্র পড়ান বন্ধ থাকল। ও঺রা কি তোর মাইনে কেটে নেবেন, বাবা?

বুড়ীর প্রশ্ন শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বুঝলাম, উনি শিক্ষিতা না হলেও বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ। শুধু তাই নয়, অন্য মানুষের সুখ-দুঃখ উনি অনুভব করতে পারেন। আমি বললাম, না না, ও঺রা মাইনে কাটবেন না। তাছাড়া এ ত মাত্র দু'তিন দিনের ব্যাপার।

সে কী রে? এত কষ্ট করে যাচ্ছিস অথচ কিছুদিন থাকবি না, তাই হয়?

এ দুনিয়ায় প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু স্নেহ-ভালবাসা মায়া-মমতা আছে কিন্তু অধিকাংশ মানুষই যক্ষের ধনের মত এ সম্পদ শুধু নিজের একান্ত আপনজনকে দেয়। অপরকে দিতে প্রায় সবারই বড় কার্পণ্য। ওরা জানেন না, বিলিয়ে দিয়েই এ দুর্লভ সম্পদের বৃদ্ধি, উড়িয়ে দিলেই মনের শান্তি, চিত্তের শুদ্ধি। আমার বুঝতে কষ্ট হল না, এই নিঃসন্তান বাল্যবিধবা নিজের সন্তানকে স্তন্যদান করার সৌভাগ্য অর্জন না করলেও মাতৃত্বের করুণা ধারায় অসংখ্য সন্তানকে ধন্য করেছেন। বললাম, এবার না থাকতে পারলেও পরের বার গিয়ে···

পরের বারের কথা পরের বার দেখা যাবে। এবারও গিয়েই ফিরতে পারবি না।

আমি চুপ করে রইলাম।

একটু পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ী পিসি বললেন, চোখে না দেখলেও বেশ বুঝতে পারি কিভাবে তুই এতগুলো বছর পরের বাড়িতে কাটালি। এক মুঠো অন্ন দিতে ত সবার যেন বুক-পাঁজর ভেঙে যায়!

গাড়ির আবছা আলোয় উনি দেখতে না পারলেও আমি বেশ অনুভব করলাম অনাস্বাদিত ভালবাসায় আমার দুটো চোখ ছলছল করে উঠেছে। কখন যে ট্রেন ছেড়েছে টের পাই নি। হঠাৎ খুব জোরে বাঁক ঘুরতে যেতেই ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়াল হল ট্রেন আর হাওড়া স্টেশনে থেমে নেই, অন্ধকার ভেদ করে ছুটতে শুরু করেছে। মনে হল এতকাল স্থবিরের মত আমিও চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম, চলার শক্তি বা ইচ্ছা—কোনটাই ছিল না, কিন্তু এবার সমস্ত জড়তা, দ্বিধা, সংকোচকে পিছনে ফেলে অনিশ্চিত অন্ধকারকে পরোয়া না করে ছুটছি। বোম্বে মেলের মত। ভোরের আলো দিনের উজ্জ্বলতা না দেখার আগে আমিও থামব না, থামতে পারব না। ভালবাসার পরশ-পাথরের ছোঁয়া লাগতে না-লাগতেই আমি বদলে গেলাম।

রেল গাড়ির ঝাঁকুনিতে বুড়ী পিসীর ঘুম আসে না। আমিও এমন এক বিচিত্র নেশায় বিভোর ছিলাম যে কিছুতেই ঘুমুতে পারলাম না। বুড়ী পিসী হারানো দিনের গল্প শুরু করলেন।

তুই ত আমাকে কোনদিন দেখিস নি, তাই না?

না পিসী, আমি এর আগে আপনাকে দেখি নি।

আমি কিন্তু তোকে দেখেছি।

কবে ? বেলাদির বিয়ের সময় ?

আমি ত বেলার বিয়েতে যাই নি। কারুর বিয়েতেই আমি যাই না।…

কেন ?

চিঠিপত্র লিখে কেউ যে যেতে বলে না, তা নয়, তবে আমি ত জানি, আমি না গেলেই সবাই খুশী হবে। তাই সবার বিয়েতেই শুধু পাঁচ-দশটা টাকা আশীর্বাদী পাঠিয়ে দিই। বেলার বিয়েতে অনেকেই এসেছিল, তাই না ?

হ্যাঁ। তাহলে আমাকে কোথায় দেখলেন ?

কাশীতেই তোকে দেখেছি।

কাশীতে ?

বুড়ী পিসী মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ। একটু চুপ করে থেকে বললেন, প্রথমবার ত তোরা সবাই আমার ওখানেই উঠেছিলি।…

তা ত জানি না।

তুই জানবি কেমন করে ? তখন ত তুই মাত্র কয়েক মাসের। তারপর আরো দুবার তোকে দেখেছি। একবার ত তোকে আমার কাছে রেখেই তোর বাবা-মা প্রয়াগে কুম্ভস্নান করতে গেল।

আচ্ছা ?

তোর মাকে আমি কি বলে ডাকতাম জানিস ?

না।

আমি তোর মাকে সোনা বউ বলে ডাকতাম।

সোনা বউ বলতেন কেন ?

তোর মা ত একটা সোনার টুকরো মেয়ে ছিল। যেমন দেখতে-শুনতে, তেমন তাঁর গুণ ছিল। কিন্তু তোর পণ্ডিত জ্যাঠা বউটাকে কি জ্বালান জ্বালিয়েছে।

শুনেই আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ?

কেন আবার ? ওর মেজাজই ঐরকম ছিল। এদিকে স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত হলে কী হয়, অমন বিচ্ছিরি গালাগালি দিতে ছোটলোকরাও পারবে না।

কী বলছেন আপনি ?

যা বলছি শুনে রাখ। তোর মার সঙ্গে উনি কি জঘন্য ব্যবহার করতেন তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না।…

যেমন ?

বুড়ী পিসী একটু হেসে বললেন, ওর রাগের কোন মাথামুণ্ডু ছিল না। রোজ ভাতের পাতে সের খানেক দুধ খেতেন কিন্তু বেশী গরম দিলেও রাগ, অল্প গরম হলেও রাগ। আর রাগ মানেই দুধের বাটি ছুঁড়ে মারবেন।…

কী আশ্চর্য !

এইটুকু শুনেই আশ্চর্য হচ্ছিস—সব শুনলে ত তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে তাহলে।

না না, মাথা খারাপ হবে না, আপনি বলুন।

ঐ দুধের বাটি ছুঁড়ে মারার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ দিয়ে ফুলঝুরির মত জঘন্য গালাগালি বেরুতে শুরু করত।...

আমার মাকেও ঐরকম গালাগালি দিতেন।

তবে কী ছেড়ে দিতেন ?

এত ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি যে তাঁর কোন কিছুই আমার মনে নেই। এমন কী তাঁর মুখখানাও মনে করতে পারি না। আমার ঐ বিখ্যাত জ্যাঠাও আমার ছেলেবেলায় মারা যান কিন্তু তাঁর ছবি দেখেছি। বুড়ী পিসীর কাছে এসব কাহিনী শোনার পর মনে হচ্ছে আজ যদি ঐ মহাপুরুষটি দয়া করে ইহলোকে বর্তমান থাকতেন তাহলে আমার হাতেই তার পরলোক গমনের ব্যবস্থা হয়ে যেতো। হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা পিসী, বাবা কিছু বলতেন না ?

সে কী বলবে ? একে বড় ভাই তার উপর মহা শাস্ত্রজ্ঞ। পিসী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, পঞ্চাশ বছরের উপর কাশীতে আছি। বামুন দেখে দেখে ঘেন্না লেগে গেল। সাধে কি বলে—

কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ,
যে না মারে তার পাপ !

ট্রেন ছুটছে। মাঝে মাঝে থামছে। বোধহয় বর্ধমান, আসানসোল অনেকক্ষণ আগেই পার হয়েছি। হয়ত ধানবাদ, গোমো, হাজারিবাগও ছাড়িয়ে এসেছি। এরপর কোডারমা বা গয়া আসবে। তার মানে রাত অনেক হয়েছে। সারাটা দিনের মধ্যে এক মিনিট বিশ্রাম করার অবকাশ পাই নি। তারপর এতক্ষণ বসে আছি। ক্লান্ত বোধ করছি ঠিকই কিন্তু বিচ্ছিরি মানসিক উত্তেজনার জন্য কিছুতেই ঘুম আসছে না। পিসী কয়েকবারই বললেন, তুই একটু ঘুমিয়ে নে। তা না হলে কাল শরীর খারাপ লাগবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, না ঘুমুলে আপনার শরীর খারাপ হবে না ?

পিসী শুধু একটু হাসলেন। আমার কথার জবাব দিলেন না।

কি হল পিসী, আমার কথার জবাব দিলেন না ?

বিধবার জান কচ্ছপকেও হার মানায়। দু'একদিন না খেলে বা ঘুমুলে আমার কিছুই হবে না।

ও কথা বলবেন না পিসি। খাওয়া-দাওয়া বা ঘুম না হলে সবারই শরীর খারাপ হয়।

উনি আবার একটু হাসলেন। বললেন, এখন ত নিজের ব্যবস্থা নিজেই করি, কোন পণ্ডিতেরই পরামর্শ নিই না কিন্তু প্রথম যখন বিধবা হলাম তখন মদনমোহন পণ্ডিতের জ্বালায় যে কষ্টভোগ করেছি তাতে এখন আর কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে হয় না।

মদনমোহন পণ্ডিত আবার কে ?

উনি আমার এক রকমের বড় ভাশুরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কী একটা সম্পর্কে যেন উনি আমার একরকম শ্বশুরও হতেন। আমার শ্বশুরবাড়ির সবার ধারণা ছিল অমন পণ্ডিত আর ভূ-ভারতে নেই।

শুনে আমি হাসলাম।

এখন ওর কথা বলতে গিয়ে আমিও হাসি কিন্তু তখন ওকে দেখলেই আমার পিলে চমকে যেতো।

কেন ?

দু'চারটে সংস্কৃত কিড়মিড় করে বলেই রোজ এমন এক একটা বিধি বাতলে যেতেন যে তাতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যেতো। তুই ভাবতে পারিস বাবা চৈত্র-বৈশাখ মাসেও একাদশীর দিন একফোঁটা জল খাবার হুকুম ছিল না আমার।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বললাম, সে কী পিসী ? জল না খেয়ে থাকতেন কিভাবে ?

ভাবতে গিয়ে আমিও এখন অবাক হই কিন্তু ও বুড়োকে তখন এতই ভয় করতাম যে সত্যি সত্যি জল না খেয়ে থেকেছি।

আমি হলে ত মরেই যেতাম।

তুই কেন ঐ মদনমোহন পণ্ডিতও গরমের দিনে জল খেতে না পেলে মরে যেতো কিন্তু বিধবারা শত অত্যাচার ভোগ করেও বেশ বেঁচে থাকে।

এখনও একাদশীর দিন জল খান না ?

ও বুড়ো পণ্ডিত মরার পর থেকেই খাই। আস্তে আস্তে ব্রত-উপবাসও ছেড়ে দিয়েছি।

খুব ভাল করেছেন।

পুরানো দিনের কথা ভাবতে গিয়ে পিসীর মন বিস্বাদে ভরে যায়। বিদ্যালঙ্কারের ছেলে শুনেই গরীব হরিদাস পণ্ডিত আর দ্বিধা করলেন না। বিয়ের দিন স্থির করেই গ্রামে ফিরলেন। খবর শুনে হরিদাস পণ্ডিতের স্ত্রী বিশেষ খুশী হলেন না ; বরং মন খারাপ হয়ে গেল। নানাজনের কাছে উনি শুনেছেন বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রী ও মেয়ে যক্ষ্মায় মারা গেছেন। স্বামীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস তাঁর ছিল না। তাছাড়া তখন বলেই বা কী লাভ ? বারো বছরের কিশোরী বিদ্যালঙ্কারের ছেলের গলায় মালা পরিয়ে দিল।

তারপর ?

তারপর আর কী ? বছর দুই বাবা-মার কাছে থাকার পর স্বামীর ঘর করতে গিয়েই চমকে উঠলাম।

কেন ?

দেখি যখন-তখন ওর গলা দিয়ে রক্ত পড়ে।

ডাক্তার দেখাতেন না ?

বিদ্যালঙ্কারের বাড়িতে ডাক্তার ঢুকবে ? তাহলে আর দুঃখ ছিল কী ?

কবিরাজের ওষুধ চলছিল কিন্তু তাতে কী ঐ রোগ সারে ? তাছাড়া তখনকার দিনে ও রোগের কোন চিকিৎসাও ছিল না।

আমি চুপ করে আছি। আর কী প্রশ্ন করব ?

পিসী একটু হাসলেন। বললেন, ষোল বছর বয়সেই সব খেলা মিটে গেল। আমাকে নেবার জন্য বাবা এলেন কিন্তু আমি গেলাম না। আমার ধারণা হয়েছিল যে উনি সব কিছু জেনে শুনেই আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। তাই ওঁকে সাফ জানিয়ে দিলাম, স্বামীর ভিটে ছাড়ছি না।

তারপর আর বাবা-মার কাছে যান নি ?

গিয়েছি অনেক কাল পরে। অবশ্য তখন না গিয়ে ভালই করেছি। তখন বাপের বাড়ি চলে গেলে হয়ত শ্বশুরমশাই আমার জন্য কিছুই করতেন না।

একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর বিদ্যালঙ্কার বেশীদিন বাঁচলেন না কিন্তু তার আগে বাল্যবিধবা পুত্রবধূর বিধি-ব্যবস্থা করতে ত্রুটি রাখলেন না। দেশের বিষয় সম্পত্তি আর শহরের বাড়ি বিক্রী করে কাশীতে একটা বাড়ি কিনলেন। কিছু কোম্পানীর কাগজ কিনে ব্যাঙ্কেও জমা রাখলেন। বিদ্যালঙ্কারও কাশীতে চলে এলেন এবং এখানেই মারা যান।

আমি কি একটা প্রশ্ন করতেই পিসী বললেন, আপনি আপনি বলাটা ছাড়ত। বড্ড পর পর মনে হয়।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমারও আপত্তি নেই। যাকগে তারপর কী হল বল।

কাশীতে আমার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনে ভর্তি ছিল। আমি কোনকালেই ওদের দেখতে পারতাম না। আমি স্পষ্ট সে কথা শ্বশুরমশাইকে বলে দিয়েছিলাম। ওরা যে সুবিধের লোক না উনিও জানতেন এবং মোটা-মুটি বিধি-ব্যবস্থা ভালই করেছিলেন বলে আজও পরের দুয়ারে গিয়ে আমাকে হাত পাততে হচ্ছে না।

তবুও কী ওরা ছেড়ে দিয়েছে ? মদনমোহন পণ্ডিতের জ্বালায় পুজা-পার্বণ আর ব্রত পালন করতে করতে পিসী হাঁপিয়ে উঠলেন। বিধবা হলে ব্যবস্থা বাড়ে। তাই কথায় কথায় দান-ধ্যান ব্রাহ্মণ ভোজন ! সম্ভব হলে মদন-মোহন নিজেই সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন। ভাদ্র মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় হরিতালিকাব্রত পালনের পরদিন ভোজন সমাপনান্তে ঢেকুর তুলে মদনমোহন পণ্ডিত বললেন, জান বৌমা পদ্মপুরানে বলেছে—

নারী ভাদ্রতৃতীয়ায়ামাহারং করুতে যদি।
সপ্ত-জন্ম ভবেদ্বন্ধ্যা বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥

এবার চিৎকার করে বললেন, অর্থাৎ, নারী আজীবন এই ব্রত পালন না করলে সাতজন্ম বন্ধ্যা থাকে ও বার বার বিধবা হয়। পূর্ব জন্মে শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চল নি বলেই এ জন্মে তোমাকে এত দুঃখ পেতে হচ্ছে।

পিসী হাসতে হাসতে বললো, সব পুজা-পার্বণ আর ব্রত পালনের সময়ই ঐ একটি হুমকি। যদি পালন না কর তাহলে তোমার এই সর্বনাশ ঐ মহাপাপ

আর পরের জন্মে বৈধব্য ত অনিবার্য। গা জ্বলে যেতো ঐ হতচ্ছাড়া পণ্ডিতের কথা শুনে।

আহাহা পিসী তখন যদি আমি থাকতাম তাহলে…

বুড়ো মরার পর ওর বড় ছেলেটাও খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাকে এসে বললো, কাকিমা এবার থেকে আমিই আপনার সব কাজকর্ম করিয়ে দেব। আমি ওকে সাফ বলে দিলাম, বাবার মত বিধবা ঠকাবার ব্যবসাটা তোমরা না হয় নাই করলে। তোমার বাবার কাছে স্বর্গের টিকিট কাটতে গিয়ে ত আমার সমস্ত কোম্পানীর কাগজগুলো উড়ে গেল। এবার কী আমার বাড়িটা নিয়েও টানা-টানি করতে চাও ?

আমি পিসীর তারিফ না করে পারলাম না। বললাম, ঠিক করেছিলে।

না করে উপায় ছিল না। তারপর তখন আর আমি কচি নই ; তাছাড়া চোখের সামনে কম বিধবার সর্বনাশ ত দেখলাম না। বিধবাদের সর্বনাশ করার জন্য কত মানুষ যে হাঁ করে বসে থাকে তা তুই ভাবতে পারবি না।

পিসী কিসের যেন ইঙ্গিত করলেন কিন্তু আমি ঠিক ধরতে পারলাম না, কিছু জিজ্ঞাসাও করলাম না। চুপ করে রইলাম।

অনেকক্ষণ আগেই গয়া ছাড়িয়েছি। বোধহয় একটু পরেই ডেরি-অন-শোন আসছে। বেশ বুঝতে পারছি অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে, রাত্রির মেয়াদ প্রায় শেষ।

পিসী আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, সারা রাত তোকে ঘুমুতে দিলাম না শুধু নিজের কথাই বলে গেলাম।

তাতে কী হয়েছে ? না ঘুমিয়ে আমার একটুও কষ্ট হয় নি বরং বেশ ভালই কাটল।

এসব কথা আমি কাউকে বলি না ; বলে কী লাভ ? তবে দুঃখের কথা বললে নিজেকে অনেকটা হাল্কা লাগে।

ঠিক বলেছ পিসী।

তুইও ত আমার মত কপালে আগুন দিয়ে এ দুনিয়ায় এসেছিস তাই তুই আমার দুঃখ বুঝবি। তাছাড়া তুই যে আমার সোনা বউয়ের ছেলে। তোর উপর আমারও ত কিছু দাবী আছে।

কিছু কেন পিসী ? তুমি ষোল আনাই দাবী করতে পার। আমার উপর আর ত কোন দাবীদার নেই।

আচ্ছা শোন এখন ত আর তোর পড়াশুনার ঝামেলা নেই, সময় পেলেই আমার এখানে চলে আসিস। দেখিস খারাপ লাগবে না।

খারাপ লাগবে কেন ?

দূরে থাকলেও তোর খোঁজ-খবর আমি রাখতাম কিন্তু কলকাতার মত ত কাশীতে পড়াশুনা হবে না তাই কিছু বলি নি। তা না হলে তোকে দুটো ডাল-ভাত দেবার মুরোদ আমার আগেও ছিল এখনও আছে।

সে ত খুব ভাল কথা পিসী। এবার থেকে মাঝে মাঝেই তোমার ওখানে গিয়ে উৎপাত করা যাবে।

ওরে এ বয়সে কিছু কিছু উৎপাত ভালই লাগে কিন্তু এ দুনিয়ায় ত কেউ নেই যে আমাকে উৎপাত করেও একটু সুখ দেবে।

সারা রাত ধরে পিসীর দুঃখ কষ্ট বিপর্যয়ের কাহিনী শুনেছি কিন্তু রাত্রি শেষে সূর্য ওঠার আগে যে বেদনার ইঙ্গিত পেলাম তাতে পিসীর জন্য সমবেদনায় আমার মন কানায় কানায় ভরে গেল। এ পৃথিবীতে অনেক দুঃখ কষ্ট ব্যথা-বেদনারই প্রতিকার আছে; অনেক অভাব অনেক দৈন্য দূর করার সুযোগ হয় কিন্তু মাতৃত্বের ঐশ্বর্য বঞ্চিত নারীকে ত কিছুতেই সেই অনাস্বাদিত মহিমায় ভরিয়ে তোলা যায় না। হিমালয়ে যত দেবতারাই বাস করুক না কেন তার শিখর স্বর্গের দোর গোড়ায় হানা দিলেও সে কোনদিনই সমুদ্র দর্শন করতে পারবে না। শত ঐশ্বর্যের মধ্যেও এ দুঃখের বোঝা হিমালয়কে চিরকাল বহন করতে হবে। এসব আমি জানি বুঝতে পারি কিন্তু তবু আমার প্রায় সদ্য-পরিচিতা বুড়ী পিসীকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, আচ্ছা পিসী, পেটে না ধরলেই বুঝি ছেলে হয় না? এই এক ছেলের জ্বালায় তোমাকে এবার পাগল হয়ে যেতে হবে।

পিসী দু-এক মিনিট কথা বলতে পারল না। বোধহয় আমার কথায় মনটা এত নরম হয়ে গিয়েছিল যে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। একটু পরে বললেন, দেখিস এবার আমার জ্বালায় তুই পাগল হয়ে যাবি।

আমি একটু হাসতে হাসতে বললাম, আমরা দুজনেই দুজনকে জ্বালিয়ে পাগল হয়ে যাবো। সেই ভাল না পিসী?

পিসী হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

শৈশবে মাতৃস্নেহ একমাত্র অবলম্বন। মাতৃস্নেহের আকাঙ্ক্ষায় যৌবনে ভাটা পড়ে কিন্তু জোয়ার আসে নতুন ভালবাসার প্রত্যাশায়। স্নেহ-ভালবাসার জোয়ার-ভাটার স্বাদ আমি কোনদিন পাই নি। নদীর ধারা যত ক্ষীণই হোক সে এগিয়ে চলার পথে কত কি সম্পদ কুড়িয়ে নেয় আর বিলিয়ে দেয় পলি কিন্তু আমি ত খানাডোবারও অধম। কিছু কুড়িয়ে নেবারও সৌভাগ্য হয় নি কিছু বিলিয়ে দেবারও মুরোদ নেই। দশজনের ঔদার্যে আমি শৈশব কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের দোরগোড়ায় পৌঁছেছি। শুধু দেহটাই বড় হয়েছে কিন্তু মন? স্নেহ-ভালবাসার অভাবে পল্লবিত হয় নি। এই অন্ধকার রাত্রির অন্তিম লগ্নে সূর্য ওঠার মুখোমুখি পিসীর কাছে এক অনাস্বাদিত অমৃতের প্রসাদ পেয়ে আমি যেন হঠাৎ পল্লবিত মুকুলিত হয়ে উঠলাম।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ রইলাম। তারপর পিসী বললেন, এবার বোধহয় তোকে পাব বলেই বাবা বিশ্বনাথ আমাকে কলকাতায় টেনেছিলেন।

আমি একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললাম, কিন্তু বাবা বিশ্বনাথ আমার কোন উপকার করবেন বলে ত মনে হয় না।

ও কথা বলিস না বাবা।

কেন বল ত পিসী ?

নিজের অদৃষ্টের জন্য বাবাকে দোষারোপ করবি কেন ?

তোমরাই ত বল আমাদের অদৃষ্ট ওরই কারখানায় তৈরী হয়।

পিসী হাসলেন। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, ভাল করে মন দিয়ে ডাকলে বাবা ঠিকই কথা শোনেন।

তাই যদি হতো তাহলে তুমি সারা জীবন ধরে এত সুখে আছো কেন ?

ও কথা বাদ দে। আমি যা বলছি শোন।

বল।

ষোল বছর বয়সে বিধবা হবার পর সামান্য কিছুদিনই শ্বশুরমশাই বেঁচে ছিলেন। উনি মারা যাবার পর থেকেই ত একলা একলা আছি। যে ভাবেই হোক পঞ্চাশটা বছর ত এইভাবেই কাটিয়ে দিলাম কিন্তু আর যেন পারছিলাম না।

আমি কোন প্রশ্ন করলাম না। চুপ করে পিসীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পিসী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কিছুকাল ধরে কিছুতেই আর একলা থাকতে ভাল লাগছিল না। সব সময়ই মনে হতো হাতের কাছে যদি কাউকে পেতাম তাহলে যেন বেঁচে যেতাম। মাঝে মাঝে কি মনে হতো জানিস ?

কী ?

মনে হতো আগে থেকেই যদি কোন আত্মীয়-স্বজনের একটা ছেলেমেয়ে মানুষ করতাম তাহলে তার বাচ্চাকাচ্চাগুলো ত মাঝেসাছে আমার কাছে আসাযাওয়া করতো।

শুনেছি দুধের সাধ ঘোলে মেটে না কিন্তু যে কোনদিন দুধের সাধ পায় নি পেতে পারে না তার কাছে ঘোলই যথেষ্ট। আমি বললাম, ওসব ঝামেলায় না গিয়ে ভালই করেছ। শেষকালে তারা দুঃখ দিলে তুমি আর সহ্য করতে পারতে না।

তুই হয়ত ঠিকই বলছিস কিন্তু মন ত মানে না। মাঝে মাঝে ভাবি কাশীর বাড়িটা বিক্রী করে কলকাতায় গিয়ে কারুর কাছে থাকি।

এসব মতলবও তোমার মাথায় আসছে নাকি ? তীরে এসে তরী ডুবিও না পিসী।

আমি কারুর কাছেই যাব না কিন্তু কত রকমের চিন্তা মাথায় আসে তাই বলছি। আমি কী আর জানি না আত্মীয়-স্বজনদের দৌড় কত অবধি ?

তোমার কথা শুনেই ত আমার পিলে চমকে গিয়েছিল।...

পিসী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ?

ভাবলাম এত কাল পরে যদিও বা আমার আসা-যাওয়ার একটা আস্তানা হচ্ছিল তাও বুঝি তোমার বুদ্ধির দোষে হারাতে চলেছি।

পিসী একটু হেসে বললেন, যাই হোক বাবা আমার কথা শুনেছেন।

বাবা মানে বাবা বিশ্বনাথ ?

তবে আবার কে ?

উনি তোমার কথা শোনেন ?

দেখছি ত শোনেন।

কোন কথা শুনলেন ?

এই যে তোকে জুটিয়ে দিলেন।

তার মানে ?

রোজই বাবার মাথায় জল দিতে গিয়ে বলতাম, বাবা আর ত একলা একলা ভাল লাগছে না। আমার স্বামী পুত্র নেই বলে কী আমার মৃত্যুর পর একজনও চোখের জল ফেলবে না ?

আচ্ছা পিসী মরার পর কে কাঁদল আর কে হাসল তাতে তোমার কী আসে যাবে ?

তা ঠিক কিন্তু এই বয়সে এই সব কেবল মনে হয়। কাজকর্ম না থাকলেই শুধু ভাবি কে আমাকে শ্মশানে নিয়ে যাবে, কে মুখে আগুন দেবে, কে আমার শ্রাদ্ধ করবে।

তোমার বাবা কী তোমার ওপারে যাবার টিকিট দিয়ে দিয়েছেন ?

পিসী এবার হঠাৎ একটু গলার স্বর চড়িয়ে বললেন, ওরে হতভাগা বাবাকে নিয়ে যে অত ঠাট্টা করছিস কিন্তু বাবার কৃপা না হলে আঠাশ বছর পর কলকাতাতেই বা গেলাম কেন আর তোর সঙ্গেই বা আমার দেখা হবে কেন ? এত বছর ধরে ত কত লোকের বাড়িই ঘুরে বেড়ালি কিন্তু কই একটা পিসীও ত জোগাড় করতে পারলি না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, পিসী, তুমি ত বড় অহঙ্কারী।

আমাকে পেয়ে তোর অহঙ্কার হচ্ছে না ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে দু হাত দিয়ে পিসীর গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, এমন পিসী পেলে সবারই অহঙ্কার হয়।

হঠাৎ এক ঝলক প্রথম সূর্যের আলো মুখে এসে পড়তে আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম।

ভোরবেলায় মোগলসরাই পৌঁছে শেয়ারের ট্যাকসিতে কাশী। বাসও ছিল কিন্তু পিসী বললেন সারা রাত্তির ঘুমোস নি এখন আর বাসে গিয়ে কাজ নেই।

মোগলসরাই থেকে ট্যাকসি ছাড়ার দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই গঙ্গা।

পিসী সঙ্গে সঙ্গে দু হাত জোর করে কপালে ঠেকিয়ে মা গঙ্গাকে প্রণাম করলেন। তারপর বললেন, ওপারেই কাশী।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এত কাছে।

পিসী এবার বাঁ দিকে হাত দিয়ে বললেন, ঐ যে দশাশ্বমেধ ঘাট দেখা যাচ্ছে ওরই কাছে আমি থাকি।

তাহলে ত বেশী দূর নয়।

দূর না হলে কি হবে? রাস্তাঘাটের যা অবস্থা। এইটুকু যেতেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

পিসী যে অতিশয়োক্তি করেন নি, তা সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলাম। এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্তবোধ না করলেও গোধুলিয়ার মোড়ে পৌঁছেই মনে হল, আর পারছি না।

এবার রিকশা।

সাইকেল রিকশায় বসেই জিজ্ঞাসা করলাম, ও পিসী, এর পর কি পাল্কী চড়তে হবে?

পিসী হাসলেন। বললেন, হাসির কথা নয় রে। এখনও অনেক বুড়ো-বুড়ী পাল্কী চড়ে গঙ্গায় চান করতে আসে।

ওদের সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে সৈন্যসামন্ত আসে না?

উনি হাসতে হাসতে বললেন, প্রায় সেই অবস্থা।

একটু পরেই রিকশা থামল। আমরা নামলাম। মালপত্র নামিয়ে, ভাড়া মিটিয়ে, সবার আগে কালী মন্দিরে প্রণাম। তারপর গঙ্গার দিকে ইসারা করে বললেন, সামনেই দশাশ্বমেধ ঘাট।

এবার পদব্রজে।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, পিসী, আমরা কি কেদার-বদ্রী হয়ে কাশী যাচ্ছি?

উনিও হাসলেন কিন্তু বললেন, আর যদি আমাদের কাশী নিয়ে ঠাট্টা করেছিস তাহলে এবার মার খাবি।

বোধহয় মারের ভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম কিন্তু বেশীক্ষণ পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা পিসী, তোমাদের বাবা বিশ্বনাথ কি বুড়ো বয়সেও পার্বতীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন?

তার মানে?

আমার মনে হয় ভালভাবে লুকোচুরি খেলার জন্যই বাবা বিশ্বনাথ এত অলিগলি বানিয়েছেন।

তোর মুণ্ডু!

এটা যদি ঠিক না হয় তাহলে অন্য কারণটা নিশ্চয়ই হবে।

অন্য কারণ আবার কি?

হাজার হোক শিবঠাকুর নেশাখোর লোক। তাই লোকলজ্জার ভয়ে অলিগলির ঘোরসে লুকিয়ে থাকতে এত ভালবাসেন।

আবার বাঁদরামী করছিস ?

এগিয়ে পিছিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে, কোণাকুণি, ধনুকের মত ঘুরেফিরে পিসীর বাড়ির দরজায় হাজির হয়ে আবিষ্কার করলাম জ্যামিতি পড়ে যত রকমের বৃত্ত রেখা ও কোণ জানা যায় কাশীর অলিগলি ঘুরলে তার চাইতে অনেক বেশী জানা যায়। বৈদিক পুজোর বেদীতে নানা রকমের রেখা অংকন দেখে গবেষকরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ভারতবর্ষই জ্যামিতির সূতিকা-ঘর। প্রাচীন যুগের এই বিস্ময়কর প্রতিভা বুঝি মধ্য যুগে হারিয়ে গিয়েছিল কিন্তু কাশীর গলিতে ঘুরলে বোধহয় তা মনে হয় না।

পিসীর বাড়িতে পা দিতে না দিতেই হঠাৎ অনেকগুলো মানুষের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল। আমি কিছু উপলব্ধি করার আগেই এক দল বিধবা আমার চারপাশে এসে ভিড় করলেন। প্রায় সবাই একসঙ্গে পিসীর কাছে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন, দিদি এ কি তোমার ভাইপো নাকি যে নাতির গল্প করতে, সে ?

পিসী বললেন, এ আমার ভাইপো প্রদীপ।

একজন সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্ন করলেন, এর কথা কি শুনেছি ?

এখন যেতে দাও। সারা রাত্তির দুজনে ঘুমোই নি।

তাই নাকি ? তবে যে শুনি রেলে শুয়ে আসা যায় ?

পিসী এ প্রশ্নের জবাব না দিলেও আরেকজন বললেন, যা শোনা যায় তা কি সব সত্যি হয় ?

পিসীর বাড়িতে কদিন কাটাতে পারব বলে আগে যত আনন্দ ও উৎসাহবোধ করেছিলাম এদের দেখে এক মুহূর্তে তা উড়ে গেল। ভেবেই পেলাম না, এই বিধবার রাজত্বে কিভাবে কটা দিন কাটাব। প্রথম দিনটা ঘুমিয়ে আর মনে নানা আশংকার কথা ভেবেই কাটিয়ে দিলাম। পরের দিন দুপুরে খেতে বসেই চমকে উঠলাম, একি কাণ্ড করেছ পিসি ? এত রকমের রান্না করলে কেন ?

আমার পাশে বসে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে পিসি বললেন, আমি কখনও এত রান্না করি ?

তবে ?

তোর জন্য সবাই কিছু না কিছু দিয়ে গেছে।

সবাই মানে ?

এ বাড়ীতে যারা থাকে, তারা।

আমি অবাক হলাম। একটু ভাবলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা কেন আমার জন্যে…

আমি কথাটা শেষ করতে পারলাম না। তার আগেই পিসী বললেন, এ বাড়ীর সবাই ত আমারই মত ভাগ্যবতী। তাই তুই এসেছিস বলে ওরাও খুব খুশি।

আমি আর কথা বলতে পারলাম না। নির্বাক হয়ে শুধু ভাতের থালার

চারপাশের বাটিগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবলাম, প্রথম দর্শনে যাদের দেখে মনে মনে বিরক্ত হয়েছি, যাদের সান্নিধ্যে কটা দিন কাটাতে হবে ভেবে শঙ্কিত হয়েছি তাদেরই মনে আমার জন্য এই স্নেহ দরদ কোথা থেকে এলো ? তাছাড়া পিসীর কাছে শুনেছি, এরা রিক্ত, নিঃস্ব। যা দু পাঁচ-দশ টাকা করে মনি অর্ডার আসে, তাই দিয়ে এঁরা কোনমতে বেঁচে আছেন। এঁদের ত উদ্বৃত্ত কিছু নেই, একটা দানাও না। নিশ্চয়ই নিজেদের বঞ্চিতা করে এঁরা আমাকে এত কিছু দিয়েছেন। কিন্তু যাদের এত কাল দেখেছি, তাদের মধ্যে ত এই ঔদার্য, এই স্নেহ দেখি নি। ত্রিবেণী সঙ্গমে শুধু গঙ্গা-যমুনাই চোখে পড়ে। কিন্তু মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা আছে এবং চিরকাল থাকবে। আমি কাশীকে না ভালবেসে পারলাম না।

ঘটনাটি সামান্য কিন্তু আমার মনের উপর যে কি অসামান্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা আজ ভাবতে গিয়েও অবাক লাগে। সংসারে খুব বেশী অভিজ্ঞতা আমার নেই, যেটুকু আছে তাতে জেনেছি অধিকাংশ মানুষ বেহিসেবী ও অসংযমী। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা হিসেবের ভুল করি, সংযম রক্ষা করে চলতে পারি না। কিন্তু বেহিসেবী, অসংযমী মানুষও নিজের মুখের গ্রাস থেকে অন্যকে একমুঠো অন্ন দিতে গিয়ে বড় বেশী হিসেবী ও সংযমী হয়ে পড়েন। পিসীর বাড়ির সর্বজনত্যজ্য নিঃসম্বল বিধবাদের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখে আমি মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে গেলাম।

রাত্রে মণি পিসী আর সারদা পিসীর ঘরে খেতে ঢুকেই বললাম, আজ আবার পায়েস করেছেন ?

মণি পিসী বললেন, শেষকালে দুটো লুচি পায়েস দিয়ে না খেলে কি পেট ভরে ?

আসনের উপর দাঁড়িয়ে লুচির থালার দিকে তাকিয়ে বললাম, কিন্তু…

কিন্তু কিন্তু না করে বসে পড় বাবা। লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে পারবি না।

লুচি করলেন কেন ? রুটি হলেই ত…

সারদা পিসী এতক্ষণ কি যেন কাজ করছিলেন। এবার বললেন, রুটি কি কেউ কাউকে খাওয়াতে পারে ? তাছাড়া কে কখন আসবে বলে মণিদির কাছে সব সময় একটু ভাল চাল, একটু মুগের ডাল, একটু ময়দা লুকানো থাকে।

মনে মনে বললাম, হায়রে মণি পিসী, তুমি যে নিজেকে বঞ্চিতা করে এসব লুকিয়ে রাখো কিন্তু কে কবে তোমার কাছে এসেছে ? তুমি ত সব সময় ভাব যে কোনদিন তোমার নাতি-নাতনী এসে চাঁদের হাট বসাবে কিন্তু আর কত কাল তাদের জন্য পথ চেয়ে বসে থাকবে ? কেউটের বাচ্চা কেউটেই হয় তা কি তুমি জান না ? আজ পর্যন্ত ছেলের কাছ থেকে দুটো টাকা পেয়েছ, নাকি বিজয়ার পর একটা পোস্টকার্ড আসে ? ছেলে-বৌ নাতি-নাতনী নিয়ে

সংসার করার সৌভাগ্যই যদি তোমার থাকবে তাহলে দূরে সম্পর্কের দেওরের সামান্য মণি অর্ডারের উপর নির্ভর করে তোমার দিন কাটাতে হবে কেন ?

মণি পিসী বললেন, এখন তুই খেতে বস ত !

খেতে বসতে না বসতেই কে যেন চিৎকার করে উঠলেন, ও মণি দিদি, প্রদীপ কি খেতে বসেছে ?

সারদা পিসী দরজার বাইরে মুখ বের করে বললেন, এই বসেছে।

আমি আবার শুনলাম, উঠে না যায় যেন। আমি আসছি।

আমি খেতে খেতেই জিজ্ঞাসা করলাম, কে ?

সারদা পিসী বললেন, ঐ কোণার ঘরের সুধা।

উনি নিশ্চয়ই কিছু আনছেন ?

মণি পিসী বললেন, কি আর আনবে ? বেচারী কি কষ্টেই যে দিন কাটায় তা শুধু বাবা বিশ্বনাথই জানেন।

সারদা পিসী বললেন, সত্যি সত্যি, এ বাড়িতে ওর মত দুঃখী হতভাগিনী আর কেউ না। পরম শত্রুরকেও যেন ভগবান এ রকম শাস্তি না দেন।

মণি পিসী বললেন, এখন চুপ কর। সুধা শুনতে পাবে।

আমি খেতে শুরু করলাম। একটু পরেই একটা ছোট্ট পাথরের বাটিতে আম এনে সুধা পিসী আমাকে দিয়ে বললেন, এটা খেয়ে নিও।

আমি মুখ তুলে সুধা পিসীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললাম, পিসী, ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে আর যা কিছুই হই কেন, ভোজনরসিক হতে পারলাম না। এই দুই পিসীর আদর খাবার পর আর কি জায়গা থাকবে ?

সুধা পিসী বললেন, এ কয়েক টুকরো আম খাবার জায়গা খুব থাকবে।

থাকলে ভালই হতো কিন্তু মনে হচ্ছে থাকবে না।

কিন্তু বাবা যখন তোমার নাম করে এনেছি তখন ত আর কালকে দিতে পারব না।

একটা কথা বলি পিসী ? দুজনে ভাগাভাগি করে খাই।

সুধা পিসী আপত্তি করলেও মণি পিসী বললেন, ও যখন পারবে না বলছে তখন দুজনেই ভাগাভাগি করে নাও।

খাওয়া-দাওয়ার পর উপরে গিয়েই পিসীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা পিসী, সুধা পিসী বুঝি খুব দুঃখী ?

পিসী একটু হেসে বললেন, এ বাড়িতে সবাই দুঃখী, তবে সুধা বেচারীর অনেক কিছু থেকেও কিছুই পেল না।

অনেক কিছু থেকেও মানে ?

বিষয়-সম্পত্তি ছাড়াও ওর একটা ছেলে আছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, কিন্তু বিষয়-সম্পত্তির মত ওর ছেলেটাও বেহাত হয়ে গেল।

কিভাবে ?

সে অনেক কথা।

সত্যি সে অনেক দিনের অনেক কথা। ছেলেকে কায়েতের হুঁকো টানতে দেখে যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে এমন মারধোর করলেন যে পরের দু'দিন সে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে রইল। কিন্তু জ্বরের তেজ একটু কমার পর মুরারিমোহন আর দেরী করল না। স্টীমারে খুলনা-বরিশাল এক্সপ্রেসে চড়ে শিয়ালদা। কলকাতা। দু-চার দিন স্টেশনের আশেপাশে ঘুরাঘুরি করার পর বৌবাজারের কুমুদ ঘোষের মনোহারী দোকানে তিন টাকা মাইনে আর একবেলা খোরাকির বিনিময়ে মুরারিমোহনের কর্মজীবনের শুরু হল। দু-এক মাস যেতে না-যেতেই হঠাৎ একদিন মুরারিমোহনের গলায় পৈতা দেখতে পেয়েই কুমুদ ঘোষ স্তম্ভিত।

তুমি বামুনের ছেলে?

প্রশ্ন শুনেই মুরারির পিলে চমকে উঠল। আসন্ন সর্বনাশের সম্ভাবনায় ভয়ে কোন জবাব দিতে পারল না।

কি হল? সত্যি কথা বল, তুমি বামুনের ছেলে?

মুরারিমোহন কাঁদতে কাঁদতে কুমুদ ঘোষের দুটি পা জড়িয়ে ধরে শুধু বললেন, আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

সেই সেদিন থেকে ঐ বৃদ্ধ কুমুদ ঘোষের কৃপায় মুরারিমোহনের জীবনে মোড় ঘুরে গেল। বছর খানেক ব্যবসা-বাণিজ্য শিখিয়ে পড়িয়ে দেবার পর কুমুদ ঘোষ একদিন মুরারিমোহনকে বললেন, তোমার মত বামুনের ছেলেকে আমার মত কায়েতের দোকানে খাটিয়ে খাটিয়ে অনেক পাপ করেছি কিন্তু আর না।

কি বলছেন জ্যাঠাবাবু?

ঠিকই বলছি মুরারি। ধর্মভীরু বৃদ্ধ কুমুদ ঘোষ একটু উদাস হয়ে বললেন, হঠাৎ কবে মরে যাব তার ত ঠিক নেই। তাই বেঁচে থাকতে থাকতেই তোমার একটা কিছু বিধিব্যবস্থা করে যেতে চাই।

মানিকতলায় মুরারিমোহনের মনোহারী দোকান চালু হবার বছর খানেকের মধ্যেই কুমুদ ঘোষ মারা গেলেন।

আমি পিসীর কাছে সুধা পিসীর গল্প শুনতে শুনতে জিজ্ঞাসা করলাম, এই মুরারিমোহনের সঙ্গেই কি সুধা পিসীর বিয়ে হয়েছিল?

হ্যাঁ।

তারপর কি হল?

বছর পাঁচেক পর মুরারিমোহন সামান্যভাবে একটু-আধটু লোহালক্কড়ের ব্যবসা শুরু করলেন। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই শুরু হল যুদ্ধ। দেখতে না-দেখতেই মুরারিমোহন লাখপতি হয়ে গেলেন।

দেশ থেকে পালিয়ে আসার পর ওর বাবা-মার সঙ্গে আর যোগাযোগ হল না?

কুমুদ ঘোষই বাপ-বেটার গণ্ডগোল মিটিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁর খুব ইচ্ছা ছিল মুরারিমোহনের বিয়ে দিয়ে যান কিন্তু তা আর হল না।

ভদ্রলোক সত্যি মুরারিমোহনকে খুব ভালবাসতেন।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে মুরারিমোহনও অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। বরাবর নিজের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের চার আনা লাভের অংশ কুমুদ ঘোষের স্ত্রীকে দিয়ে গেছেন।

কিন্তু সে সব ব্যবসা-বাণিজ্যের হল কি ?

পিসী একটু শুকনো হাসি হেসে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবান দেবার সময়ও যেমন দশ হাতে দেন, কেড়ে নেবার সময়ও তেমনি দশ হাতে কেড়ে নেন।

তোমাদের ভগবান তো আচ্ছা হিংসুটে।

পিসী আবার একটু হাসলেন। তারপর বললেন, সুধার সঙ্গে বিয়ে হবার বছর দশেক পরেই মুরারিমোহন হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান। সুধার ছেলেটার বয়স তখন মোটে সাত। কুমুদ ঘোষের ছোট ছেলে আর মুরারি-মোহনের এক দূর সম্পর্কের মামা ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশুনার ভার নিলেন। কুমুদ ঘোষের স্ত্রী যত দিন বেঁচে ছিলেন তত দিন ঠিকই চলছিল কিন্তু উনি মারা যাবার পর থেকেই গণ্ডগোল শুরু হল।

গণ্ডগোল মানে ?

গণ্ডগোল মানে কুমুদ ঘোষের ছোট ছেলে আর ঐ হতচ্ছাড়া মামা এক জোট হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য টাকাকড়ি মেরে দেবার তাল করল। রোজই এসে সুধার কাছে বলে, টাকা পাবে বলে আজ এ মামলা করেছে, কাল ও মামলা করেছে। সুধা বলতো, মামলা মোকদ্দমা করে কি লাভ ? উনি যখন টাকা দিয়েছেন তখন শোধ করে দেওয়াই ত ভাল।

ন্যাকামী করে ঐ হতচ্ছাড়া মামা বলতেন, ওরা কি মগের মুল্লুক পেয়েছে যে চাইলেই হাজার হাজার টাকা দিয়ে দেব ? দরকার হয় মামলায় টাকা ব্যয় করব কিন্তু কোর্টের হুকুম না হলে অত টাকা কিছুতেই দেওয়া হবে না।

তারপর ?

পিসী বললেন, তারপর আর কি ? মামলায় হারের কথা বলে দুজনে প্রাণভরে টাকা মারতে শুরু করল। ফুটো কলসীতে ক্ষীর ঢেলেও কি কোন কূলকিনারা পাওয়া যায় ? চুরি করতে শুরু করলে কোন ব্যবসা-বাণিজ্যই টিকতে পারে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য উঠে গেল ?

ঠিক উঠে গেল না, বেহাত হল।

ওর ছেলেটার কি হল ?

মুরারিমোহনের ঐ মামার পাল্লায় পড়ে ঐ ছেলেটাও একেবারে বকে গেল। সব কিছু যাবার পরও যা ছিল তাও ঐ ছোঁড়াটাই উড়িয়ে সুধাকে একেবারে পথের ভিখারী করে ছাড়ল।

সে এখন কোথায় ?

পিসী মাথা নেড়ে বললেন, বহুকাল তার কোন পাত্তা নেই।

ছেলে হয়ে একবারও মার খবর নেয় না ?

যে ছেলে মার সই জাল করে মার শেষ সম্বলটুকু উড়িয়ে দিয়েছে সে কোন্ মুখে মার সামনে এসে দাঁড়াবে ?

তাই বলে একমাত্র ছেলে হয়েও—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই পিসী বললেন, কপালে আগুন লাগলে এই রকমই হয়।

সুধা পিসীর চলে কি করে ?

চলে আর কোথায় ? কোন মতে বেঁচে আছে আর কি। কুমুদ ঘোষের বড় ছেলে মাসে মাসে দশটা করে টাকা পাঠায় আর মুরারিমোহনের এক পুরানো কর্মচারী নিয়মিত না হলেও মাঝে-সাঝে কিছু পাঠায়।

কি আশ্চর্য !

কিচ্ছু আশ্চর্য নয় বাবা। সংসারে হামেশাই এ রকম ঘটনা ঘটছে। আগে আগে জানতাম না কিন্তু কাশীতে এসে এত বিধবার সর্বনাশের কথা শুনেছি যে এখন আর অবাক হই না। মনে হয় ঘরে ঘরেই এরকম নোংরামী আছে।

আমি ত এরকম ঘটনা এই প্রথম শুনলাম।

মাঝে মাঝে কাশীতে আসা-যাওয়া করলে মনে হবে বিধবার সর্বনাশ করাই বোধহয় আমাদের একমাত্র কাজ। যে মণি পিসীর ঘরে আজ খেয়ে এলি তার কথা শুনলে মনে হবে নাটক-নভেল শুনছিস।

তাই নাকি ?

সত্যি বলছি আমি যখন প্রথম শুনি তখন বিশ্বাস করতে পারি নি কিন্তু পরে বিশ্বাস করতেই হয়েছে।

বল পিসী, মণি পিসীর কথা বল।

আজ অনেক রাত হয়েছে। এখন ঘুমো। পরে মণি পিসী কেন, আরো অনেক পিসীর গল্প শুনিস।

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখি ঘর খালি। পিসী নেই। বুঝলাম খুব বেশী বেলা হয় নি। পিসী এই ঘরেই শোয় কিন্তু কখন যে বিছানা ছেড়ে উঠে যায়, তা কোনদিন টের পাই না। আমি যখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রথম চোখ মেলে তাকাই তখন দেখি পিসীর দিন অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। মেঝেয় পিসীর বিছানা নেই, পরিপাটি করে টুলের উপর রাখা। ঘর ঝাঁট-পোঁছ সারা। খাবার বাসন জলের পাত্র চক্‌চক্‌ ঝক্‌ঝক্‌ করছে। বাবা বিশ্বনাথের ফটোর সামনে ধূপকাঠি গন্ধ ছড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব প্রায় শেষ করতে চলেছে। বুঝতে পারি এত বেলা গঙ্গাস্নান করে পিসী বাবার মাথায়

জল ঢালার জন্য মন্দিরের দিকে এগুচ্ছে। ফিরতে আরো আধঘণ্টা দেরী। কারণ বাবার মাথায় জল ঢেলে বাড়ি ফেরার পথে পিসী একবার বাজারে ঢুকবেনই। শাক-সব্জীর প্রয়োজন না থাকলেও কিছু না কিছু কিনবেনই। আমি জানি বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দাদের অনেকেই এখন বাইরে। কেউ গঙ্গায়, কেউ বাবার মন্দিরে, কেউ বা বাজারে। যে-দু-একজন বাড়িতে আছেন তারা নিশ্চয়ই ঘরসংসারের কাজে ব্যস্ত। তাই আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম।

বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। পিসীর গলা শুনে তন্দ্রার ভাব কেটে গেল। ঘরের দরজার ওপাশ থেকেই পিসীকে বলতে শুনলাম, প্রদীপ উঠে পড় বাবা। দ্যাখ কাকে নিয়ে এসেছি।

চাদর মুড়ি দেওয়া অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করলাম, কে এসেছেন?

আমার এক দিদিকে নিয়ে এসেছি।

তোমার দিদি? তুমি আবার দিদি পেলে কোথায়?

চাদর মুড়ি দিয়ে বক বক না করে উঠে দ্যাখ দিদি কোথায় পেলাম।

তোমার দিদি কি আমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন?

আমার কথায় ওরা দুজনেই একটু হাসলেন। পিসী তাঁর দিদিকে বললেন, দেখছ দিদি, সোনা বউয়ের ছেলে কি হ্যাংলা হয়েছে।

আমি তখনও চাদর মুড়ি দিয়ে আছি। বললাম, বাবার মাথায় জল ঢেলে এসেই এই সাত-সকালে বাপ-মা মরা ছেলেটাকে গালাগালি দিচ্ছ?

ওরা দুজনে আরো হেসে উঠতেই আমি চাদর সরিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম।

দেখছ দিদি, সোনা বউয়ের সেই অসভ্য ছেলেটা কী সুন্দর দেখতে হয়েছে!

আমি বললাম, তুমি নিজে কুৎসিত বলে কি আর কেউ সুন্দর হবে না? আমি এবার ঘুরে বসে পিসীর দিদির দিকে চাইতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কোন বৃদ্ধা ও বিধবার যে এমন সৌন্দর্য থাকতে পারে তা ওকে না দেখলে কোনদিনই জানতাম না। এতকাল জানতাম যৌবনেই সৌন্দর্য থাকে কিন্তু হাওড়া স্টেশনে পিসীকে দেখে বুঝেছিলাম শুধু রূপের জন্যই মানুষকে সুন্দর মনে হয় না। মাতৃতুল্যা স্নেহময়ী নারীর রূপ যে-রকমই হোক না কেন, তার সৌন্দর্যের মাধুর্যই আলাদা। আজ পিসীর দিদিকে দেখে মনে হল চির-তুষারাবৃত হিমালয়ের মত ওর সর্বাঙ্গ দিয়ে স্নেহের ধারা বইছে। মনে মনে বললাম, পিসী, যদি তোমার দিদির স্নেহের ধারায় অবগাহন করতে পারি তাহলে মা জাহ্নবীর ধারা শুকিয়ে গেলেও দুঃখ করব না।

পিসী গঙ্গাজলের পাত্র আর বাজার থেকে কিনে আনা শাকসব্জী ফলমূল ঘরের কোণে রেখেই আমাকে বললেন, কিরে প্রণাম কর।

আমি সঙ্গে সঙ্গে খাট থেকে নেমে ওকে প্রণাম করতেই উনি দুহাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে আদর করে বললেন, সুখে থাক বাবা।

পিসী হাসতে হাসতে বললেন, জানিস প্রদীপ, দিদি কিন্তু সম্পর্কে আমার খুড়ী হন।

তাহলে ত আমার দিদিমা হলেন।

ওরে হতভাগা, দিদিমা না ঠাকুমা হলেন।

ঐ একই ব্যাপার। আমি এবার পিসীর দিদির দিকে তাকিয়ে বললাম, তাহলে আমিও আপনাকে দিদি বলেই ডাকব।

উনি হেসে বললেন, শুধু দিদি বললে হবে না…

তার মানে?

আপনি বলা ছাড়তে হবে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আরেকবার প্রণাম করে বললাম, এই না হলে দিদি!

দিদি আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, দুচারদিন দিদির কাছে না থেকে চলে যেও না।

এবার বোধহয় থাকা হবে না; তবে এর পর থেকে তোমার ওখানেই উঠব। পিসী যে ব্যবহার করছে…

কালবিলম্ব না করে পিসী আমার একটা কান ধরে বললেন, হতভাগা বেইমান কোথাকার!

আচ্ছা, দিদি, তুমিই বল বেইমান না হলে আজকালকার দিনে কেউ উন্নতি করতে পারে?

দিদি আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন কিন্তু কথা হল পরের দিন সকালে গিয়ে সারা দিন ওঁর ওখানে কাটাব। তার পরের দিন রাত্রে আমি কলকাতা রওনা হবো।

আজ, অনেকদিন পরে, সেদিনকার কথা মনে করে অবাক হই। বিস্ময়বোধ করি। দিদির সঙ্গে পিসীর এমন কোন আত্মীয়তা ছিল না। নিছক দুটি হতভাগিনী বিধবা কাশীর বাঙালীটোলার গলিতে বাস করতে গিয়ে কাছাকাছি এসেছেন। লতারপাতায় খুঁজে পেতে একটা ক্ষীণ আত্মীয়তার যোগসূত্র আবিষ্কার করেছেন। আমার সঙ্গে দিদির পরিচয় হবার কোন কারণ ছিল না। কোন প্রয়োজন ছিল বলেও তখন মনে হয় নি। স্নেহ, মায়া, মমতা, সমাদরের কাঙাল ছিলাম বলেই আমিও ভাবাবেগে ভেসে গিয়েছিলাম। বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে একে সমর্থন করা যায় না কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি যুক্তি-তর্ক বা ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করে ত মানুষের জীবনের গতি নির্ধারিত হয় না। বহমান নদীর মত জীবন আপন বেগে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। যাবেই।

দিদি যাবার আগে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, কিভাবে তোমার বাড়ি চিনব দিদি?

ভয় নেই, দেবীকে পাঠিয়ে দেব।

কে দেবী?…

আমার নাতনী দেবযানী।

ও আচ্ছা!

ভেবেছিলাম দেবযানী আট-দশ বছরের ছোট্ট সুন্দরী হবে। আমি ওর গাল টিপে আদর করে জিজ্ঞাসা করব, তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে? ও ঠোঁট উল্টে বলবে, হ্যাঁ। আমি ত হরদম এখানে একলা একলা আসি। আমি একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করব, সত্যি? আমাকে ছুঁয়ে বল। দেবযানী সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের উপর হাত রেখে বলবে, এইত তোমাকে ছুঁয়ে বলছি আমি একলা একলা এ বাড়ি আসি। তারপর দেবযানীর হাত ধরে এগুতে এগুতে কত কি গল্প করব। কিন্তু পরের দিন সকাল বেলায় পিছন দিক থেকে ওর গলা শুনেই চমকে উঠলাম।

আপনি কী তৈরী? আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

রোজ বেলা পর্যন্ত ঘুমুলেও আজ পিসীর ডাকাডাকিতে সকাল সকাল উঠেছি। তৈরী হয়েছি। পিসী গঙ্গায় স্নান করতে যাবার সময় বললেন দেবী এলে তুই চলে যাস। তবে যাবার সময় দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করতে ভুলিস না।

সব দরজা জানলা বন্ধ করব কেন?

সব দরজা-জানলা বন্ধ না করলে কখন যে বাঁদর-টাদর ঘরে ঢুকবে তার কি ঠিক আছে?

পিসী চলে যাবার পর আমি দুদিন আগের বাংলা খবরের কাগজটা পড়তে বসেছিলাম। এমন সময় দেবযানীর গলা শুনেই পিছন ফিরে অবাক হলাম। যে ছোট্ট দেবযানীকে আমি প্রত্যাশা করছিলাম, যার ফোলা ফোলা গাল টিপে আদর করব ভেবেছিলাম, এ তো সে নয়। আমার বিস্মিত দৃষ্টি ওর চোখে পড়তেই ও একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে আমাকে বললো, আমি দেবযানী। আপনাকে নিতে পাঠিয়েছেন!

জানি।

তাহলে চলুন। দিদি আপনার জন্য হাঁ করে বসে আছেন।

কেন?

দেবযানী একটু হেসে বললো, সেকথা ত আপনারই জানার কথা।

ওর কথা শুনে আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে ও দরজার কাছে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করল, আপনি কী তৈরী?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

তাহলে আপনি উঠুন। আমি জানলাগুলো বন্ধ করি।

এবার আমি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, পিসী আপনাকেও কি জানলা দরজা বন্ধ করার কথা বলেছেন?

না, না, উনি বলবেন কেন? ঘরে লোকজন না থাকলে এখানে সবাই দরজা-জানলা বন্ধ রাখেন।

দরজা-জানলা বন্ধ করে দেবযানীর পিছন পিছন নীচে নামলাম। বারান্দা

পার হয়ে সদর দরজার দিকে এগুতে এগুতে ও একটু জোর গলায় বললো, সুধা পিসী, আমরা যাচ্ছি। উপরের দিকে একটু খেয়াল রেখো।

সুধা পিসী নিজের ঘর থেকেই জবাব দিলেন, আচ্ছা।

বাঙালীটোলার গোলকধাঁধা বেশ কিছু দূর পার হবার পর দেবযানী জিজ্ঞাসা করল, একলা একলা ফিরতে পারবেন ত ?

কি যেন ভাবতে ভাবতে ওর পাশে পাশে বা পিছন পিছন হাটছিলাম। আশেপাশের কিছুই প্রায় নজর করে দেখি নি। ওর প্রশ্ন শুনে একটু লজ্জিত বোধ করলাম। বললাম, ঠিকানা ত জানি। নিশ্চয় ফিরে আসতে পারব।

ঠিকানা জানলেই কি সব জায়গায় পৌঁছনো যায় ?

আমি ওর কথার কোন জবাব দিলাম না। বোধহয় দিতে পারলাম না। কথা বলা একটা আর্ট। শুধু বকবক করলেই কথা বলা হয় না। আমি হয়ত ওর প্রশ্নের একটা জবাব দিতে পারতাম, কিন্তু কেমন যেন একটা দ্বিধা এসে আমাকে বোবা করে দিল। এতগুলো বছর পরের বাড়িতে কাটিয়ে আমি অন্যের কাছে সহজ হতে পারি না। পিসী বা দিদির অনেক বয়স হয়েছে। তাছাড়া ওর দুজনেই এত সহজভাবে আমাকে কাছে টেনেছেন যে আমিও সহজ হতে পেরেছি কিন্তু দেবযানী ত ওদের মত বুড়ী নয়। সে যুবতী। সুন্দরী। আমি তার কাছে সহজ হবো কেমন করে ? যাঁরা দশজন আপন-জনের মধ্যে থাকেন তাঁরা অপরিচিতের কাছেও সহজ হতে পারেন কিন্তু আমার মত যাঁরা আপনজনের সাহচর্য থেকে সারা জীবন বঞ্চিত থেকেছে তারা নিজস্ব গণ্ডীর বাইরে কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারবে না।

মুখ বুজে মাথা নীচু করে আরো কিছু দূর যাবার পর হঠাৎ দেবযানী জিজ্ঞাসা করল, কী এত ভাবছেন ?

কিচ্ছু ভাবছি না।

তাই কি হয় ? নিশ্চয়ই কিছু ভাবছেন।

সত্যি কিছু ভাবছি না।

মানুষের মন কি কখনও শূন্য থাকতে পারে ? সব মানুষই সব সময় কিছু না কিছু ভাবেনই।

তাই নাকি ?

দেবযানী হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, জানেন না কথায় বলে, মানুষের মন কুমোরের চাক, পলকে দেয় আঠারো পাক।

এবার আমিও হাসতে হাসতে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি ত বেশ প্রবাদ জানেন দেখছি।

বিশেষ জানি না, তবে ভানুদার কাছে শুনতে শুনতে কখনও কখনও দুচারটে মনে পড়ে যায়।

ভানুদা কে ?

পিসীর কাছে ভানুদার কথা শোনেন নি ?

না তো !

ভানুদার সঙ্গে কোন আত্মীয়তা নেই, কিন্তু ভারী ভাল মানুষ। তাছাড়া আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।

উনি কি করেন?

বিশেষ কিছু করেন না। পড়াশুনা, গান-বাজনা, আড্ডা-গল্প করেই দিন কাটান।

খুব বড়লোকের বাড়ির ছেলে বুঝি?

না, না, অত্যন্ত সাধারণ স্কুল মাস্টারের ছেলে। এককালে চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য করে যা জমিয়েছিলেন তাই ভাঙিয়েই চালিয়ে দিচ্ছেন।

অপরিচিত মানুষ সম্পর্কে খুব বেশী কৌতূহল দেখান উচিত নয়। তাই আমি আবার চুপ করে ওর পিছন পিছন হাঁটতে লাগলাম।

ভানুদার সঙ্গে আলাপ করবেন? আমাকে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই দেবযানী বললো, খুব ভাল লাগবে আপনার।

ভানুদার এত প্রশংসা শোনার পর না বলতে পারলাম না। বললাম, ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ করতে আপত্তি থাকবে কেন? পরের বার এসে নিশ্চয়ই আলাপ করব।

কেন? এবার কী হল?

এবার আর সময় কোথায়? কালই ত চলে যাচ্ছি। একটু থেমে বললাম, শুনেছি বিনা পরিশ্রমে পরের অন্ন ধ্বংস করার অভ্যাস হয়ে গেলে আর বদলান যায় না। তাই আর দেরী না করে কালই চলে যাব।

দেবযানী একটু হাসল।

একবার চোখ তুলে ওর হাসিমুখ দেখে মুখ বুজে ওর পিছন পিছন চললাম। সরু গলি। পুণ্য লোভাতুর বিধবার দল আমাকে এড়িয়ে চললেও মিনিটে মিনিটে ষাঁড়ের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিলাম। হাজার হোক কলকাতার ছেলে। মানুষের ভিড়ে হাঁটাচলা করার অভ্যাস থাকলেও গায়ের উপর ষাঁড় এসে পড়লে ভয় না করে পারি না। দেবযানী বোধহয় তা বুঝতে পেরেছিল।

তাই তো বললো, আপনাদের ত অভ্যাস নেই তাই ষাঁড় দেখতে অস্বস্তি হয়। দু-চারবার কাশী এলে আর অস্বস্তিবোধ করবেন না।

আমি শুধু বললাম, বোধহয়।

দেবযানী একটু হাসতে হাসতে বললো, এখানে কথাই আছে—

রাঁড়, ষাঁড়, সিঁড়ি, সন্ন্যাসী
চার বাঁচিয়ে বাস কর কাশী।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, দেখছি এখানে সবকিছু ব্যাপারেই হয় একটা সংস্কৃত শ্লোক, না হয় একটা ছড়া শুনতেই হবে। আসল কথা, ভাগ্যবানের কিনা হয়, অভাগার কিনা ভয়।

বাঃ! আপনিও ত বেশ প্রবাদ জানেন দেখছি।

জানি না, ঠেকে শিখেছি।

আরো একটু উত্তরে-দক্ষিণে, ডাইনে-বাঁয়ে চলার পর দেবযানী হঠাৎ দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে একটা বাড়ি দেখিয়ে বললো, ঐ দোতলা গোলাপী বাড়িতেই ভানুদা থাকেন।

ভানুদা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ না দেখালেও দেবযানী যখন ওর বাড়িটা দেখাল তখন আর ওকে নিরাশ করতে পারলাম না। বললাম, চলুন, একটু ঘুরে যাই।

এবার থাক। পরের বারই···

ওর বাড়ির পাশ দিয়েই যখন যাচ্ছি তখন একটু আলাপ করে যেতে পারব না?

খুশির হাসি হেসে ও বললো, চলুন।

ভানুদার বাড়িতে পেঁছতে এক মিনিটও লাগল না। সদর দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকেই গোটা দুই-তিন সিঁড়ি টপকে দেবযানী ডানদিকের ঘরে গিয়েই পিছন ফিরে আমাকে ডাকল, আসুন, আসুন।

আমি ঘরে ঢুকেই অবাক। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, নাকি ক্লাব ঘর? কী নেই এ-ঘরে? বিরাট তক্তাপোষের উপর সতরঞ্জি পাতা। গোটাকতক বালিশ-তাকিয়া ছড়ান। কিছু বইপত্তর, খবরের কাগজ ছাড়াও একটা হারমোনিয়াম আর তবলা কাৎ হয়ে পড়ে আছে। এছাড়া আছে তিন-চারটে এ্যাশট্রে আর গোটা দুই পিকদানি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সারা রাত্তির ধরে এখানে গান-বাজনা বা নাটকের রিহার্সাল চলেছে। ঘরের যিনি অধীশ্বর তিনিও কম দর্শনীয় নন। বয়সে প্রৌঢ়, না বৃদ্ধ বোঝা কঠিন। পরণে গেরুয়া লুঙি, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। সারা মুখে দাড়ি। চোখে সুন্দর রোল্ডগোল্ডের চশমা। হাতে একখানা বই। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকতেই উনি বললেন, বসো, প্রদীপ বসো।

বসলাম কিন্তু মনে মনে একটু অবাক হলাম। এমনভাবে উনি আমাকে কথা বললেন যেন আমি ওঁর অতি পরিচিত। এবার উনি একটু নড়ে-চড়ে বসে আমাকে বললেন, গিন্নীর কাছে তোমার খুব প্রশংসা শুনছিলাম। তাই মাকে বলেছিলাম যদি পারিস, তাহলে এই অন্ধকারের মানুষটাকে একটু প্রদীপের আলো দেখিয়ে যাস।

কথাটা শুনে ভাল লাগলেও লজ্জা পেলাম। মুখ নীচু করলাম।

দেবযানী আমার পাশে বসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বোধহয় ভানুদার সব কথা ঠিক ধরতে পারলেন না, তাই না?

আমি মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতেই দেবযানী বললো, দিদি হচ্ছেন ভানুদার গিন্নী আর আমি ওর মা।

ভানুদা এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই বল, আমার মত লোকের ওর চাইতে ভাল গিন্নী হতে পারে?

ওর কথায় আমি হাসি।

তুমি হাসছ? কিন্তু বিশ্বাস কর অমন পতিব্রতা স্ত্রী আর দ্বিতীয়টি পাবে না।

এবার আমি কথা বলি, আমি ত অবিশ্বাস করছি না, তবে হিংসা না করে পারছি না।

আমার মাকে তোমার কেমন লাগল ?

আমি দেবযানীর দিকে তাকাতেই ও হাসল। বললাম, মতামত দেবার মত পরিচয় এখনও হয় নি।

ভানুদা হাসতে হাসতে বললেন, ভার্জিন মেরীর ছেলে মহামতি যীশু আর ভার্জিন মা, দেবযানীর ছেলে এই পশু ভানুদা।

দেবযানী দপ করে জ্বলে উঠল, এভাবে কথা বললে আমি এক্ষুনি চলে যাব।

ভানুদা একটু করুণ হাসি হেসে বললেন, তুইও যদি আমার উপর রাগ করিস, তাহলে আমি কি করে বাঁচব বলতো মা ? এবার উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বুঝলে প্রদীপ, মার বড্ড অভিমান।

আমি বললাম, সন্তানের কাছেও মা অভিমান করতে পারবেন না ?

এক টিপ নস্যি নাকে দিতে দিতে উনি বললেন, তাও ত বটে। আর কার কাছেই বা মা অভিমান জানাবে ?

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কিন্তু মনে হল ভানুদা লুকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। দু-এক মিনিট সবাই চুপচাপ। তারপর ভানুদা বললেন, যাই হোক প্রদীপ, তুমি আসায় ভালই হল। তিনজনে মিলে নরক গুলজার করা যাবে!

হ্যাঁ, পরের বার এসে…

পরের বার এসে মানে ?

দেবযানী বললো, উনি কালই চলে যাচ্ছেন।

হ্যাঁ, দাদা, বেশ কদিন হয়ে গেল।

কেন ? আমাকে আর মাকে প্রথম দিন দেখেই কাশীতে অরুচি ধরে গেল ?

না, না দাদা, ও কথা বলবেন না। নতুন দুটো-তিনটে টিউশনি শুরু করেই চলে এসেছি তাই—

তুমি শুধু ছাত্র পড়াও ?

হ্যাঁ।

চলে যায় ?

চলে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু এ কাজে ত কোন নিশ্চয়তা নেই।

ভানুদা একটু গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর দেবযানীকে বললেন, মা প্রদীপের ঠিকানাটা তোর কাছে রেখে দিস ত।

আচ্ছা।

তোরা এবার যা, গিন্নী নিশ্চয়ই ভাবছে।

দেবযানী আমাকে বললো, চলুন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ভানুদাকে বললাম, চলি, আবার দেখা হবে।

নিশ্চয়ই দেখা হবে। ভানুদা একটু মুচকি হাসি হেসে বললেন, আমি পাপী-তাপী মানুষ। সুতরাং বেশ কিছুকাল বহাল তবিয়তেই থাকব।

এ-সংসারের পাপ পুণ্যির বিচার করার ভার আপনাকে কে দিল?

ভানুদা কিছু বলার আগেই দেবযানী আমাকে বললো, ঠিক বলেছেন।

ভানুদা আবার একটু হাসতে হাসতে বললেন, কিন্তু মা, পাপ যে করেছি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এবার আমি বললাম, অনুতপ্ত দস্যু রত্নাকরই বাল্মীকি হয়েছিলেন। অনুতপ্ত মানুষ ত আর পাপী থাকতে পারে না দাদা।

ভানুদা একবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে দেবযানীকে দেখেই আমাকে বললেন, আনন্দে, খুশীতে, কৃতজ্ঞতায় মার মুখখানা কি রকম ঝলমল করছে দেখ।

ইচ্ছা থাকলেও লজ্জায় আমি ওর দিকে তাকাতে পারলাম না।

ভানুদা একটু জোরেই বললেন, কি হল ভাই? এত লজ্জা কিসের?

আমি ওর দিকে তাকাবার আগেই দেবযানী বললো, চলুন প্রদীপবাবু, চলুন। ওদিকে দিদি আপনার জন্য হাঁ করে বসে আছেন।

আমি দু'হাত জোড় করে ভানুদাকে নমস্কার করে বললাম, চলি দাদা।

ভানুদা একটু এগিয়ে এসে আমার কাঁধে দুটো হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আবার কবে আসছ ভাই?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আসা-যাওয়ার ভাড়া জমিয়েই চলে আসব।

সত্যি আসবে ত?

মনে হচ্ছে আসতেই হবে।

ভানুদা একবার দেবযানীকে দেখে নিয়েই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার জন্য নাকি মার জন্য আসতে হবে?

দেবযানী বলে উঠল, আঃ! ভানুদা।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, বোধহয় নিজের জন্যই আসতে হবে।

আর দাঁড়ালাম না, সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

দু-এক মিনিট চুপচাপ চলার পর দেবযানী জিজ্ঞাসা করল, ভানুদাকে কেমন লাগল?

কোন মানুষকেই আমার খারাপ লাগে না।

এটা কোন উত্তরই হল না।

কেন?

মন্তব্য না করাটাই কোন উত্তর নয়।

বোধহয় তাই।

তবে আপনাকে ওর খুব ভাল লেগেছে।

আপনি বুঝলেন কিভাবে?

ওর কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি।

আপনার সঙ্গে বুঝি ওর অনেক দিনের পরিচয়?

পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়, কিন্তু সম্পর্কটা খুব গভীর হয়ে গেছে। ঐ অন্ধকার ঘরেও সেটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি।

তাই নাকি?

নিজে খুব বেশী মানুষের ভালবাসা না পেলেও অন্যের স্নেহভালবাসার গভীরতা বুঝতে পারি।

শুধু আপনি কেন বহু মানুষের জীবনেই স্নেহ-ভালবাসা জোটে না।

তাতো বটেই কিন্তু আপনারা ত আমাদের জীবনের জ্বালা বুঝতে পারেন না।

দেবযানী একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা মানে?

মানে আপনার মত সুখী ছেলে-মেয়েরা।

আমি সুখী কি দুঃখী জানলেন কী করে?

কিছুই জানি না; তবে আন্দাজ করছি।

আন্দাজ করবারও ত কিছু কারণ থাকবে।

সে ত আপনাকে দেখলেই বেশ বোঝা যায়।

তাই বুঝি?

আপনার মুখের হাসি দেখলে মনেই হয় না আপনি জীবনে কোন দুঃখ পেয়েছেন।

আর কিছু না হোক আপনার কথাগুলো শুনেও ভাল লাগল।

আমি শুধু হাসলাম। কোন কথা বললাম না।

দু-এক পা এগিয়েই দেবযানী একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বললো, আসুন। এটাই আমার দিদির বাড়ি।

আমি ওর পিছন পিছন ঢুকতেই হঠাৎ দিদির গলা শুনলাম, হ্যাঁরে দেবী, প্রদীপ নিশ্চয়ই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল, তাই না?

আমি কিছু বলব ভাবছিলাম কিন্তু তার আগেই দেবযানী বললো, দেখ ত দিদি, উনি এখনও ঘুমুচ্ছেন কিনা?

দিদি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই জেগে আছিস ত?

তিন তলা বাড়ি। তিন তলার তিনখানা ঘর বাদে পুরো বাড়িতেই ভাড়াটে। তবে পিসীর বাড়ির মত দিদির বাড়িতে ভাড়াটেদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। বাড়ির পিছন দিকের অংশ দিদির শ্বশুরমশায়ের এক ভাই পেয়েছেন বলে ভাগ্যক্রমে দিদির ভাগ্যে একটা অতিরিক্ত সিঁড়ি জুটেছে। বসবার ঘরে মেহগনী কাঠের আসবাবপত্র দেখেই বুঝলাম, বিধাতা পুরুষ দিদির সৌভাগ্যের একটা দরজা বন্ধ করে রাখলেও অন্য দরজা খুলে রেখেছেন।

আমি প্রণাম করতেই দিদি বললেন, রোজ রোজ কেউ প্রণাম করে নাকি ?

আমি কিছু বলার আগেই দেবযানী বললো, অযথা আপত্তি করছ কেন, মনে মনে ত খুশীই হচ্ছো।

তুই চুপ কর হতভাগী !

দিদির কথায় আমিও হাসি, দেবযানীও হাসে।

হাসি থামলে দিদি দেবযানীকে বললেন, তোরা জলখাবার খেয়ে নে। আমি বাবার মাথায় একটু জল দিয়ে আসি।

দেবযানী বললো, এত বেলা ঘুরে আসতে পারলে না ?

তোরা না এলে আমি যাই কি করে ?

আমি বললাম, যাও দিদি, তাড়াতাড়ি করে এসো।

আমার কথায় দেবযানী হাসতে হাসতে বললো, দিদি তাড়াতাড়ি আসবে ? তাহলে আর···

তুই এবার একটা থাপ্পড় খাবি দেবী।

দেবযানীর হাসি যেন থামতে চায় না। হাসতে হাসতেই বললো, দিদির কাছে কানমলা বা একটা-আধটা থাপ্পড় খেয়ে অনেক কিছু পাওয়া যায়।

তার মানে ?

এবার দিদি হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, তুই ও হতভাগীর কথায় কান দিস না। তোরা জলখাবার খেয়ে নে ; আমি এখুনি আসছি।

দিদি চলে যেতেই দেবযানী বললো, অসম্ভব সেণ্টিমেণ্টাল মানুষ। যদি কদাচিৎ কখনও কাউকে একটু বকুনি টকুনি দিলেন তাহলে পরে তাকে যে কিভাবে খুশি করবেন তা উনি ভেবে পান না।

আমি একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললাম, আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ে-পুরুষই সেণ্টিমেণ্টাল। সুতরাং দিদিকে দোষ দিয়ে কি লাভ ?

আপনিও বোধহয় খুব সেণ্টিমেণ্টাল ?

যখন মানুষ হয়ে জন্মেছি সেণ্টিমেণ্ট নিশ্চয়ই আছে ; তবে খুব সেণ্টিমেণ্টাল কিনা জানি না।

আমি বসেছিলাম। দেবযানী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এবার বললো, দাঁড়ান, আপনার জলখাবার নিয়ে আসি।

দিদি শুধু আমাকে খেতে বলেন নি।

জানি।

দেবযানী ভিতরে চলে গেল। আমি বসে বসে ঘরের আসবাবপত্র, ছবি পেণ্টিং দেখছিলাম। আমি কোন রাজবাড়ি দেখি নি। জমিদার বাড়িতেও যাই নি। কিন্তু মনের মধ্যে রাজা-উজীরের বাড়ির যে ছবি আছে তার সঙ্গে দিদির বাড়ির এই ঘরের অনেক সাদৃশ্য দেখে একটু বিস্মিত হলাম। সোফা থেকে উঠে পড়লাম। ঘুরে ঘুরে পুরানো দিনের ছবি আর পেণ্টিং দেখছিলাম। একি দিল্লীর দরবারের ছবি ? কিছুক্ষণ ঐ পেণ্টিং-এর সামনে

দাঁড়িয়ে থাকার পর ডান দিকের বিরাট আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। এত বড় আয়না আমি জীবনে দেখি নি। শুধু এত বড় আয়না কেন নিজের পুরো চেহারাটা কি এভাবে কোনদিন দেখেছি! না।

টুটুনদের বাড়িতে একটা বড় আয়না ছিল কিন্তু এ-বাড়ির আয়নার মত অত বড় নয়। এর চাইতে অনেক ছোট। একদিন বোধহয় ভুল করেই ঐ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিলাম। হঠাৎ হাসির আওয়াজ পেতেই তাকিয়ে দেখি টুটুনের মা-বাবা আমায় দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছেন। ওদের বিদ্রুপের সে হাসি দেখে আমি লজ্জায় আর অপমানে যেন মরে গেলাম। তারপর সাহস সঞ্চয় করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় টুটুনের মা কোনমতেই হাসি চেপে বললেন, কিরে একটু স্নো-পাউডার না মেখেই চলে যাচ্ছিস?

আজ দিদির বাড়ির এই বিরাট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে গিয়েও টুটুনের বাবা-মার মুখই বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বোধহয় সেদিনের সেই অপমান আর গ্লানির কথা মনে করেই মুখ নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম।

কি এত ভাবছেন?

দেবযানী কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, কিছুই টের পায় নি। হঠাৎ ওকে পাশে দেখতে পেয়েই একটু লজ্জিত বোধ করলাম। একবার ওর দিকে তাকিয়েই মুখ নীচু করে আগের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

কি হয়েছে বলুন ত আপনার? অনেকক্ষণ ধরে দেখছি আপনি কি যেন ভাবছেন।

আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন?

দশ-পনের মিনিট ত হবেই।

সে কি? ডাকলেন না কেন?

একটু হেসে দেবযানী বললো, ডেকেছিলাম কিন্তু কোন জবাব পাই নি।

আমি আরো লজ্জিত বোধ করলাম। কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে সোফার দিকে পা বাড়ালাম।

আর এখানে বসতে হবে না। ভিতরে চলুন।

ভিতরে কেন?

খাবেন না?

খাবার প্লেটটা নিয়ে আসুন; এখানে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিচ্ছি।

দেবযানী হাসল। বললো, না, তা সম্ভব নয়।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সম্ভব নয় মানে?

ভিতরে গেলেই বুঝতে পারবেন।

আর কোন কথা না বলে ওর পিছন পিছন ভিতরের ঘরের ঢুকেই অবাক। প্রায় স্তম্ভিত।

বসুন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখেছন?

এই জলখাবার ?

দেবযানী নির্বিকার হয়ে বললো, হ্যাঁ।

আমার জন্যই যদি এই আয়োজন হয় তাহলে আপনার বর এলে দিদি কি ব্যবস্থা করবেন ?

সে দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই।

কেন ?

আপনার চাইতে আমার বরকে দিদি বেশী ভালোবাসেন, একথা আপনি জানলেন কি করে ?

জেনেছি মানে অনুমান করছি।

আপনার অনুমান ঠিক নয়।

কেন ?

একটু রাগের ভান করে ও বললো, এখন অত কেনর জবাব দিতে পারব না। আপনি খেতে বসুন।

এ ধরনের রাজকীয় আপ্যায়নে আমি অভ্যস্ত নই।

কিছু রাজকীয় আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয় নি। আপনি বসুন।

আমি একটু হাসলাম। বললাম, নানাজনের অনুগ্রহে এতগুলো বছর কাটিয়ে এখন আর এ ধরনের আপ্যায়ন আমার সহ্য হবে না।

এককালে পরের অনুগ্রহে জীবন কাটিয়েছেন বলে ত এখন আর কারুর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেন না।

তা হলেও হঠাৎ অভ্যাস বদলানো ত যায় না।

আজকে থেকে অভ্যাস বদলানো শুরু করুন।

এই ধরনের আদর-আপ্যায়ন অভ্যাস হয়ে গেলে আমার ভবিষ্যৎ কি হবে ভেবে দেখেছেন ?

যত দিন দিদি আছেন কিছু চিন্তা নেই।

দিদি আর কদিন ? তারপর কি হবে ?

আগে বসুন ; তারপর আপনার সব কথার জবাব দেব।

কিন্তু...

দোহাই আপনার।

বসছি কিন্তু আমার একটা কথা রাখুন।

কি কথা ?

একটা প্লেট আনুন। দুজনে ভাগ করে খাই।

দেবযানী প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত সামান্য কিছু দায়-দায়িত্ব নিতে রাজী হল। দরজার কাছে গিয়ে বললো, দিদি, একটা খালি প্লেট দিয়ে যাও ত !

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন বিধবা মহিলা ঘোমটা টানতে টানতে ঘরে ঢুকে একটা খালি প্লেট ওর হাতে দিয়েই চলে গেলেন। অনেক ওজর-আপত্তি অগ্রাহ্য করে কিছু খাবার ওকে তুলে দিলাম।

জলখাবার খেতে খেতে বললাম, এখানে বেশীদিন না থাকাই ভাল।

কেন ?

বেশীদিন থাকলে কি এই আদর-যত্ন পাওয়া যায় ?

এই আদর-যত্নের লোভেই কি আপনি কাল চলে যেতে চাইছেন ?

পুরোপুরি না হলেও আংশিক সত্য নিশ্চয়ই।

চমৎকার।

এভাবে ঠাট্টা করছেন কেন ?

ঠাট্টা করছি না ; আপনার কথা শুনে অবাক হচ্ছি।

অবাক হচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

কেন ?

সারা দুনিয়ার মানুষ আদর-যত্ন স্নেহ-ভালবাসা পাবার কাঙাল আর আপনি সেই আদর-যত্ন স্নেহ-ভালবাসাই ভোগ করতে চান না ?

এসব সম্পদ ত কোনদিন ভোগ করি নি তাই ভয় হয়।

কিসের ভয় ?

যদি ফুরিয়ে যায় ? যদি হারিয়ে ফেলি ?

দেবযানী হাসল।

আমি একটু বিস্মিত হয়েই বললাম, আপনি হাসছেন ?

এসব সম্পদ ফুরিয়েও যায় না, হারিয়েও যায় না।

আপনি এসব সম্পদ চিরকাল পেয়েছেন বলে হয়ত একথা বলছেন কিন্তু আমি ত কোনদিন এর স্বাদ পাই নি, তাই—

তাই ভয় হয় ?

হ্যাঁ।

আপনি কাল কলকাতা যাচ্ছেন না।

তার মানে ?

আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না।

কেন ?

আপনার ভুল ধারণা বদলাবার জন্য।

সে সুযোগ পরেও পাওয়া যাবে।

দেবযানী হাসি চেপে বললো, যদি ফুরিয়ে যায় ? হারিয়ে যায় ?

পাহারা দেবার জন্য ত আপনাকে রেখে যাচ্ছি।

আমি পাহারা দেব ?

হ্যাঁ, আপনি।

কিন্তু আমি নিজেই যে ঐ সম্পদের একজন দাবিদার ?

আমার অংশটাও না হয় আপনিই পাহারা দিলেন।

হাসতে হাসতে দুজনে উঠে পড়লাম।

বসবার ঘরে আসতেই আমি বললাম, বাইরে থেকে বোঝাই যায় না আপনারা এত বড়লোক।

দেবযানী একটু জোরেই হেসে উঠল। তারপর হাসি থামলে বললো, কি করে বুঝলেন আমরা বড়লোক?

কলকাতার যে কোন মধ্যবিত্ত এই ঘরে ঢুকেই বলবে আপনারা বড়লোক। তাছাড়া আমি ত এইমাত্র আপনাদের জীবনযাত্রার মানদণ্ডের পরিচয় পেয়ে এলাম।

আর্গুমেণ্ট সাউণ্ড হলেও মামলায় আপনি জিতবেন না।

কেন?

একবার যখন দিদির স্নেহের দৃষ্টি পড়েছে তখন এ বাড়িতে আপনাকে আসা-যাওয়া করতেই হবে। সুতরাং আস্তে আস্তে সব জানতে পারবেন।

বুঝলাম, এ প্রসঙ্গে আর আলোচনা না করাই উচিত। তাই চুপ করে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর দেবযানী জিজ্ঞাসা করল, আমাদের বেনারস আপনার কেমন লাগল?

আমি ত বেনারসের বিশেষ কিছুই দেখি নি।—

সে কি?

হ্যাঁ। শুধু বিকেলের দিকে গোধুলিয়ার মোড় থেকে দশাশ্বমেধ ঘাট পর্যন্ত একটু ঘোরাঘুরি করেছি।

আর কোথাও যান নি?

না।

বিশ্বনাথের মন্দিরে যান নি?

না।

কেন?

ভেবেছিলাম আজ একবার ঘুরে আসব কিন্তু এখানে এলাম বলে আর গেলাম না।

তাহলে আমাদের জন্য আপনার বিশ্বনাথ দর্শন হল না?

তাতে আমার কোন দুঃখ নেই।

আপনি কি বলছেন?

ঠিকই বলছি। আর যাই হোক বিশ্বনাথের মত খামখেয়ালী ভগবানের চাইতে আপনারা অনেক নির্ভরযোগ্য।

ওদিকের সোফায় বসে শ্বেত পাথরের সেণ্টার টেবিলের উপর দু হাত রেখে একটু ঝুঁকে পড়ে দেবযানী বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ একথা বলছেন কেন?

আমি হেসে বললাম, আপনাদের বাবা বিশ্বনাথের খামখেয়ালীপনার জন্য আমি অতি শৈশবে মাকে হারিয়েছি।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম হঠাৎ অনেকগুলো প্রশ্ন ওর মনের মধ্যে ভিড় করল কিন্তু মুখে কোন প্রশ্ন করল না। নিঃশব্দে মুখ নীচু করে বসে রইল।

আমিও কিছুক্ষণ চুপ করে মুখ নীচু করে বসে রইলাম। তারপর ওর দিকে চেয়ে দেখি সারা মুখে বেদনার ছাপ, সমবেদনার ইঙ্গিত। মুহূর্তের জন্য আমিও মনে মনে বেদনা অনুভব করলাম কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর সমবেদনা-শীল মনের পরিচয় পেয়ে সারা মনটা খুশীতে ভরে গেল। আমি চুপ করে বসে থাকলেও একটা বিচিত্র আনন্দময় উত্তেজনায় মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

কতক্ষণ এভাবে দুজনে চুপচাপ বসেছিলাম, জানি না। হঠাৎ দিদিকে সামনে দেখে চমকে উঠলাম।

কিরে, তোরা দুজনেই চুপচাপ বসে আছিস। ঝগড়াঝাটি হল নাকি?

দিদির কথায় হেসে উঠলাম।

দেবযানী গম্ভীর হয়ে বললো, হ্যাঁ দিদি, সত্যি খুব ঝগড়া করেছেন।

বিনা মেঘে বজ্রঘাত! আমি স্তম্ভিত হয়ে বললাম, আমি ঝগড়া করেছি?

জলখাবার নিয়ে ঝগড়া করেন নি?

আমি কি উত্তর দেব? শুধু হাসি।

দিদি হাসতে গিয়েও হাসলেন না। গম্ভীর হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে, তুই বলে সত্যি সত্যি কাল চলে যাবি?

হ্যাঁ।

না না বাপু, কাল যাস না।

কেন? কাল কি হয়েছে?

কাল দিনটা ভাল না। তুই কাল-পরশু থেকে রবিবারে যাস।

আমি ত দিন-ক্ষণ দেখে আসিও নি, যাচ্ছিও না।

হয়ত কিছুই হবে না কিন্তু মনটা যখন খচ্ খচ্ করছে, তখন আর যাস না।

কিন্তু—

আমাকে কথাটা বলতে না দিয়েই দিদি বললেন, বাবার মন্দির থেকে ফেরার পথে তোর পিসীর সঙ্গে দেখা হল। তুই কাল যাবি বলে ওরও মনটা একটু উতলা হয়ে আছে। তাই বলছিলাম এ দুটো দিন না হয় আমার কাছেই থেকে যা।

সরাসরি অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। বললাম নতুন কয়েকটা টিউশনি শুরু করেই চলে এসেছি। তাই—

দেবযানী বললো, পিসী আর দিদি যখন এত করে বলছেন তখন না হয় দুটো দিন থেকেই গেলেন।

পিসি আর দিদি বললেও আপনি ত কিছু বলেন নি।

দিদি আমার দিকে একটু বকুনি দেবার সুরে বললেন হা ভগবান। তুই এই হতভাগীকে আপনি বলছিস? ও তোর চাইতে পুরো দু বছরের ছোট।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কি বলব?

কি আর বলবি? তুমি বলবি। নাম ধরে ডাকবি।

যদি উনি রাগ করেন?

রাগ করলে দুটো থাপ্পড় লাগিয়ে দিবি।

মিট মিট করে হাসতে হাসতে দেবযানী জিজ্ঞাসা করল, শুধু থাপ্পড় দেবেন?

বিচারপতির গাম্ভীর্য নিয়ে দিদি বললেন, দরকার হলে কান মলাও দেবে।

দেবযানী এবার আমাকে বললো, তাহলে আপনি কালই চলে যান। আপনাকে আর আমাদের এখানে থাকতে হবে না।

দিদি ওকে একটা চড় মারতে যেতেই দেবযানী একটু দূরে সরে গেল।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, তুমি যখন আপত্তি করছ তখন ত নিশ্চয়ই এ দুটো দিন থেকে যাচ্ছি।

খুশীতে দিদি এক গাল হাসি হাসতে হাসতে দেবযানীকে বললেন, লক্ষ্মী দিদি আমার, এই খবরটা ওর পিসীকে দিয়ে আয় ত।

আমি পারব না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, তুমি কিছু ভেব না দিদি আমিই দিয়ে আসছি।

তুই যদি রাস্তা গুলিয়ে ফেলিস?

একটু বেশী ঘুরপাক খেলেও ঠিক যেতে পারব।

তাহলে যা ত বাবা। ও আমাকে বার বার করে বলেছিল···

আমি আর দাঁড়ালাম না। সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় পা দিলাম। হন হন করে এগিয়ে ডানদিকে মোড় ঘুরতেই পিছনে দেবযানীর গলা শুনলাম, ওদিকে না।

আমি থমকে পিছন ফিরতেই ও বললো, আর একটু এগিয়ে ডান দিকে ঘুরতে হবে।

তাহলে তুমি এলে?

না এসে কি করব?

দিদি আসতে বললেন?

না।

না এলেই বোধহয় ভাল করতে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

পিসীর বাড়ি পর্যন্ত যেতে হল না। কিছুদূর এগুতেই সুধা পিসীর সঙ্গে দেখা। পিসীকে খবরটা পেঁছে দেবার কথা ওকেই বলে দিলাম। দিদির বাড়ির দিকে দু-এক পা এগুতেই আমি দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাশী তোমার কেমন লাগে?

দেবযানী একটু হেসে বললো, অন্য দু-চারটে শহর না দেখে কি করে কাশীর নিন্দা বা প্রশংসা করি ?

তুমি অন্য কোথাও যাও নি ?

সামান্য সময়ের জন্য এদিক-ওদিক গিয়েছি। তবে সে বিশেষ কিছু না।

তুমি কি এখানেই বরাবর ?

তা বলতে পারেন।

তোমার বাবা-মা এখানেই থাকতেন ?

না। বাবা এখনও কুচবিহারে আছেন।

তাই নাকি ?

শুনে অবাক হলেন নাকি ?

না, অবাক না, তবে তুমি···

কুচবিহারে থাকি না কেন ?

আমি শুধু ওর মুখের দিকে চাইলাম। কিন্তু পাল্টা প্রশ্ন করতে পারলাম না।

হঠাৎ ও জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে কি বলে ডাকব বলুন ত ?

যা ইচ্ছে।

একটু উদাস দৃষ্টিতে দেবযানী আমার দিকে তাকিয়ে শুকনো হাসি হেসে বললো, মেয়েরা কি ইচ্ছামত কিছু করতে পারে ?

আর কিছু না হোক যা ইচ্ছা বলে তুমি আমাকে ডাকতে পারো।

আচ্ছা দেখা যাক।

চুপচাপ একটু এগিয়ে যাবার পর জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি তোমাকে খুব ভালবাসেন তাই না ?

হ্যাঁ।

তোমার বাবা তোমাকে দেখতে আসেন না ?

না।

আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, আশ্চর্য !

আশ্চর্যের কি আছে ? এই পৃথিবীতে কটা মানুষের জীবন সোজা, স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চলে ? আপনি পেরেছেন ? নাকি আমি পারছি ?

আমি আবার চুপ করলাম।

তাছাড়া আরেকটা কথা জানবেন। এই বাঙালীটোলার অলিগলির মত এখানকার প্রায় সব মানুষের জীবনই এঁকে-বেঁকে অন্ধকার অলি-গলিতে হারিয়ে গেছে।

তার মানে ?

এখানকার প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে।

তাই কি কখনও হতে পারে ?

দেবযানী হেসে জিজ্ঞাসা করল, হতে পারে না ?

মনে হয় না।

আপনি ব্যক্তিগতভাবে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেলেও কটা মানুষ দেখেছেন? হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে দেবযানী জিজ্ঞাসা করল, জানেন দিদির জীবনে কত কি ঘটেছে?

আমি কি করে জানব?

জানেন, দিদির স্বামীকে খুন করা হয়?

সে কি?

একটু ঔদাসীন্যের হাসি হেসে ও বলল, এই তীর্থক্ষেত্রে কত রকমের জীব-জানোয়ার বাস করে তা ভাবতে পারবেন না। গঙ্গার ঘাটের ধারে ধারে বিকৃত, পঙ্গু, কুষ্ঠরোগীদের ভিড় দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এখানকার যেসব মানুষদের সুস্থ-স্বাভাবিক বলে মনে হয় তারাও এক বিরাট বিকলাঙ্গ ছাড়া কিছুু নয়।

হঠাৎ মনে হল ভানুদার বাড়ির কাছে এসে গেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, ডান দিকেই ভানুদার বাড়ি না?

হ্যাঁ।

চলো, ওকেও বলে আসি কাল যাচ্ছি না।

চলুন।

ভানুদার বাড়ির দরজায় পৌঁছতেই ভেতর থেকে তবলা বাজাবার আওয়াজ শুনতে পেলাম। দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভিতরে কি গান-বাজনা হচ্ছে?

না। বোধহয় ভানুদাই বাজাচ্ছেন।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই ভানুদা দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল ত জননী কি বাজাচ্ছি?

আড়ি, তাই না?

ভানুদা তবলা পাশে সরিয়ে রেখে বললেন, তোর ছেলের বাজনা তুই বুঝবি না।

কথাটা ভারী ভাল লাগল। উনি কিছু না বললেও ওর তক্তপোশে বসেই বললাম, গান-বাজনার আসর বসবে নাকি?

না, না। এমনি বসে বসে টংকারযন্ত্র নাড়াচাড়া করি।

টংকারযন্ত্র কি?

ভানুদার জবাব দেবার আগেই দেবযানী বললে, তবলার আরেক নাম টংকারযন্ত্র।

মনে হচ্ছে সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে তোমারও বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে।

দেবযানী হেসে আমার কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও ভানুদা বললেন, জননী কি চমৎকার ঠুংরী গাইতো তা তুমি ভাবতে পারবে না কিন্তু—

দেবযানী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমরা একটা খবর দিতে এসেছিলাম।

কি খবর জননী ?

আমাদের নতুন আত্মীয় আরও দুদিন কাশী বাস করবেন।

ভানুদা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দেখ ভায়া, পদ্মপুরাণের সেই নবপল্লবিত শাখা, মণি-মুক্তা-হীরক সদৃশ পুষ্পরাশি বা কোকিলের সুমধুর কলরব আর শরচ্চন্দ্র সমকান্তি বৃষভ গাত্রবেষ্টিত মুনিগণ কাশীতে দেখা যায় না। সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। কিন্তু ভায়া তবু এই নোংরা জঘন্য শহরটায় এমন কিছু আছে যা চট করে ছেড়ে যাওয়া যায় না।

আমি একটু হেসে বললাম, বোধহয়।

একটু জোরে নিশ্বাস ছেড়ে ভানুদা বললেন, বোধহয়! তোমার টিউশনির পুরো টাকা এবার থেকে রেল কোম্পানীই নিয়ে নেবে।

তাহলে ত মারা পড়ব দাদা !

মাথা নাড়তে নাড়তে উনি বললেন, কোন উপায় নেই ভাই। সত্যি এ এক বিচিত্র শহর। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে নিত্য আসছে। কেউ বাবা বিশ্বনাথের চরণে মাথা রাখার জন্য, আবার কেউ বা আসছেন সারা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় বাঈজীকে বিলিয়ে দিতে।

বাবা বিশ্বনাথ বা বাঈজীদের জন্য আমি আসব না।

কিসের জন্য আসবে জানি না, তবে আসতে হবেই। না এসে পারবে না। যে মৃত্যুকে আমরা সবাই ভয় পাই, সেই মৃত্যুকে বরণ করার জন্য পৃথিবীর আর কোন্ শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে যায় বলতে পারো ?

সত্যি কোনদিন ভাবিনি, কিন্তু ভানুদার কথা শুনে মুহূর্তের জন্য মক্কা-মদিনা জেরুজালেম থেকে শুরু করে সারনাথ বুদ্ধগয়া পার হয়ে রামেশ্বরম্ থেকে একেবারে কেদারনাথ বদ্রীনাথ ঘুরে এলাম। না, আর কোথাও লক্ষ লক্ষ মানুষ বৈতরণী পারের জন্য এমনভাবে ভীড় করে বলে শুনি নি। বললাম, সত্যি খুব আশ্চর্যের ব্যাপার।

ভানুদা একটু অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, কোন না কোন মোহে বা আকর্ষণে সবাইকেই এখানে আটকে পড়তে হয়। আমি কোন মোহে বা কার আকর্ষণে এখানে লটকে পড়েছি জান ?

না।

বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার দেবযানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এই জননীর জন্যই আমি বাবা বিশ্বনাথের জমিদারীতে পড়ে আছি। এই জননীকে না পেলে আজ আমাকে কোথায় দেখতে পেতে জান ?

কোথায় ?

ডাল-কা-মণ্ডীতে।

সেখানে কে আছেন ?

দেবযানী যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললো, এসব আজে-বাজে কথা আলোচনা করে কি লাভ ?

ভানুদা ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যি কথা বল জননী, প্রদীপকে খুব আপন লোক মনে হচ্ছে না ?

দেবযানী কিছু না বলে মুখ নীচু করে বসে রইলো।

ভানুদা বললেন, ভয় নেই জননী, প্রদীপ আমাকে খারাপ ভাববে না। এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাল-কা-মণ্ডীতে কারা থাকেন জান ?

কারা ?

এই পৃথিবীর সমস্ত সুখী-দুঃখী মানুষদের অসংখ্য বান্ধবীরা সেখানে থাকেন।

আমি কিছু বুঝলাম না। একটু বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে একবার ভানুদার দিকে চাইলাম।

মুচকি হেসে ভানুদা জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝলে না ভায়া ?

আমি মাথা নাড়লাম।

ওটা বেনারসের ভারত বিখ্যাত বাঈজী-পাড়া।

বাঈজী-পাড়া শুনেই আমি চমকে উঠলাম। বোধহয় লজ্জায় ঘেন্নায় আমার মুখের চেহারা বদলে গেল। দেবযানী নিশ্চয়ই খেয়াল করেছিল। তাই বললে, এসব পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে কোন লাভ আছে ভানুদা ?

কেন রাগ করছিস মা ? এসব কথা যত তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিই ততই ভাল।

আমি বললাম, হাজার হোক আমি একজন বাইরের লোক। আমাকে এসব কথা বলার প্রয়োজন আছে কি ?

ভানুদা হাসতে হাসতে বললেন, যখন গিন্নী আর জননীর কাছে স্নেহ-ভালবাসার প্রশ্রয় পেয়েছ তখন তোমাকে কোন কথা বলতেই আপত্তি নেই। যাই হোক আজ আর বিশেষ কিছু বলব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো ভায়া, একবার যখন গিন্নী আর জননীর পাল্লায় পড়েছ তখন তোমার আর চিন্তাও নেই, মুক্তিও নেই।

দেবযানী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলুন দিদি নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন।

চলো।

ভানুদা জিজ্ঞাসা করলেন, এখুনি যাবে জননী ?

হ্যাঁ যাই। যদি পারি বিকেলের দিকে আসব।

আচ্ছা।

রাস্তায় নেমেই আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভানুদা একটু বিচিত্র ধরনের লোক, তাই না ?

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে মানুষটা নিখাদ সোনা, বিন্দুমাত্র ভেজাল নেই।

তা ঠিক।

ভাল মানুষ বলে সবাই ওকে ঠকিয়েছে। দুটি ছোট ভাইবোন পর্যন্ত ভানুদাকে কিভাবে ঠকিয়েছে তা আপনি ভাবতে পারবেন না। তারপর

ভবানীপুরের বিরাট দোকান আর কাটোয়ার বিষয়-সম্পত্তি বিক্রী করে এই কাশীতে এসে নান্নীজান নামে এক বাঈজীর পাল্লায় পড়লেন।

হঠাৎ তোমাদের সঙ্গে আলাপ হল কি করে?

আমি কিছুকাল এক ওস্তাদের কাছে গান শিখতাম। একদিন তাঁরই ওখানে ভানুদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

তারপর?

তারপর ওখানেই মাঝে মাঝে দেখা হতো। আস্তে আস্তে ওর বিষয়ে অনেক কিছু শুনলাম। সব কিছু শুনে ওর উপর রাগ হল, ঘেন্না হল। এরপর ওস্তাদজীর ওখানে ওর সঙ্গে দেখা হলেও আমি কথাবার্তা বলতাম না।…

খুব স্বাভাবিক।

বেশ কিছুদিন পরে একদিন বিকেলের দিকে কেদার ঘাটে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ ওঁর সঙ্গে দেখা। আমি কোন কথা না বলেই চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু উনি ডাক দিতে না দাঁড়িয়ে পারলাম না।…

হঠাৎ উনি ডাক দিলেন কেন?

ডাক দিয়ে বললেন, আমাকে গান শোনাবে কবে? হঠাৎ আমি রেগে জবাব দিলাম, আমি নান্নীজান বাঈজী না। ব্যস, আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

আবার কোথায় দেখা হল?

এরপর ওস্তাদজীর ওখানে আর ওকে দেখতাম না। শেষে একদিন ওস্তাদজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেই বাঙালী ভদ্রলোকের কি খবর?

ওস্তাদজী বললেন, বেটি, কোন গান-বাজনার আড্ডাতেই আর ওকে দেখি না।

কথায় কথায় দিদির বাড়ি পেঁাছে গেছি। আমি বাইরের ঘরে বসলাম। দেবযানী ভিতর থেকে ঘুরে আসতেই বললাম, ভানুদার কাহিনী শেষ করো।

ভানুদার সব কাহিনী বলতে গেলে ত রাত কাবার হয়ে যাবে।

তবুও সংক্ষেপে শুনি।

কয়েক মাস পরে আবার ঐ গঙ্গার ধারেই ওর সঙ্গে দেখা। উনি আমাকে দেখেই মুখ নীচু করলেন কিন্তু ওর চেহারা দেখে এত খারাপ লাগল যে আমি কিছুদূর এগিয়ে গিয়েও ফিরে এলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এত শরীর খারাপ কেন? কি হয়েছে আপনার।

ভানুদা মুখে কিছু না বলে শুধু মাথা নেড়ে বললেন, কিছু হয় নি।

কি অসুখ করেছিল আপনার?

না, অসুখ করে নি।

অসুস্থ না হলে কারুর এই চেহারা হয়?

সত্যি অসুখ করে নি।

তাহলে কি হয়েছিল?

কিছু ত হয় নি।

আজকাল গান-বাজনার আড্ডায় যান না কেন ?

ভানুদা ব্যাকুল শূন্য দৃষ্টিতে দেবযানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাল লাগে না।

দেবযানী বুঝল কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। দু-এক মিনিট চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাসা করল, এতকাল কোথায় ছিলেন ?

ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

কবে ফিরলেন ?

আজ সকালে।

এই শরীর নিয়ে আজ না বেরুলেই চলছিল না ?

ভানুদা চুপ করে রইলেন।

দেবযানী জিজ্ঞাসা করল, বাড়ির কেউ বারণ করলেন না ?

এখানে আমার কেউ নেই।

আপনি একলাই এখানে থাকেন ?

সর্বত্রই আমি একলা থাকি।

আপনি কি কাশীরই লোক ?

না।

তাহলে এই শরীর নিয়ে এখানে এলেন কেন ?

ভানুদা আরেকবার ব্যাকুল করুণ দৃষ্টিতে দেবযানীকে দেখে বললেন, সত্যি কথা বলব মা ?

বলুন।

শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য কাশীতে এসেছি।

দেবযানী চমকে ওঠে, আমার সঙ্গে দেখা করতে ?

হ্যাঁ মা, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

কেন ?

বলতে এসেছি আমি আর বাঈজী-বাড়ি যাই না।

দেবযানী অবাক, কিন্তু আমাকে কেন ?

মনে হল তোমার কাছে জবাবদিহি না করা পর্যন্ত মনে শান্তি পাব না।

ভানুদার কাহিনী শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলতে পারলাম না। বোবার মত চুপ করে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে দেবযানী বললো, সেই সেদিন থেকেই আমি ভানুদার মা জননী। সত্যি ভানুদা আমাকে মায়ের মত ভালবাসেন, শ্রদ্ধাও করেন।

আমি বললাম, তুমিও ওকে সন্তানের মতই ভালবাসো।

সন্তানকে কিভাবে ভালবাসতে হয় তা ত আমি জানি না, তবে ভালবাসি এটা ঠিক।

আদর-আপ্যায়ণ গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে সারা দিনটা বেশ ভালই কাটল। বিকেলের দিকে পিসীর বাড়ি যাবার আগে দিদি বললেন, দ্যাখ প্রদীপ, তুই একটা খুব আপনজন না হলেও খুব দূরেরও ভাবতে পারি না। তোর মত

আমাদেরও আপনজন বিশেষ কেউ নেই। তাই বলছিলাম, যখন খুশী চলে আসিস, কোন দ্বিধা করিস না ভাই।

না, না, দিদি, কোন দ্বিধা করব না।

তাহলে আসবি ত ?

নিশ্চয়ই আসব।

এর পরের বার এসে এখানেই উঠিস।

উঠব।

কাল-পরশু একবার করে ঘুরে যাস।

দিদিকে প্রণাম করে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই দেবযানী বললো, দাঁড়ান, দাঁড়ান আমিও আসছি।

পিছন ফিরে ওকে বললাম, তুমি আবার কেন কষ্ট করবে ? আমি একলাই যেতে পারব।

দিদি বললেন, একলা যাবি কেন ? ও যাক। তাছাড়া এই অলিগলিতে কোথায় ঘুরপাক খাবি···

আমি হাসতে হাসতে বললাম, দিদি, আমাকে বোধহয় সারা জীবনই ঘুরপাক খেতে হবে।

দেবযানী বললো, আপনি সব সময় এভাবে কথা বলবেন না ত।

অপরের দয়া-দাক্ষিণ্যে এতদিন কাটিয়ে এখন আর কোন ব্যাপারেই জোর করে কিছু বলতে পারি না।

দিদি বললেন, এবার নিশ্চয়ই ভগবান মুখ তুলে দেখবেন।

আমি হাসতে হাসতে দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এবার কি বলব ?

বলুন, ভগবান কি করবেন জানি না, তবে আমি ঠিকই এগিয়ে যাব।

দিদি হাসলেন। আমিও হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম।

রাস্তায় পা দিয়েই বললাম, জান দেবযানী, এবার—

আমাকে বিশেষ কেউ দেবযানী বলে না।

তা জানি কিন্তু···

এই কিন্তু কিন্তু ভাবটা আপনি ছাড়ুন ত। অন্যান্যদের মত আপনিও আমাকে দেবী বলেই ডাকবেন।

সেটা কি ঠিক হবে।

দোহাই আপনার। এই দ্বন্দ্ব থেকে আপনি মুক্ত হোন। ছোটখাটো ব্যাপারেও আপনি ঘাবড়ে যান কেন বলুন ত ?

ঘাবড়ে যাচ্ছি না। ভাবছি···

ভাবছেন লোকে কি ভাববে ?

আমি একটু হাসলাম।

দেখুন লোকের ভাবনা-চিন্তায় আমার বা আপনার কি আসে যায় ? লোকের ভাবনা-চিন্তাকে পরোয়া করলে এভাবে ভানুদার সঙ্গে মিশতে পারতাম না।

এতক্ষণ ভেবে দেখি নি কিন্তু এবার ভেবে দেখলাম, লোকলজ্জা বা সমাজের অনুশাসনকে ভয় করলে দেবযানীর মত কোন মেয়ে এত ঘনিষ্ঠভাবে নামীজান বাঈজীর ভক্তের সঙ্গে মিশতে পারত না। বোধহয় আমাকেও এভাবে সহজ সরল ভাবে…

দেবযানী জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছেন ?

তোমার কথাই ভাবছি ?

ভাবছেন বোধহয় এমন বেহায়া মেয়ে আর দুটো হয় না, তাই না ?

বেহায়া ভাবি নি কিন্তু তুমি এত সহজভাবে আমার সঙ্গে কথাবার্তা, ঘুরাফেরা করছ দেখে একটু অবাক হচ্ছি।

তার কারণ আছে।

কি কারণ ?

অনেক মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, আনন্দ, হৈ-হুল্লোড় করতে আমার খুব ইচ্ছা করে কিন্তু সে ইচ্ছা কোনদিন পূর্ণ হল না বা হবে না বলেই…

এ কথা বলছ কেন ? আনন্দ করার দিন ত তোমার পড়ে রয়েছে।

দেবযানী একটু মলিন হাসি হেসে বললো, এখনও অনেকদিন বাঁচব মানেই ত আনন্দের দিন পড়ে আছে, তার কোন মানে নেই।

একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাসা করলাম, কেন আমার সঙ্গে এমন-ভাবে মিশলে তা ত বললে না ?

শুনতে চান ?

হ্যাঁ।

দিদি আর পিসির কাছে আপনার কথা শুনে মনে হল আপনার জীবনের সঙ্গে আমার অনেক মিল আছে।…

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। তাছাড়া ওরা দুজনে আপনার প্রশংসায় এমনই পঞ্চমুখ যে আপনার সঙ্গে ভালভাবে মেলামেশা বা বন্ধুত্ব করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

জান দেবী আমার কোন বন্ধু নেই।

বন্ধু নেই বলছেন কেন ? আমি ত আছি।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, তুমি ?

হ্যাঁ আমি।

কলকাতা ফিরে এলাম। সেই মেস সেই টিউশনি সেই পরিচিত পরিবেশ। আগের মত সকালে উঠছি। চা-টোস্ট খেয়ে ছাত্র পড়াতে যাচ্ছি। ক্লান্ত হয়ে মেসে ফিরছি। চান করছি খাচ্ছি ঘুমুচ্ছি। ঘুম থেকে উঠে চা খাচ্ছি আবার ছাত্র পড়াতে বেরুচ্ছি, ঘুরতে ঘুরতে মেসে ফিরছি, খাচ্ছি, শুয়ে পড়ছি।

মোটামুটি এই আমার জীবন। প্রতিদিনের দিনপঞ্জী। এর মাঝে কখনও অমাবস্যা কখনও পূর্ণিমা। ভালমন্দের নানারকম ব্যতিক্রম।

কোনকালেই আমি মিশুকে না। হঠাৎ কারুর সঙ্গে আলাপ করতে পারি না। বেশী কথাবার্তাও বলি না। শামুকের মত সবসময় নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করি। বোধহয় ভালবাসি। নাকি অভ্যাস।

প্রথম দিন ছাত্র পড়াতে গিয়েও ঘোষবাবুর বাড়ির সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালাম। দু-পাঁচ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কি ভাবলাম। পড়াতে পারব ত? ছাত্র যদি অসভ্যতা করে? যদি আমার কথা না শোনে? যদি ঘোষবাবু বা তাঁর স্ত্রী ভাল ব্যবহার না করেন। যদি পড়াবার সময় ওর মা-বাবা বা দিদি-দাদা অন্য কেউ কাছে বসে বসে আমাকে দেখেন, তাহলে? অপরিচিত মানুষের সংস্পর্শে আসতে সব সময় আমার দ্বিধা, সংকোচ। হয়ত বা একটু ভীতিও। তারপর অনেক সাহস সঞ্চয় করে কড়া নাড়লাম। ঘোষবাবুর স্ত্রী ভিতরে নিয়ে গেলেন। সুবিমানকে পড়াতে শুরু করলাম। আস্তে আস্তে সব দ্বিধা, ভয় কেটে গেল। কাশী থেকে ফিরে এসে যেদিন প্রথম গেলাম সেদিন আবার অনেক দ্বিধা নিয়েই গেলাম কিন্তু কি আশ্চর্য! ঘোষবাবু দরজা খুলে দিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, কবে ফিরলে?

কাল।

পিসী আটকে দিয়েছিলেন ত?

হ্যাঁ।

তোমার এই পিসীর ত কোন ছেলেমেয়ে নেই তাই না?

না।

তাহলে ত আটকাবেনই।

কিন্তু সুবিমানের বড় ক্ষতি হল। আমি অনেক চেষ্টা করে ও···

এই কদিনে আবার কি ক্ষতি হবে?

কল্পনাকে পড়াতে গেলে আরো মজা হল। ওর মা বললেন, জান বাবা আজ দশ বছর ধরে ওকে বলছি একবার কাশী নিয়ে চল কিন্তু কিছুতেই আর ওর সময় হয় না। এবার ঠিক করেছি গরমের ছুটিতে বড় মেয়েটা এলেই তোমাকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ব।

কল্পনার মার কথা শুনে আমি হাসি কিন্তু কোন কথা বলি না।

তুমি হাসছ? কেন তুমি আমাদের একটু ঘুরিয়ে আনতে পারবে না?

তা পারব না কেন? এখান থেকে কাশী যাওয়ার ত কোন ঝামেলা নেই। রাত্রে বোম্বে মেলে চাপলে সকালেই মোগলসরাই। তারপর বাস-ট্যাকসিতে আধ ঘণ্টাও লাগে না।

আমি এমনভাবে বললাম যেন প্রতি শনিবারে-শনিবারে কাশী যাই। ওখানকার সবকিছু যেন আমার নখ-দর্পণে।

কল্পনার মা বললেন, তবে আবার কি? তাছাড়া এ ত হিল্লী-দিল্লী না যে ঘুরে আসতে হাজার টাকা লাগবে।

তাছাড়া কাশী বিশেষ খরচের জায়গাও না; বরং এখানকার থেকে অনেক সস্তা।

সে যাই হোক, এবার গরমের ছুটি পড়তে না পড়তেই কাশী যাচ্ছি। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

স্বামীর উপর ওর অভিমান দেখে আমি আবার হাসি। তারপর বলি, অফিসের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন বলে এতদিন যেতে পারেন নি কিন্তু আপনার যখন এত আগ্রহ তখন নিশ্চয়ই···

তোমার মাথা খারাপ হয়েছে প্রদীপ? উনি আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন? তাহলেই হয়েছে। বাইশ বছর ওকে নিয়ে ঘর করছি। এর মধ্যে একবার শুধু তারকেশ্বর···

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কল্পনা বললো, তবে যে তুমি দার্জিলিংয়ের গল্প করো?

তোর বাবা আমাকে দার্জিলিং নিয়ে যান নি, আমার বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন।

কাকাবাবুর পরামর্শে আমি তিরিশ টাকায় সিক্স-সেভেনের দুটি ছেলেকে পড়ান ছেড়ে দিয়ে কল্পনাকে পড়াচ্ছি। এখানেও তিরিশ টাকা পাচ্ছি কিন্তু শুধু ইংরেজি-বাংলা-সংস্কৃত পড়াতে হয়। কল্পনার মা কাকাবাবুর ছাত্রী। কল্পনার বাবাও কাকাবাবুকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। সেজন্য এ বাড়িতে আমি গৃহশিক্ষকের চাইতে কাকাবাবুর-বন্ধুপুত্র হিসেবে একটু বেশী মর্যাদা পাই। অন্য বাড়িতে ছাত্র পড়াতে গিয়ে শুধু এক কাপ চা পেলেও কল্পনার মা কোনদিন শুধু চা দেন না। যেদিন আর কিছু নেই সেদিন অন্ততঃ দুটি রুটি আর বেগুন ভাজা দেবেনই।

এ বাড়িতে ছেলেমেয়ে বলতে শুধু কল্পনাকেই দেখি। পড়াবার ঘরে দুটি মেয়ের ছবি আছে। তার মধ্যে একজন কল্পনা কিন্তু অন্যজনকে না

দেখে ভেবেছিলাম বোধহয় বেঁচে নেই। হঠাৎ কল্পনার মার মুখে বড় মেয়ের কথা শুনে বুঝলাম আমার ধারণা ভুল। কল্পনার দিদি বেঁচে আছে। পড়ার ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, কাশীতে খুব হনুমান আছে তাই না প্রদীপদা।

হ্যাঁ। হনুমান দেখলে তোমার ভয় করে নাকি?

হনুমান ত বাঘ নয় যে ভয় করব!

তোমার কি কাশী যেতে ইচ্ছা করে?

আমার সব জায়গাতেই যেতে ইচ্ছা করে কিন্তু দিদির জন্য কোথাও যাওয়া হয় না।

কেন?

ছুটিতে দিদি এলে এখানেই সময়টা কেটে যায়।

তোমার দিদি কোথায় থাকে?

দিদি দাদু-দিদার কাছে থেকেই ত পড়ে।

তোমার দাদু-দিদি কোথায় থাকেন?

কুচবিহারে।

আরো দু-চারটে প্রশ্ন করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু করলাম না। পড়াতে শুরু করলাম।

তিন-চার দিন পরে কল্পনার বাবার সঙ্গে দেখা। বসবার ঘরে বসেই ডাকলেন, এসো প্রদীপ এসো। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই।

কল্পনার মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, অত রাত করে বাড়ি ফিরলে তোমার সঙ্গে কার দেখা হবে।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিই বল প্রদীপ, ডাক্তার-উকিলরা কি সন্ধ্যের সময় বাড়ি বসে থাকতে পারে?

আমি কাকে সমর্থন করব? চুপ করে থাকি।

কল্পনার বাবা বললেন, চেম্বারটা মোমিনপুরে হয়েই অসুবিধা হয়েছে কিন্তু কি করব? চট করে বাপ-জ্যাঠার চেম্বারটা ছেড়ে আসতেও ভয় হয়।

আমি একটু সমর্থন না জানিয়ে পারলাম না। বললাম, তা ত বটেই।

কল্পনার বাবা শিবনাথবাবুর সঙ্গে এর আগে মাত্র তিন-চারদিন দেখা হয়েছে। প্রথম দিন কাকাবাবুর চিঠি নিয়ে ওর সঙ্গে এই বাড়িতেই দেখা করি। সেইদিনই ওকে আমার ভাল লাগল। উনি কাকাবাবুর চিঠিটা পড়েই বললেন, বীরেশ্বরদা যখন পাঠিয়েছেন তখন আমার ত আর কিছু বলার নেই। উনি নিশ্চয়ই তোমাকে সবকিছু বলেছেন?

হ্যাঁ, মোটামুটি...

ব্যস, ব্যস! তাহলেই লেগে পড়।

এরপর স্ত্রী আর মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কল্পনাকে বললেন, ইনি তোমার প্রদীপদা। তোমাকে পড়াবেন, প্রণাম করো।

কল্পনা এগিয়ে আসতেই আমি বাধা দিলাম, থাক্ থাক্।

কল্পনা প্রণাম করল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আজ চলি। কাল থেকে আসব।

স্বামী-স্ত্রী প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, চা না খেয়েই যাবে কেন?

কি করব? বসলাম। শুধু চা না সঙ্গে খানকয়েক লুচি আর মিষ্টিও এলো। বললাম, সকাল বেলায় চা-জলখাবার খেয়েই বেরিয়েছি। এখন এত—

কল্পনার মা বললেন, এত কিছু দেওয়া হয় নি। খেয়ে নাও।

এরপর আরও দু-তিনদিন দেখা হয়েছে। কাশী যাবার দু-এক দিন আগে এসে ক'টা টাকা চেয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

শিবনাথবাবু বেশী কথা বলেন না কিন্তু ওঁর আন্তরিকতা অনুভব করতে অসুবিধা হয় না।

শিবনাথবাবু হাসতে হাসতে বললেন, শুনলাম হার ম্যাজেস্টিস গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তোমার একটা চুক্তি হয়েছে।

আমি হাসলেও কল্পনার মা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, ঠাট্টা নয়, মেয়ে ছুটিতে এলেই যাচ্ছি।

নিশ্চয়ই যাবে একশ'বার যাবে। আমি কি বারণ করছি?

মনে মনে যে খুশী হও নি তা কি আমি জানি না?

শিবনাথবাবু আমার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললেন, দেখছ প্রদীপ এই হচ্ছে স্ত্রী। আমি কোর্টে গিয়ে দাঁড়ালে আসামীকে জামিন দিয়ে আনতে পারি কিন্তু স্ত্রীর কাছে আমি নিজেই আসামী।

আমি হাসি।

এবার কল্পনার মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হাজার হোক উকিল-বাবু। কথায় পেরে উঠবে না।

এইভাবেই দিনগুলো কেটে যায়। ক্যালেণ্ডারের এক একটা পাতা ছিঁড়ে ফেলি!

সেদিন দুপুরবেলায় মেসে ঢুকেই খবরের কাগজটা নেবার জন্য অফিসে ঢুকতেই কার্তিকবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এম-এ পাশ?

হ্যাঁ।

আগে বল নি কেন?

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, আপনি তো কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন নি।

আমি জিজ্ঞাসা না করলেই তুমি বলবে না?

কার্তিকবাবু বৃদ্ধ এবং ভদ্র। আপন মনে নিজের কাজকর্ম করেন। মেসের কারুর সঙ্গেই বিশেষ আজেবাজে কথা বলেন না। মনে পড়ে এই মেসে আসার দু-একদিন পরেই উনি আমাকে বলেছিলেন, তোমার সুবিধে-অসুবিধের কথা আমাকে বলো আর কাউকে বলো না।

আচ্ছা।

আর একটা কথা বলব।

বলুন।

হাজার হোক এটা মেস। নানা ধরনের লোক এখানে থাকেন। কারুর সঙ্গেই বেশী ভাব করো না। এসব মেস বাড়ির লোকজনের সঙ্গে বেশী মাথা-মাখি করলেই নিজের কাজের বারোটা বাজবে।

তা ত বটেই।

বিয়াল্লিশ বছর মেস চালাচ্ছি। অনেক দেখলাম, অনেক শিখলাম। আমার কথাটা মনে রেখো।

নিশ্চয়ই রাখব।

সকালে দুটি ছাত্র পড়িয়ে সাড়ে দশটা এগারটা নাগাদ মেসে ফিরি। কার্তিকবাবুর টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে যাই। বড়জোর একটু মুচকি হাসি। কার্তিকবাবু শ্রীকান্তর কাছ থেকে খুচরো বাজারের হিসেব নিতে বসলে ঐ হাসিটুকুও ভাগ্যে জোটে না। কদাচিৎ কখনও দুটো-একটা কথা। আজ হঠাৎ ওকে এভাবে কথা বলতে দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, আজ হঠাৎ এসব কথা জানতে চাইছেন কেন?

সকালে পিয়ন চিঠিপত্র দিয়ে গেল। তারপর ঘরে ঘরে চিঠি পাঠাতে গিয়ে দেখি একটা খামের উপর লেখা শ্রীপ্রদীপকুমার চ্যাটার্জী এম-এ....

আমার চিঠি?

হ্যাঁগো হ্যাঁ। আমি কি মিছে কথা বলছি?

না, না, তা বলছি না। তবে—

একে কোন দিন তোমার চিঠিপত্র আসে না, তারপর এম-এ লেখা দেখে আমি ত অবাক!...

দেখি চিঠিটা।

তোমার ঘরেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি এমন সময় কার্তিকবাবু চিৎকার করে বললেন, কাগজটা নিয়ে গেলে না।

একটু লজ্জিত হয়েই নেমে এসে কাগজটা নিয়ে উপরে গেলাম। দরজা খুলেই মেঝের উপর থেকে খামের চিঠিটা তুলে নিলাম। খাম খুলেই অবাক—বন্ধুবরেষু, আমি দেবী।

দেবযানীর চিঠি?

জানি আমার চিঠি পেয়ে অবাক হবেন। অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। আপনি চলে যাবার পর একটা চিঠি আশা করেছিলাম। দিদির চিঠি এলো। পিসীও বললেন, খুব সুন্দর ও বড় চিঠি পেয়েছেন। ভাবলাম এরপর নিশ্চয়ই আমার চিঠি আসবে। সপ্তাহ পার হল, মাস কেটে গেল। কিন্তু পিয়ন কোন দিনই আমার চিঠি দেয় না। একবার ভাবলাম আপনার চিঠির জন্য অপেক্ষা না

করে আমিই লিখি কিন্তু না, পারলাম না। অভিমান আর আত্মসম্মানবোধ বাধা দিল…

মনে মনে বড্ড অপরাধী মনে হল। সত্যি দেবযানীকে চিঠি লেখা উচিত ছিল। দু-একবার লিখব বলেও ভেবেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কথা ভেবে লিখিনি। এখন মনে হচ্ছে অন্যায় করেছি।

ভাবলাম, যে স্বেচ্ছায় মন থেকে আমাকে নির্বাসন দিয়েছে তাকে চিঠি লিখে বিব্রত না করাই কাম্য। এসব যুক্তি-তর্কের কথা। সামাজিক বিচার-বিবেচনার কথা। বেশী মানুষের সঙ্গে ত মিশি না! তাই ক'দিন আপনার সঙ্গে কাটিয়ে বড় বেশী পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ হয়েছি বলে মনে হচ্ছিল এবং মন বারবারই কাগজ-কলম নিয়ে বসতে বলেছিল। মনের কি বিচিত্র আবদার বলুন ত!…

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চিঠিটা পড়ছিলাম। চিঠিটা পেয়ে ও পড়তে এত ভাল লাগছে যে আস্তে আস্তে এগিয়ে বিছানায় বসলাম। ভাবতে পারি নি দেবযানী এত সুন্দর চিঠি লিখতে পারে। এত ভাল চিঠি পাব জানলে প্রতি সপ্তাহে ওকে একটা চিঠি লিখতাম।

আবার চিঠি পড়তে শুরু করলাম।…এখানকার নিশ্চয়ই কিছু খবর আছে। পরে বলছি। আগে বলুন, আপনি কেমন আছেন? শরীর? মন? ছাত্র-ছাত্রীরা কেমন আছে? নাকি ওদের ছেড়ে কোন অফিসের খাতায় নাম লিখিয়েছেন? সব খবর জানলে সুখী হবো। কলকাতা মহানগরীর অসংখ্য আকর্ষণের ভীড়ে কি আমার মত কাশীর সাধারণ মানুষগুলোকে একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন? নাকি কখনও কখনও মনে পড়ে?

মনে মনে বললাম, দেবী, হনুমানের মত যদি বুক চিরে দেখাতে পারতাম তাহলে দেখতে সেখানে কাশীর বাঙালীটোলার অন্ধকার গলির কয়েকজন বুড়ী বিধবা আর তুমি বহালতবিয়তে বসে আছো। তুমি আর ভানুদা আমাকে ট্রেনে তুলে দিলে কিন্তু ট্রেনটা চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, নেমে পড়ি। বারবার মনে হয়েছে ফিরে যাই। কলকাতায় গিয়ে কাজ নেই। দু-চারটে টিউশনি করে যা রোজগার করি তার অর্ধেক রোজগার করলেই আমি বেশ ভালোভাবে কাশীতে থাকতে পারব। ট্রেনে বসে সারাক্ষণই মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। তর্ক করেছি। কলকাতায় আমার কে আছে? কি আছে? কেন, কেন আমি কলকাতা ফিরে যাচ্ছি? হঠাৎ দেখি হাওড়ায় এসে গেছি। যুদ্ধ বন্ধ হল না; মনের সঙ্গে সাময়িক শান্তি চুক্তি করে নিলাম।

নিজের অজ্ঞাতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। আপন মনেই একটু হাসলাম। হাসছি কেন? তোমার কথা ভেবেই হাসছি। তুমি বিশ্বাস করছ না? বাবা বিশ্বনাথের নামে শপথ করে বলছি তোমার জন্যই হাসছি। কেন হাসছি? বলব? কার্তিকবাবুর এই মেসে বসে বসেই বলছি। তুমি সামনে থাকলে কিছুতেই একথা বলতে পারব না। অসম্ভব। দিদির বকুনির ভয়ে 'তুমি' বলেছি; তোমার কাছে তর্কে হেরে গিয়ে তোমাকে দেবী বলেই ডেকেছি

কিন্তু এর বেশী আমার দ্বারা হবে না। দিদি আমাকে যতই ভালবাসুন, আমি ত তাঁর কোন আত্মীয় না। আমার দূরসম্পর্কে আত্মীয়ের পিসীর শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে একটা ক্ষীণ যোগাযোগ মাত্র আছে। কোন কারণেই তোমাকে আমার আত্মীয়া বলা যায় না। তাই না। শুধু পরিচিতা মাত্র, কিন্তু তুমি ত দিদি বা পিসী না। তুমি দেবী, দেবযানী। জীবনের গ্রীষ্ম-বর্ষা এখনও তোমাকে স্পর্শ করে নি। শরৎ হেমন্ত পেরিয়ে সবে বসন্তোৎসবে মেতে উঠেছ। তোমার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ হই কি করে? যে কোন কারণেই হোক তুমি আমার চাইতে অনেক সাহসী। সমাজ-সংসারের তুচ্ছ বিদ্রূপ তুমি অগ্রাহ্য করতে পারো কিন্তু আমি অত সাহসী নই। মন চাইলেও বেশীদূর এগুতে সাহস হয় নি। তাইতো মনে মনে তোমাকে অনেক কথা বললেও কাগজে-কলমে কিছুই লিখতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত যদি কোন দুর্বলতার শিকার হই?

আমি কি পাগল হয়েছি? এসব কি ভাবছি। আবার হাসি? আবার ওর চিঠি পড়তে শুরু করলাম।

…যে কোন মেয়ের জীবনেই প্রথম পুরুষ হচ্ছে বাবা। এরপর আরো অনেক পুরুষেরা তার জীবনে আসে ভীড় করে। আমার জীবনের সেই পুরুষই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আমার মা মারা যাবার পর আমাকে অদৃষ্টের খেয়াঘাটে ফেলে তিনি তার জৈবিক দাবী মেটাবার জন্য অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে এক যজমান কন্যাকে নিয়ে নতুন সংসার পাতলেন। তাই তো শৈশব থেকেই পুরুষ মানুষ সম্পর্কে আমার বিতৃষ্ণা। ঘেন্নাও বলতে পারেন। বলতে পারেন ভানুদাই আমার জীবনের প্রথম পুরুষ যাকে আমি শ্রদ্ধা করেছি। কেন জানি না আপনাকে দেখেও আমার মনে কোন বিতৃষ্ণার ভাব আসে নি; বরং আপনার সঙ্গে মেলামেশা করে ভালই লেগেছে। তাই বোধহয় প্রতিদিনই আপনার চিঠির প্রত্যাশা করেছি।…

আনন্দে খুশীতে চিঠিখানা পড়তে পড়তেই শুয়ে পড়লাম।

…এ চিঠি লেখার একটাই কারণ। একটা দুঃসংবাদ জানাব! ভানুদা নেই। হঠাৎ চলে গেলেন। একটা বিচিত্র শূন্যতার অসহ্য জ্বালা ভোগ করছি।…

আমি চমকে উঠে বসলাম। ভানুদা নেই? মারা গিয়েছেন?

…বোধহয় আপনি আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছেন। আপনি যদি এসময় ক'দিনের জন্য আসেন তাহলে খুব ভাল হতো। দিদিরও খুব ইচ্ছা আপনি ক'দিনের জন্য আমাদের কাছে আসুন। নিশ্চয়ই আসবেন।

পরের দিন রাত্রেই আমি আবার বোম্বে মেলে চাপলাম। কোন দিন ভাবি নি। মাস চারেকের মধ্যেই আমি আবার মোগলসরাই যাব বলে বোম্বে মেলে চড়ব। চিরকালই ভেবেছি ভাঁটার টানে ভাসতে ভাসতেই বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় ওপরে যাবার একটা রিজার্ভেশন টিকিট পেয়ে যাবো। কিন্তু কি আশ্চর্য! কোথা থেকে যেন জোয়ারের জল ঢুকে পড়ছে আমার জীবনে।

গতবার পিসী সঙ্গে ছিলেন ! তাঁর সঙ্গে সারা রাত গল্প করেছি। এক মিনিটের জন্যও ঘুমুতে পারি নি। ঘুম আসে নি। এবার পিসী নেই, আমি একলা। পাশের যাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়েছেন কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। এত কথা এত কিছু মনে হচ্ছে যে ঘুমানোর ইচ্ছাই হচ্ছে না। ভানুদার কত কথা মনে পড়ছে। আমাকে ট্রেনে চড়িয়ে দিতে এসে বলেছিলেন, ভায়া আবার এসো।

আসবো বৈকি।

আসবে ত নিশ্চয়ই কিন্তু তাড়াতাড়ি এসো।

কেন ? কোন কারণ আছে নাকি ?

না না, কোন কারণ নেই ! তবে তাড়াতাড়ি এলেই ভাল। এবার দেবযানীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, জননী সত্যি কথাটা বলে দিই ?

দেবযানী বললো, আপনার যা ইচ্ছা বলুন।

ভানুদা আমার দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, কেন জানি না, তোমাকে বড্ড ভাল লেগেছে। তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

আমি কথা দিচ্ছি ভানুদা, আমি তাড়াতাড়িই আসব।

আর একটা কথা বলি ?

বলুন।

মন বলছে, তুমি ঠিক সময়েই এসেছ।

তার মানে ?

মানে জানি না ভায়া। তবে এক-একটা সময় এক-একজন মানুষকে দেখে মনে হয় তাকেই খুঁজছিলাম। কেদারঘাটে জননীকে দেখেও এই রকম মনে হয়েছিল।

ভাবতেই পারছি না সেই ভানুদাকে আর পাব না।

বিধাতা পুরুষের অশেষ মাহাত্ম্য। বিশ্বচরাচরে সর্বত্র তাঁর অসীম ক্ষমতার স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে। নদ-নদী পশু-পক্ষী ফুল ফল পাহাড় পর্বত সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি সবকিছু পারেন। এ হেন বিধাতা পুরুষও একই রকমের দুটি মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন না। আমি জানি শুধু কাশী কেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও আর একটি ভানুদা পাওয়া যাবে না।

সন্ধ্যাবেলা ডাল-কা-মণ্ডীতে নাম্নীজান বাঈজীর আসরে আজও নিশ্চয়

সঙ্গীতরসিকদের সমাগম হচ্ছে, নিকট আত্মীয়দের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে আজও কত মানুষ দশাশ্বমেধ বা কেদারঘাটে বসে শূন্য দৃষ্টিতে অস্তগামী সূর্যের আলোয় আবহমান গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকেন কিন্তু কোথাও কোনখানে ভানুদাকে পাওয়া যাবে না। মিশরের পিরামিড বা ব্যাবিলনের শূন্যোদান আজ আর তৈরি হবে না কিন্তু অসম্ভব আজও ঘটে। ভানুদা এ সংসারের একটি অপ্রত্যাশিত, অসম্ভব সৃষ্টি। সমাজ-সংস্কারের দৈন্য ও মালিন্যের অসংখ্য অলিগলির মধ্যে ঘুরাঘুরি করেও কোন দৈন্য কোন মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। আজকের যুগে পিরামিডের চাইতে এরাই বড় বিস্ময় !

এই বিস্ময়কর অসম্ভব অবাস্তব মানুষটির কথা ভাবতে ভাবতে কিভাবে যে সারাটা রাত কেটে গেল তা আমি টের পেলাম না। জানতে পারলাম না কখন ধানবাদ হাজারিবাগ গয়া পিছনে পড়ে রইল। সহযাত্রীদের চাঞ্চল্য ও হকারদের চিৎকার শুনে যখন প্ল্যাটফর্মের দিকে না তাকিয়ে পারলাম না তখন দেখি আমার বোম্বে মেল মোগলসরাই স্টেশনে পৌঁছে গেছে। ছোট স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লাম।

এর আগেরবার যখন পিসির সঙ্গে এই মোগলসরাই স্টেশনে নেমেছিলাম তখন যুবক হয়েও বুড়ী পিসির উপরই ভরসা করেছিলাম। সেদিন অবাক বিস্ময়ে এই অতিখ্যাত স্টেশনকে দেখেছিলাম। আজ আমার চোখে সে বিস্ময় নেই কিন্তু মনের মধ্যে হঠাৎ কেমন একটা বিচিত্র উত্তেজনা উন্মাদনা অনুভব করছি। মনে হচ্ছে এই স্টেশন আমার অত্যন্ত পরিচিত অত্যন্ত আপন। আমি যেন ছুটিতে বাড়ি যাবার সময় প্রতিবার এই স্টেশন দিয়েই যাতায়াত করি। এই স্টেশনে এলেই মনে হয় আমার আপনজনেরা এই ত গঙ্গার ওপারেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। তাদের কাছে গেলেই আমার সব দুঃখ সব দৈন্যের অবসান। ওভারব্রীজ পার হয়েই দেখি গোধুলিয়ার বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু আমি এক মিনিটও দেরী করতে চাই না। শেয়ারের ট্যাক্সিতেই চড়ে পড়লাম।

সেই জি টি রোড, সেই ডাফরীন ব্রীজ, পাশেই নীচের দিকে কাশী রেল স্টেশন। ব্রীজ পার হতেই রাস্তাটা বেঁকে গেল। একটু ঢালু। ডানদিকে কোন অজ্ঞাত বাদশার তৈরি একটা ছোট্ট স্মৃতিসৌধ নাকি গঙ্গার পারে বিশ্রামকেন্দ্র। ভারী সুন্দর। দেখলেই ইচ্ছা করে সারাদিন এখানে বসে থাকি। গল্প করি। সব পরিচিত মনে হচ্ছে। ট্যাকসি আরো খানিকটা এগিয়ে গেছে। ঐ ত রেলের ইঞ্জিন সান্টিং করছে। আর একটু এগিয়ে গেলেই ত ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশন। সাইকেল রিকশা ঠেলা গরুর গাড়ি মোষের গাড়ি মানুষ। সবই অসংখ্য। এছাড়াও মোটর বাস-লরী। পাশে হাট-বাজার-দোকান। সব মিলিয়ে মোটেই মনোরম পরিবেশ নয় কিন্তু তবু খারাপ লাগছে না ; বরং মনে হচ্ছে এগুলো পার হলেই ত বেনিয়াবাগ। পার্ক। তারপরই গোধুলিয়া। আমি ধারে বসেছি ! সবার আগে নেমে

পড়ব। সামনেই যে রিকশাটা দেখব তাতেই চড়ব। বড় জোর পাঁচ-সাত মিনিট। রিকশা থেকে নেমে ত মাত্র কয়েক মিনিটের পথ।

তারপর ?

খট খট করে দরজার কড়া নাড়তেই দিদির গলা শুনতে পেলাম, দেখ ত দেবী প্রদীপ এলো কিনা, এভাবে ত এখানকার কেউ কড়া নাড়বে না।

মনে হল কে যেন দৌড়তে দৌড়তে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। হঠাৎ পায়ের শব্দ থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সামনের বন্ধ দরজা খুলে গেল। দেবযানী! আমি ওর দিকে তাকিয়েই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বোধহয় অবিস্মরণীয় কয়েকটা মুহূর্ত।

দেবযানী আমার হাত থেকে স্যুটকেসটা নিতে নিতে বললো আমি জানতাম আজ আপনি আসবেন।

জানতে ?

হ্যাঁ।

আমি ত কোন চিঠি দিই নি।

চিঠিতে কি সব খবর জানা যায় নাকি জানান যায় ?

আবার দিদির গলা, প্রদীপ নাকি রে ?

দেবযানী একটু হাসিমুখে আমার দিকে একবার তাকিয়েই একটু জোর গলায় বললো, ভয় নেই দিদি তোমার পায়েস খাবার লোক এসে গেছে।

দরজা বন্ধ করে উপরের দিকে উঠতেই জিজ্ঞাসা করলাম, তার মানে ?

মানে আবার কি ? আপনি আসবেন ভেবে দিদি পায়েস করেছেন।

বলেন কি ?

আপনি ত জানেন না দিদি আপনাকে কত ভালবাসেন।

শুধু দিদি ?

দেবযানী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাতেই আমি লজ্জায় মুখ নীচু করলাম। বুঝলাম অন্যায় করেছি। আমি গল্প উপন্যাসের নায়ক হয়ে এখানে আসিনি। এদের উপর আমার কোন দাবী বা অধিকার নেই। এরা স্বেচ্ছায় যা দিচ্ছেন আমি তাতেই কৃতজ্ঞ। ধন্য।

আমি মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে পারলাম না। বলতে পারলাম না দেবী আমার অন্যায় হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করো। আমি স্থবিরের মত মুখ নীচু করেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেবযানীই এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটালো। বললো, আপনাকে যদি আপন জ্ঞান না করতাম তাহলে কি এভাবে চিঠি লিখতাম ? নাকি আপনিই এমনি এমনি ছুটে এসেছেন ?

আমি ওর দিকে তাকাতেই ও হেসে বললো, আমাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা-ভালবাসার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাই না!

আমি শুধু মাথা নেড়ে বললাম, নিশ্চয়ই।

আর কোন কথা না বলে ওর পিছন পিছন উপরে উঠতেই দেখি দিদি

দাঁড়িয়ে আছেন। আমি দিদিকে প্রণাম করতেই উনি আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি জানতাম তুই আসবি। না এসে পারবি না।

এভাবে ডাকলে না এসে থাকা যায় ?

দেবী লিখতে চায় নি কিন্তু আমিই বার বার করে বললাম আসতে লিখে দে'। তাছাড়া কতকাল ত আসিস না।

আমি হেসে ফেলি। বললাম, এই ত মাস চারেক আগেই এসেছিলাম।

মাস চারেক কি কম দিন হল ? তোর পিসী ত তোকে দেখবে বলে সকাল থেকে দুবার এসে ঘুরে গেছে।

তাই নাকি ?

দেবযানী স্যুটকেশ নিয়ে ভিতরে গিয়েছিল। এবার ঘুরে বললো, একি দিদি। এই বুড়ো ধাড়ী নাতিকে এখনও আদর করছ ?

দিদি আমাকে ছেড়ে দিয়েই বললেন, তব কি তোকে আদর করব ?

ওদিকে চায়ের জল ফুটে গেল।

দিদি আমাকে বললেন, চল বাবা চল। চা খেয়ে একটু জিরিয়ে নে। তারপর একবার পিসীর সঙ্গে দেখা করে আয়। ও বেচারা তোর জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে আছে।

আমি বসবার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম কিন্তু দিদি বললেন, এখানে আর বসিস না। আগে হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় বদলে নে।

এত ব্যস্ত হবার কি আছে ?

দিদি বললেন, দেবী তুই প্রদীপকে ভিতরের ঘরে নিয়ে যা। আমি আহ্নিকটা সেরে নিই।

বেশ বেলা হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, এখনও তোমার আহ্নিক হয় নি ?

নারে।

বাবার মাথায় জল দেওয়া হয়েছে ?

কোনমতে একটু জল ঢেলেই এসেছি। তুই ওর সঙ্গে যা। আমি আহ্নিকটা সেরে নিই।

দেবযানী ডাকল, আসুন।

আমি ওর পিছন পিছন ভিতরের দিকে একটা ঘরে ঢুকলাম।

আপনি এখানেই অবস্থান করবেন।

ঘরখানা বিশেষ বড় নয়। কার্তিকবাবুর মেসের ঘরের মতই হবে। একপাশে একটা পুরানো ধরনের ছোট্ট পালঙ্ক। ধবধবে সাদা চাদর-ঢাকা বিছানা। একটা ইজিচেয়ার, একটা টুল, দুটি মোড়া ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র ঘরে নেই। দেয়ালে একটা ব্র্যাকেট।

একটু বসবেন নাকি বাথরুমে যাবেন ?

আগে এক কাপ চা খেয়ে নেওয়াই ভাল না ?

তাহলে বসুন। চা আনছি।

দেবযানী চলে গেল। আমি আরেকবার ভাল করে ঘরের সব কিছু

দেখলাম। একটু অবাক হয়েই দেখলাম। কোথাও বাহুল্য নেই কিন্তু সর্বত্র আন্তরিকতার স্পর্শ। এবার সত্যি বুঝলাম আমি আসব বলে এরা সত্যি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন।

এ কি আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছেন ?

এই ঘরখানা দেখছি।

চায়ের কাপটা আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে দেবযানী জিজ্ঞাসা করল, ঘরে আবার কি দেখার আছে ?

সব কিছু।

সব কিছু ?

আমি চায়ের কাপে চুমক দিয়ে ইজিচেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ঘরে কে থাকেন ?

কেউ না।

দেখে ত মনে হয় না এ ঘর পরিত্যক্ত।

সত্যি এ ঘরে কেউ থাকে না। এমনি আলতু-ফালতু জিনিসপত্র পড়ে থাকে।

তাহলে আমার জন্য ত তোমাকে বেশ খাটতে হয়েছে।

কেন ?

একটা পরিত্যক্ত ঘরকে এই রূপ দেওয়া ত সহজ কথা নয়।

তাই বলে কি ঘরটাকে একটু পরিষ্কার করব না ?

ঘরটাকে ত শুধু পরিষ্কার করা হয় নি।

তবে আর কি হয়েছে ?

আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, আমি ত এই রকম আন্তরিকতা পেতে অভ্যস্ত না তাই একটু অস্বস্তিবোধ করি।

কোন মানুষের জীবনই চিরকাল একভাবে কাটে না।

তাই বলে এই সমাদর পাবারও ত আমার কোন অধিকার নেই।

দেবযানী যেন একটু রেগেই বললো, আপনি নিজেকে এত ছোট করবেন না ত। স্নেহ-ভালবাসা দু'হাতে বুকে তুলে নিতে হয়।

তাই নিতেই ত এসেছি।

তবে চুপ করে থাকুন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি বরং এখানেই থেকে যাই, আর কলকাতায় ফিরে কাজ নেই।

থাকুন না ; কে বারণ করছে ?

এই আরাম ভোগ করার পর কি আর কার্তিকবাবুর মেসে থাকতে পারব ?

কে আপনাকে কার্তিকবাবুর মেসে ফিরে যেতে বলছে ? এখানেও আপনাকে দু'চারটে ছাত্র-ছাত্রী জুটিয়ে দিতে পারব।

দু-এক মিনিট চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কি করে ভাবলে আমি ঠিকই আসব ?

পিসী আর দিদি বলছিলেন আপনি আসবেনই।

তুমি?

আমি ওদের মত আশাবাদী ছিলাম না।

কেন?

কোন্ অধিকারে আমি ওদের মত আশাবাদী হবো?

কিন্তু তোমার চিঠি না পেলে ত আমি আসতাম না।

সেদিক থেকে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞ হবার কি আছে?

কৃতজ্ঞ বৈকি। আমার মত সামান্য মেয়ের চিঠি পেয়েই এতগুলো টাকা খরচ করে এত দূর থেকে ছুটে এলেন আর আমি কৃতজ্ঞ হবো না?

গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করে বললাম, তুমি নিজেকে এত ছোট মনে করবে না ত।

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দিদি ঘরের দরজার সামনে হাজির হয়ে বললেন, কি রে প্রদীপ হাত-মুখ ধুয়েছিস?

এই যাচ্ছি দিদি।

হা ভগবান! এখনও হাত-মুখ···

দেবযানী বললো—এই ত চা খেলেন।

ওঠ বাবা ওঠ। আর দেরী করিস না।

আমি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই দেবযানী বললো, স্যুটকেস থেকে জামা-কাপড় বের করে নিন। আমি আসছি।

দেবযানী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দিদি আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, ভানু মারা যাবার পর ওর যে কি মন খারাপ হয়েছিল তা আর কি বলব! মাসখানেক তা কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তাই বলত না।

তাই নাকি?

তবে তোকে আসবার জন্য চিঠি লিখতে বললাম কেন?

ভানুদা কবে মারা গিয়েছেন?

প্রায় মাস দুই হল।

দু' মাস?

হ্যাঁ, তা হল বৈকি। যাই হোক তুই ভানুর কথা আলোচনা করিস না তাহলেই ওর আবার মন খারাপ হবে।

আচ্ছা।

তুই ত গতবার এসে বিশেষ ঘোরাঘুরি করিস নি?

না।

এবার বরং ওর সঙ্গে রোজ একটু একটু বেরিয়ে দেখে নিস। তোরও দেখা হবে, ওরও মনটা একটু ভাল লাগবে।

আচ্ছা।

শুধু হাত-মুখ ধোয়া নয়, আমি একেবারে স্নান সেরেই বাথরুম থেকে বেরুলাম। চিরুনি হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই দেবযানী এসে জিজ্ঞাসা করল, সন্ধ্যা আহ্নিক করেন নাকি ?

কে ?

কে আবার ? আপনি।

ওসব বালাই আমার নেই।

বাঁচিয়েছেন।

বাঁচিয়েছি কেন ?

বামুনদের ভণ্ডামি দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে।

ভণ্ড বামুনদের সহ্য করতে না পারলে কাশীতে থাকবে কেমন করে ?

থাকতে হয় বলেই থাকি।

দেবযানী আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই জলখাবারের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকেই বলল, চেচাঁমেচি করবেন না। অতি সামান্যই এনেছি।

এই সামান্য ?

ইজিচেয়ারের সামনে টুলের উপর খাবারের থালাটা রেখে ও বললো আমাকে এত কথা শোনাবেন না। দরকার হয় রান্নাঘরে গিয়ে দিদিকে যা ইচ্ছা বলে আসুন।

অর্থাৎ প্রতিবাদ জানাবার অধিকার আমার নেই ?

সংসারটা অফিস বা আদালত নয়। সংসারে শুভাকাঙ্ক্ষীদের কিছু কিছু অন্যায় দাবীও মেনে নিতে হয়।

দিদি কি করছেন ?

প্রতিবাদ জানাবেন ? ডেকে দিচ্ছি।

না, না, প্রতিবাদ জানাব না।

তবে ?

এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।

দিদি নিশ্চয়ই এখুনি আসবেন।

তুমি খাবে না ?

আমার খাবার দিদি আনছেন। আপনি শুরু করুন।

ব্যস্ত কি ? তোমার খাবার আসুক।

অযথা আপনার খাবারটা ঠাণ্ডা করছেন কেন ?

তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে আর আমি খাব সেটা কি ভাল দেখায় ?

দেবযানী কিছু বলার আগেই দিদি ওর খাবারের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকেই আমাকে বললেন, তুই এখনও শুরু করিস নি ? সবকিছু ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

না, না, এর মধ্যে কি ঠাণ্ডা হবে ?

দূর হতভাগা! গরম গরম খাবি বলে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলাম আর তুই হাত গুটিয়ে বসে আছিস ?

দিদির হাত থেকে খাবারের থালাটা নিয়ে দেবযানী বললো, আর কথা বলবেন না। এবার তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন।

দিদি বললেন, দেবী, খাওয়া হলে ওকে একবার পিসির বাড়ি নিয়ে যা।

যাব।

আমি দেবযানীকে বললাম, গতবার কাশীর কিছুই দেখি নি। এবার কিন্তু তুমি আমাকে নিয়ে সবকিছু দেখিয়ে দেবে।

খেতে খেতেই ও বললো, তাহলে ত সব দিনই ঘুরতে হয়।

যতটা সম্ভব···

দিদি বললেন, সকালে-বিকেলে বেরুলেই ক'দিনের মধ্যে সব দেখা হয়ে যাবে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, সেই ভাল। রোজই কিছু কিছু দেখব।

জলখাবার খেয়েই দুজনে বেরুলাম।

দেবযানী বললো, অনেক দিন পর পিসির কাছে যাচ্ছি।

কেন ?

মাস দুই বিশেষ কোথাও যাই না।

ও দুঃখ পাবে বলে আমি আর প্রশ্ন করলাম না। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ হাঁটছিলাম, কিন্তু হঠাৎ ও প্রশ্ন করল, আমাদের ওখানে থাকতে আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে নাকি ?

তোমার মাথা খারাপ হয়েছে ? এত আরামে থেকেও অসুবিধে হবে ?

কিসে আপনার সুবিধে-অসুবিধে হয় তা ত আমি জানি না তাই···

আমি হেসে বললাম, শ্রীকান্তর জন্যও বোধহয় রাজলক্ষ্মী এর চাইতে ভাল ব্যবস্থা করত না।

আমার কথাটা শুনেই ও থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চাইল। আমার চলাও বন্ধ হল।

ও বললো, তুলনাটা বোধহয় ঠিক হল না।

বুঝতে পারছি।

আবার চুপচাপ হাঁটছি। কারুর মুখেই কোন কথা নেই। পিসীর বাড়ি পৌঁছবার একটু আগে ও জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এখানে বেশীক্ষণ থাকবেন ?

রোজই ত একবার পিসীর বাড়ি আসব। এখন আর বেশীক্ষণ থাকব কেন ?

পিসীর বাড়ি পৌঁছতেই ডজন খানেক পিসী হৈ হৈ করে ঘিরে ধরলেন। পিসী কোনমতে আমাকে উদ্ধার করে উপরে নিয়ে গিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, এবার মাস-খানেক থাকবি ত ?

তাহলে আর কলকাতা ফিরতে হবে না।

দেবযানী বললো, জান পিসী, উনি কালই কলকাতা চলে যাবেন বলছিলেন।

আমি অবাক হয়ে দেবযানীর দিকে তাকাতেই ও দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিল।

পিসী বললো, কাল যাব বললেই কে ওকে যেতে দিচ্ছে?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, না না, পিসী আমি চার-পাঁচ দিন আছি।

এবারও মাত্র চার-পাঁচ দিন?

দেবযানী পিসীকে জিজ্ঞাসা করল, তুমিই বল, উনি ক'দিন থাকবেন?

আসার সঙ্গে সঙ্গেই যাবার তাড়া কিসের? যাওয়ার কথা পরে ভেবে দেখা যাবে।

দেবযানী গম্ভীর হয়ে বললো, সেই ভাল।

পিসী দুটো ছোট্ট প্লেটে দুটো করে সন্দেশ এনে বললেন, একটু মুখে দে।

বিশ্বাস করো পিসী, এক্ষুনি জলখাবার খেয়ে আসছি।

সেই জন্যই ত বিশেষ কিছুই দিলাম না। চট করে মুখের মধ্যে ফেলে দে; আমি জল এনে দিচ্ছি।

দেবযানী বললে, তুমি বসো। আমিই জল আনছি।

আমি বসব নারে। আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।

দুজনেই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায়?

পিসী হাসতে হাসতে বললো, চৌষট্টি ঘাটের কাছে এক বন্ধু খেতে বলেছে।

আবার দুজনেই একসঙ্গে বললাম, তোমার বন্ধু?

তোরা ভেবেছিস কি? আমার বন্ধু থাকতে পারে না?

আমি বললাম, পারে বৈকি।

একসঙ্গে ভাগবত পাঠ শুনতে শুনতে বন্ধুত্ব হয়েছে। তাই তিনি অনেক দিন ধরে বলছিলেন বলে আজ খেতে যাচ্ছি।

দেবযানী সন্দেশ দুটো মুখে দিয়ে রান্নাঘর থেকে আমার জল আনতে গেল।

পিসী আমাকে বললো, এবার ওদের ওখানে উঠে ভালই করেছিস। তবে রোজ একবার করে আসিস।

নিশ্চয়ই আসব।

এখানে ত নতুন মুখ দেখতে পাই না, তাই তোকে একটু দেখতে পেলেও মনটা ভাল লাগবে।

আমি পিসীকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আমাকে কাছে পেলে যে তোমার ভাল লাগে তা জানি। তোমাকে কাছে পেলে আমারও ভাল লাগে।

তা কি আর জানি না। খুব জানি।

দেবযানী জলের গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে বললো, আপনি এবার উঠুন। পিসী বেরুবেন।

আমি জল খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

পিসী বললেন, যখনই মন চাইবে চলে আসিস। দেবযানীর মুখখানা ধরে একটু আদর করে বললেন, তুইও ওর সঙ্গে আসিস।

আমি বললাম, পিসী, তুমিই আমার বাবা বিশ্বনাথ। তুমিই ত আমাকে কাশীতে টেনে এনেছ আর এখানে থেকেও তোমায় দর্শন করব না ?

ওসব কথা বলিস না বাপু। বাবা রেগে যাবেন।

তুমি আমার নাম করে বাবার মাথায় একটু জল ঢেলে দিও। তাহলেই ও নেশাখোরের রাগ কমে যাবে।

পিসী আলতো করে আমাকে একটা চড় মেরে বললেন, চুপ কর হতভাগা।

ভোরের দিকে ঘুম পাতলা হয়ে এলেও আমি যথারীতি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকি। বুঝতে পারি ভোর হয়েছে, দিদি উঠেছেন। হয়ত বা দেবীও। আবার একটু ঘুমিয়ে পড়ি। এ বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা আর জানতে পারি না।

চা এনেছি। এবার উঠুন। অনেক বেলা হয়েছে।

দেবীর গলা শুনে চাদর সরিয়ে মুখ বের করি। একটু হেসে বলি, চা এনেছ বুঝি ?

এনেছি মানে ? বোধহয় ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে।

কেন ?

চা এনেছি কি এখন ? কতক্ষণ ডাকাডাকি করছি তা জানেন ?

অনেকক্ষণ ?

চা খেতে খেতে কথা বলুন।

আমি একটু কাত হয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলি, বেশ ত গরম আছে।

তা ত বটেই।

তুমি কি অনেকক্ষণ ধরে ডাকছ ?

বোধহয়।

কেন অযথা কষ্ট কর ? তাছাড়া রোজ সকালে এমন ডাকাডাকি করতে নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগে না।

কিন্তু না করে ত উপায় নেই।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কেন ?

দিদি এসে যদি শোনেন আপনাকে চা দিই নি তাহলে ত আমাকে বকুনি খেয়ে মরতে হবে।

কথাটা শুনেই আমার খারাপ লাগে। বলি—সকালে ঘুম থেকে উঠেই চা

চা খাবার অভ্যাস আমার নেই। তুমি দাও বলেই খাই। আমার যখন অভ্যাস নেই তখন কাল থেকে আর চা এনো না।

দেবযানী শুধু বললো, আচ্ছা।

ওর জবাব শুনে আরো দুঃখ পেলাম। ভেবেছিলাম আমার অভিমানের কথা ও বুঝবে। এই সকালবেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়েই ঠিক করলাম ওকে আর [illegible] দেব না। কেন দেব? ওর উপর আমার কি অধিকার?

সারাদিনই নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখলাম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর পিসীর বাড়িতে গিয়ে লম্বা টানা ঘুম দিয়ে চা খেয়ে দশাশ্বমেধঘাট আর গোধুলিয়ার মোড়ে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে যখন দিদির ওখানে ফিরলাম তখন রাত্রের খাবার সময় হয়ে গেছে। দিদি বললেন—বিকেলবেলায় ঘাটে পাঠ শুনতে গিয়ে শুনলাম তুই ও বাড়িতে ঘুমুচ্ছিস। ঘুম থেকে উঠে কি কোথাও গিয়েছিলি?

বললাম—ঘুম থেকে উঠে দেখি পিসী পাঠ শুনতে গেছেন। সারদা পিসীর কাছে চা খেয়ে একটু দশাশ্বমেধঘাট আর গোধুলিয়ার মোড় ঘুরতে গিয়েছিলাম।

রান্না দিদি এ বাড়িতে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত করে সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই নিজের বাড়ি চলে যান। রাত্রে দেবযানীই আমাকে খেতে দেয়। দিদি দুধের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—ঐ গোধুলিয়ার মোড় থেকে একটু এগিয়ে গেলেই হরসুন্দরী ধর্মশালা। একবার ঘুরে আসিস।

হরসুন্দরী ধর্মশালা গোধুলিয়ায় মোড়ের কাছেই নাকি?

হ্যাঁ, খুব কাছে। বোধহয় এক মিনিটেরও পথ নয়। মোগলসরাইয়ের ট্যাক্সিগুলো ত ওরই পাশে…

খেয়াল করি নি ত।

দেবযানী খেতে খেতে দিদিকে জিজ্ঞাসা করল, ধর্মশালায় কি দেখতে যাবেন?

দিদি উত্তর দেবার আগেই আমি বললাম—ঐ ধর্মশালাতেই আমার মা মারা যান।

তাই নাকি?

আমি আর কোন কথা বললাম না।

খাওয়া-দাওয়া মিটে যাবার পর ওরা দুজনে ওদের নিজের নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমিও আমার ঘরে চলে এলাম।

গোধুলিয়ার মোড় থেকে ফেরার সময় বিশ্বনাথের গলির উল্টোদিকের একটা দোকান থেকে কলকাতার একটা কাগজ কিনেছিলাম। বিছানার উপর বসে বসে সেই কাগজখানাই পড়ছিলাম। মাঝে মাঝে কাগজ পড়া বন্ধ রেখে চুপ করে বসে বসে ভাবছিলাম। একবার মনে হল কালই কলকাতা ফিরে যাই! এইসব মান-অভিমানের ঝামেলায় আমার কি দরকার? যেমন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছিলাম তেমনই কাটাব। দিন ত বসে থাকবে না। ঠিকই চলে

। দিদি আর পিসীর যেটুকু ভালবাসা পেয়েছি তাতেই আমি খুশী, তার্থ। আর দরকার নেই। বিজয়া নববর্ষ উপলক্ষে পোস্টকার্ডেই দের প্রণাম জানাব। আশীর্বাদ প্রার্থনা করব। তাছাড়া দেবীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা না হওয়াই সব দিক থেকে ভাল। এ ঘনিষ্ঠতা কখনই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। হবার প্রয়োজনও নেই। বরং ঘনিষ্ঠতা হলে দুজনেরই পক্ষে খারাপ।

আমার কোন রিস্ট-ওয়াচ নেই। এ ঘরেও কোন ঘড়ি নেই। বুঝতে পারছি না ক'টা বাজে। নিশ্চয়ই অনেক রাত হয়েছে কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। দিনের বেলা অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। আর তার উপর এই সব চিন্তা। ঘুম কি কখনও আসে? তবু আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়েই ভাবছিলাম এ সংসারে স্নেহ বা সমবেদনা পাওয়া হয়ত বা সহজ কিন্তু ভালবাসা পাওয়া সত্যি দুর্লভ। মনে মনে বললাম—বাবা বিশ্বনাথ আমি আর এ রাজ্যে থাকছি না। কাল সকালে উঠেই দিদিকে বলব ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, আমি আজ কলকাতা যাচ্ছি। যদি সম্ভব হয় তাহলে ওদের পরীক্ষা শেষ হলেই আবার কদিনের জন্য ঘুরে যাবো। স্থির করলাম দিদি আপত্তি করলেও থাকব না। একটু অসন্তুষ্ট হলেও চলে যাবো। আমি আর এখানে থাকব না আসব না। না কিছুতেই না। যেখানে দাবী করা যায় না সেখানে সমাদর আর সমবেদনা অনুকম্পার সমান। আমি নিজেকে আর ছোট হেয় করব না।

তখনও ঘুম আসে নি কিন্তু ঘুমের আমেজ এসে গেছে। মনে হল আমার ঘরের দরজার পাল্লা দুটো একটু নড়ে উঠল। আমি আগের মতই চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলাম। ভাবলাম নিশ্চয়ই বিড়াল এসেছে। একটু পরেই মনে হল কে যেন আমার বিছানায় এসে বসল। মুহূর্তের মধ্যে আমার ঘুমের আমেজ উড়ে গেল। চমকে উঠে বসতেই—

চিৎকার করবেন না। আমি দেবী।

তুমি?

হ্যাঁ, আমি।

এত রাত্রে এভাবে?

নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে।

এত রাত্রে আমার কাছে তোমার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।

দেবী আমার মুখের উপর আলতো করে হাত রেখে বললো—আস্তে।

ক'টা বাজে জানেন?

আমার ঘড়ি নেই।

ঘড়ি নেই ত কাজকর্ম করেন কিভাবে?

অনেক কিছু না থাকলেও গরীবদের চলে যায়।

মনে হল দেবী একটু হাসল। সত্যিই তাহলে রেগেছেন।

তুমি এখন এ ঘর থেকে যাও।

মোটে ত দুটো বাজে। এখনই চলে যাবো ?

এক্ষুণি।

একটু পরেই চলে যাবো।

না তুমি এক্ষুণি যাও।

এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? আমি ত একটু পরেই চলে যাবো।

ভয় পাব না ? যদি দিদি···

ভোর পাঁচটার আগে দিদির ঘুম কিছুতেই ভাঙবে না। তাছাড়া আমা
কথাবার্তা দিদির ঘরে পেঁছিবে না।

আমি গায়ে চাদর জড়িয়ে বিছানায় বসে আছি। দেবীও আমার মুখোমু
বিছানাতেই বসে আছে কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ওকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি ন
জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কাছে যদি তোমার এতই প্রয়োজন তাহলে অ
এলে না কেন ?

অনেকক্ষণ ধরেই আসব আসব ভাবছিলাম কিন্তু লজ্জায় দ্বিধায় আস
পারি নি।

এখন এলে কি ভাবে ?

আপনার ঘরের আলো নিভে যেতেই মনে হল, এবার ত আপনি ঘুমি
পড়বেন। তাই আর দেরী না করে চলে এলাম।

লজ্জায় দ্বিধায় এর আগে আসতে পারলে না ত এই অন্ধকারে ঘরে এ
কি করে ?

মনে হল আর দেরী করলে ত আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। আপনার
কথা বলা হবে না। তাই···

কিন্তু আমার মত একজন ছেলের ঘরে এত রাত্রে আসতে তোমার কে
সংকোচ হল না ?

না।

কেন ?

আমার নিজের উপর আস্থা আছে। তাছাড়া জানি আপনি আমার কো
ক্ষতি করবেন না।

কি করে জানলে ? আমার চরিত্র বা প্রবৃত্তি সম্পর্কে তুমি কতটু
জান ?

শুধু প্রবৃত্তি থাকলেই কোন মেয়ের ক্ষতি করা যায় না। যথেষ্ট সাহসের
দরকার।

আমার বুঝি সে সাহস নেই ?

বিন্দুমাত্রও না।

অনেকক্ষণ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছি। এবার আর সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রশ্
করতে পারলাম না। থমকে দাঁড়ালাম। চুপ করে রইলাম।

একটু পরে দেবী প্রশ্ন করল, আপনি কি কাল চলে যাবেন ?

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি করে জানলে ?

যদি এটুকু না জানতে পারি তাহলে এত রাত্রে আপনার ঘরে আসার সাহস লাম কোথা থেকে ?

কি বলছ ?

যা বলছি তা এই অন্ধকার ঘরেও দিনের আলোর মত স্পষ্ট করে দেখার বোঝার বয়স ও বুদ্ধি দুইই আপনার আছে।

কিন্তু…

আমার কোন ব্যাপারেই কোন কিন্তু নেই। দেবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লো, আপনি কালই চলে যান কিন্তু একটা অনুরোধ…

কি ?

আমার উপর অন্যায়ভাবে রাগ করে যেতে পারবেন না।

অন্যায় ?

একশ বার, হাজার বার অন্যায় করে রাগ করেছেন। সামান্য চা খাবার পারে একট মজা করলাম আর তাতেই এত রাগ ?

কিন্তু…

আবার কিন্তু ? সারাটা দিন আমার কি ভাবে কেটেছে সে খবর রাখেন ? তক্ষণ বিছানায় শুয়ে কিভাবে ছটফট করেছি, তা জানেন ?

দুঃখে, আবেগে দেবী আর কথা বলতে পারল না কিন্তু আমি স্থবিরের ত আর চুপ করে ওর মুখোমুখি বসে থাকতে পারলাম না। গায়ের থেকে দর সরিয়ে একটু এগিয়ে ওর দুটো হাত চেপে ধরে বললাম, দেবী, আমি ঝতে পারি নি। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

সব পুরুষরাই মেয়েদের ভুল বোঝে। ভেবেছিলাম, আপনি নিশ্চয়ই মাকে ভুল বুঝবেন না কিন্তু…

না, না, দেবী, আমি আর তোমাকে ভুল বুঝব না।

কেন ?

যে মেয়ে সমস্ত লজ্জা, ভয়, সংকোচ অগ্রাহ্য করে এত রাত্রে আমার কাছে টে আসতে পারে, তাকে কি ভুল বোঝা যায়।

কিন্তু একথা কতকাল মনে থাকবে ?

চিরকাল।

চিরকাল ?

হ্যাঁ, চিরকাল।

আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছেন ?

হ্যাঁ, তোমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি।

হঠাৎ দুজনেই চুপ করে গেলাম। কারুর মুখেই কোন কথা এলো না। কটু পরে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ঘুম পাচ্ছে না ?

না।

রাত ত অনেক হল।

হোক। আপনার ঘুম পাচ্ছে বুঝি ?

না। আমি ত দিনে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি।

তাহলে একটু বসি।

বসো।

কাল আপনার ঘড়ি কিনব।

কালই ?

হ্যাঁ।

কিন্তু ঘড়ি কিনতে ত অনেক টাকা লাগবে ?

ভয় নেই, দিদির কাছে হাত পাতব না। আমার নিজের টাকা দিয়ে কিনে দেব।

তোমার বুঝি অনেক টাকা আছে ?

অনেক মানে বিশ-বাইশ হাজার। দাদুর সম্পত্তি বিক্রীর সব টাকা আমি পেয়েছি।

আমি একটু হেসে বললাম, তাহলে ত তুমি বড়লোক।

দেবী হাসতে হাসতে বললো, এ ছাড়াও আমার দুটো বাড়ি আছে একটা কলকাতার কালীঘাটে আর একটা এই কাশীতেই।

তাহলে ত তুমি মহারানী।

দুটো বাড়ি থাকলেও বিশেষ ভাড়া পাই না।

কেন ?

কালীঘাটের বাড়ী থেকে পঞ্চাশ টাকা পাই আর এখানকার বাড়ি থেকে সত্তর টাকা পাবার কথা কিন্তু অধিকাংশ মাসেই পাই না।

কেন ?

দু' জায়গাতেই অনেক পুরানো ভাড়াটে। আর এখানকার বাড়িতে সব নিঃসম্বল বিধবারা থাকেন। এদের ত কোর্টকাছারিতে টানাটানি করতে পারি না।

তা ত বটেই।

আপনার টাকার দরকার হলে আমাকে বলবেন। আর কারুর কাছে চাইবেন না।

আমি টাকা দিয়ে কি করব ? আমার ত বেশ চলে যাচ্ছে।

আমি ত বলি নি আপনার চলছে না। বলেছি, যদি দরকার হয় চাইবেন আমার টাকা আপনার কাজে লাগলে···

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, সুখী হব, তাইত ?

হ্যাঁ।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

নিশ্চয়ই।

আজ এই রাত্রে তুমি কেন এভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে এসেছ বলবে ?

নিজেকে ত বিলিয়ে দিতে আমি আসি নি। তা আর সম্ভব নয় কিন্তু যেটুকু পারব শুধু তাই দিতে এসেছি।

ওর কথাটা একটু হেঁয়ালি মনে হল। বললাম, আর কিভাবে নিজেকে দেবে ?

একে কি বিলিয়ে দেওয়া বলে ? যদি বিলিয়ে দিতেই পারতাম তাহলে এভাবে জ্বলে-পুড়ে মরতে হতো না।

তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমি কি নিজেই নিজেকে বুঝি যে আপনি আমাকে বুঝবেন ? কি অসম্ভব জ্বালা আর দ্বন্দ্ব নিয়ে যে আমি দিন কাটাচ্ছি তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

আমি কি সে জ্বালা দ্বন্দ্ব দূর করতে পারি না ?

চেষ্টা করলে হয়ত জ্বালা দূর করতে পারবেন কিন্তু দ্বন্দ্ব কিছুতেই যাবে না।

কিন্তু কেন ?

আমার অদৃষ্ট ! বোধহয় আপনারও অদৃষ্ট !

একটু চুপ করে থাকার পর বললাম, রাত বোধহয় শেষ হয়ে এলো। এবার একটু শুতে যাও।

দেবী হাসতে হাসতে বললো, রাত যখন শেষ হতে চললো তখন আর আমার ঘরে গিয়ে কি করব ? আপনার এখানেই শুয়ে পড়ি ?

হঠাৎ যদি সাহসী হয়ে প্রবৃত্তির···

দেবী দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে বললো, তুমি তা করতে পারো না।

দেবী !

কি ?

না কিছু না।

দেবী একটু হাসতে হাসতে বললো, কাল ত আবার কলকাতা যাবে। এবার শুয়ে পড়ো।

তুমিও ত আমার সঙ্গে যাবে।

তুমি যদি আমাকে নিয়ে যেতে পারো তাহলে আমিও যেতে পারি।

তা জানি।

কাল আবার সারাদিন পিসীর বাড়ি আর গোধুলিয়ার মোড়ে কাটাবে নাকি ?

প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা থাকলেও সাহসে কি কুলাবে ?

দেবী সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে নেমে বললো, যাই।

যাও কিন্তু আজ কি ঘুম আসবে ?

বোধহয় না কিন্তু ঘুম এলেও ত ঘুমুতে পারব না।

কেন ?

স্বপ্ন এসে জ্বালাতন করবে।

আমি শুধু একটু হাসলাম। দেখলাম, ধীর পদক্ষেপে দেবী আস্তে আস্তে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভেবেছিলাম ঘুম আসবে না। শুয়ে শুয়ে দেবীর কথাই ভাবছিলাম। একবার মনে হল আলো জেবলে ছোট্ট আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখি। পরীক্ষা করি, এই চেহারায় কি এমন যাদু আছে যা দেবীকে এই গভীর অন্ধকার রাত্রে আমার কাছে টেনে আনল। এত রাত্রে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত নয় মনে করেই আলো জেবলে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম না। কিন্তু কেন দেবী এমন দুঃসাহসিক কাজ করল? ও আমাকে এতই ভালবাসে যে আমার সামান্য অভিমানটুকু সহ্য করতে না পেরে এমন করে ছুটে এলো? যদি কোন কারণে দিদির ঘুম ভাঙতো? যদি দেখতেন দেবীর ঘর শূন্য? যদি বুঝতে পারতেন নিশুতি রাতে আমার অন্ধকার ঘরে সে রয়েছে? তাহলে দেবী কি জবাব দিত? আমি কি বলতাম?

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা আমি নিজেও টের পাই নি। ঘুম ভাঙল দেবীর ডাকাডাকিতেই। আজ আর টুলের উপর চায়ের কাপ রেখে 'শুনছেন? অনেক বেলা হয়েছে। চা খেয়ে নিন' নয়। আমার মুখের উপর দিকে চাদর সরিয়ে আমাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকল, চা এনেছি। উঠবে না?

চোখ না মেললেও কথাগুলো আমার কানে এলো কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। ঘুমের ঘোরে রাত্রের কথা মনে পড়েনি।

কি হল? চা খাবে না?

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি দেবী আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে। আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অমন করে কি দেখছ? চা খেয়ে নাও।

এবার এতক্ষণে গত রাত্রের সব কথা আমার মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কোথায়?

সকালে যেখানে যান।

বামুন দিদি কোথায়?

রান্নাঘরে কাজ করছেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, কাল রাত্রে কী দুঃসাহসিক কাণ্ডটাই তুমি করলে!

ও হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, খুব দুঃসাহসিক কাজ করেছি?

তোমার কি মনে হয় খুব সাধারণ স্বাভাবিক কাজ করেছ?

না, তা না।

আমি আবার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কাল রাত্রে হঠাৎ তুমি এমন কাজ করলে কেন?

আমি প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর মুখের চেহারা বদলে গেল। হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল ওর চোখের দীপ্তি। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো, কি অবস্থায় যে মেয়েরা এমন দুঃসাহসিক কাজ করতে পারে তা তোমরা বুঝবে না।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে তোমার?

সে কথা আজ তোমাকে বলতে পারব না।

আমি আগের মতই শুয়ে রইলাম। আমার সামনেই মুখ নীচু করে দেবী দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে মনে হল, কি যেন একটা অব্যক্ত ব্যথায় ও জর্জরিত কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না।

একটু পরে দেবী ম্লান হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করল, কাল রাত্রের ঘটনার জন্য তুমি নিশ্চয়ই আমাকে নির্লজ্জ বেহায়া ভাবছ?

আমি শুধু মাথা নেড়ে বললাম, না।

কেন?

সব কাজের পিছনেই একটা কারণ থাকে। সেই কারণটা না জানা পর্যন্ত কোন মানুষের কোন কাজকেই নিন্দা করা উচিত নয়।

দেবী দু পা এগিয়ে আমার বিছানার একপাশে বসে হাসতে হাসতে বললো, তোমার এই বোধশক্তি আছে বলেই কাল রাত্রে তোমার কাছে এসেছিলাম।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমি জানতাম আমি ভুল করতে পারি না।

কী ভুল।

এই বয়সে এই দেহটাকে নিয়ে কাশীর মত তীর্থস্থানে অনেক ভুলই করা যায়।

কথাটার মধ্যে যে ব্যঙ্গ ও কদর্থ আছে তা বুঝতে পেরে মনের মধ্যে একটা বিস্বাদ অনুভব করলাম। বললাম, কী আজে-বাজে কথা বলছ?

পিসী আর দিদিকে দেখেই কি ভাবছ কাশীতে শুধু ওদের মত ভাল মানুষই থাকেন? বাবা বিশ্বনাথের এ রাজত্বের ঘরে ঘরে নেকড়ে বাঘ লুকিয়ে আছে।

আমি কাশীর কতটুকুই বা জানি। এই দু-বাড়ির কয়েকজন ছাড়া ভানুদার সঙ্গে একটু ভাল করে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। দু-চারবার দশাশ্বমেধ ঘাট আর গোধুলিয়ার মোড়ে যাতায়াত করায় দু-একজনের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা হলেও এখনো ভাল করে পরিচয় হয় নি। সুতরাং দেবীর কথার প্রতিবাদ করার কোন রসদ হাতের কাছে পেলাম না। চুপ করে রইলাম।

দেবী বললো, বিশ্বাস কর যদি সম্ভব হতো তাহলে এক মুহূর্ত এই কাশীতে থাকতাম না কিন্তু এমনই অদৃষ্ট যে সারাটা জীবন এই বাঙালী-টোলার অন্ধকার গলিতেই পড়ে থাকতে হবে।

এবার আমি হেসে ফেললাম। বললাম, তুমি কী ভাবছ এইভাবেই তোমার জীবন কাটবে? দুদিন পরেই ত লাল বেনারসী পরে এই কাশীধাম ছেড়ে চলে যাবে।

তাই নাকি?

নিশ্চয়ই।

কে আমাকে বিয়ে করবে? তুমি?

ওর প্রশ্ন শুনে আমি কি করব, কি বলব, কিছুই ভেবে পেলাম না!

কি হল? আমাকে বিয়ে করবে না? আমাকে,তোমার পছন্দ হয় না নাকি তোমার পাশে আমাকে মানাবে না?

আঃ। কি আজে-বাজে বকছ?

দেবী হাসতে হাসতে বললো, আমি জানি তোমার প্রদীপের আলো কোনমতেই আমার অন্ধকার জীবনে ঢুকতে পারে না।

আমি প্রদীপ হলেও আমার শিখাটি নিভে গেছে। তোমাকে আলো দে কেমন করে?

দেবী হঠাৎ আমাদের আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল। যাকগে। ওস কথা বাদ দাও। আগে বল কাল রাত্রের ঘটনার জন্য তুমি আমার উপর রা করেছ কিনা?

রাগ করব কেন?

রাগ কর নি?

না।

সত্যি?

সত্যি।

দেবী আমার হাত ধরে একটু টান দিয়ে বলল, এবার উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

কেন? বেশ ত লাগছে।

ঘড়ি কিনতে যেতে হবে।

তুমি সত্যি আমাকে ঘড়ি দেবে?

সম্ভব হলে সব কিছুই তোমাকে বিলিয়ে দিতাম কিন্তু তা আর এ জন্মে সম্ভব না।

তোমার সব কথার শেষেই একটু বেসুরো কথা শুনছি। কি ব্যাপা বল ত?

বলব না।

কেন?

তাহলে এই আনন্দটুকুও উপভোগ করতে পারব না।

কিন্তু...

দেবী আমার মুখের উপর হাত রেখে বললো, কোন কিন্তু নয়। উঠে পড়ো।

আমি সত্যি সত্যি উঠে পড়লাম।

বাথর়ুম থেকে বের়ুতেই দিদি বললেন, তোর হলে বাইরের ঘরে আয়। ওখানেই জলখাবার দিচ্ছি।

আমি ঘর থেকে তৈরী হয়ে বসবার ঘরে যেতেই দেখি দিদি বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আজ বুঝি বেলা করে উঠেছিস?

হ্যাঁ, একটু দেরী করেই উঠেছি।

কেন রাত্রে ভাল করে ঘুম হয় নি?

ঘুম ভালই হয়েছে, তবে মাঝ রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

কেন?

কোন কারণ নেই। এমনিই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

আজ তাহলে দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিস, তা না হলে শরীর…

দিদি কথাটা শেষ করার আগেই জলখাবারের থালা হাতে নিয়ে আসতে আসতে দেবী বললো, দিদি ইনি তোমার নাতি হলেও কচি ছেলে না। এত আদর…

তুই চুপ কর হতভাগী।

এবার আমি বললাম, দিদি এই মেয়েটাকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় চড়িয়েছ।

দিদি সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন জানালেন, ঠিক বলেছিস।

দেবী আমার সামনের টেবিলে খাবারের থালা রেখে আমাকে বললো, শুধু দিদিকে তেল দিয়ে কোন লাভ নেই।

দিদি আমাকে বললেন, কথার কি ছিরি দেখছিস।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কিছুদিন আমার হাতে ছেড়ে দাও না! সব ঠাণ্ডা করে দেব!

দেবী ঠোঁট উল্টে বললো, ওরে আমার গুরুদেব রে!

ওর কথায় আমরা দুজনেই হাসি।

জলখাবার খেতে খেতে দেবী বললো,' দিদি, তোমার এই আদুরে নাতিকে আমি কি বলে ডাকব? ঐ শুনছেন শুনছেন করে আর পারি না।

দিদি হাসলেন। আমি বললাম, শুনছেন শুনছেন বলে কে তোমাকে ডাকতে বলেছে?

তবে কি বলে ডাকব?

নাম ধরে ডাকলেও আমার আপত্তি নেই।

দিদি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, না না, নাম ধরে কি ডাকবে?

দেবী একটু জোরেই বললো, তাহলে কি ল্যাজ ধরে ডাকব ?

আবার আমরা হাসি। আমি বলি, কাশীতে এসেছি বলেই আমি হনুমান না। তুমি বরং আমাকে প্রদীপদা বলেই ডেকো।

মন্দ নয় তবে আপনার কোন ডাক নাম নেই ?

শুনেছি আমার মা আমাকে দীপ বলে ডাকতেন।

চমৎকার। আমিও আপনাকে দীপ বলেই···

দিদি বললেন, সেকি রে ?

দেবী গম্ভীর হয়ে দিদিকে বললো, দীপ বলে ডাকলে কি ওকে অপমান করা হবে ? বরং মায়ের দেওয়া নামটা হারিয়ে যাবে না।

দিদি বললেন. তা ঠিক ?

দেবী সঙ্গে সঙ্গে বললো, আর আপনি-টাপনি বলছি না।

দিদি বললেন, লোকে শুনলে কি ভাববে বল ত ?

আমি কি গোধুলিয়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে তোমার নাতির সঙ্গে ভাব দেখাতে যাচ্ছি। লোকের কথা বাদ দাও। তুমি কিছু ভাববে কিনা তাই বল।

দিদি বললেন, এইসব নোংরামী কোনদিন আমার মধ্যে দেখেছিস ?

দেবী বাঁ হাত দিয়ে দিদির গলাটা জড়িয়ে ধরে বললো, সেই জন্যই ত তোমাকে এত ভালবাসি।

দিদি বললেন, আমাকে আর আদর করতে হবে না। শেষকালে এঁটো হাত পায়ে লাগিয়ে দিবি।

ওদের কাণ্ড দেখে আমি হাসি।

দিদি বললেন, হতভাগীর মাথায় যা চাপবে তা ত করবেই।

আমি মনে মনে বললাম, কাল রাত্রেই তা আমি টের পেয়েছি।

জলখাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। দেবী প্লেট দুটো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই বললো, দীপ উঠে পড়ো। ঘড়ি কিনতে যাবে ত ?

দিদি জিজ্ঞাসা করলেন, কার ঘড়ি ?

দেবী বললো, তোমার নাতির কোন ঘড়ি নেই। তাই ও একটা ঘড়ি কিনবে।

দিদি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কলকাতা থেকে না কিনে এখান থেকে কিনবি কেন ?

বললাম. কলকাতাতেও যে ঘড়ি পাব এখানেও সেই ঘড়ি পাবো।

কিন্তু দাম কি এক হবে ?

দেবী বললো, ভয় নেই তোমার নাতিকে কেউ ঠকাবে না। তাছাড়া আমি ত যাচ্ছি।

তোরা এখনই যাবি ?

দেবী বললো, হ্যাঁ।

বেশী বেলা করিস না।

আমি বললাম, না না, বেশী বেলা করব না।

দিদি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যা ঘুরে আয়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলিতে পা দিয়েই বললাম, কি কাণ্ডটা করলে বলো ত।

কি করলাম ?

তুমি সত্যি সত্যিই এভাবে আমাকে দীপ বলে ডাকতে পারবে তা আমি কল্পনা করতে পারি নি।

ও হাসতে হাসতে বললো, মনের এসব ইচ্ছা বেশী চেপে রাখতে গেলেই বিপদে পড়তে হয়।

কিন্তু দিদি কি ভাবলেন ?

কি আবার ভাববেন ? কিছুই ভাবেন নি। দিদির মনে সত্যি কোন নোংরামী নেই। তা না হলে আমি ভানুদার সঙ্গে ঐভাবে মিশতে পারতাম ?

তা ঠিক।

গলি পেরিয়ে কালীবাড়ি পাশে রেখে বড় রাস্তায় এসেই আমরা রিকশায় উঠলাম। দেবী রিকশাওয়ালাকে বললো, চক চলিয়ে।

রিকশা চলতে শুরু করতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি সত্যিই আমাকে ঘড়ি কিনে দেবে ?

একথা আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন ? আমার দেওয়া ঘড়ি তুমি পারবে না ?

যে আমাকে দীপ বলে ডাকতে পারে তার অনুরোধ কি আমি অগ্রাহ্য করতে পারি ?

তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না কিন্তু সত্যি বলছি তোমাকে দীপ বলে ডাকব বলেই মনে মনে ঠিক করেছিলাম।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, কিন্তু তখন ত আমি জানতাম না তোমার মা তোমাকে দীপ বলে ডাকতেন।

আমি একটু হাসলাম। বললাম, কোনদিন ভাবি নি কেউ আমাকে দীপ বলে ডাকবে।

দীপ বলে ডাকার অধিকার ত সবার হতে পারে না।

তা ত বটেই।

তোমার মা বেঁচে থাকলে যেমন তাঁর কথা শুনতে তেমনি আমারও সব কথা শুনবে।

সব কথা ?

কেন, আর কেউ কি মাঝ রাতে তোমার ঘরে আসে ?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তোমার সে ভয় করার কোন কারণ নেই।

তাহলে আমার সব কথা শুনবে না কেন ?

শুনব।

সাইকেল রিকশা গোধূলিয়ার মোড়ে পেঁছতেই আমি বললাম, গোধূলিয়া নামটা ভারী চমৎকার, তাই না ?

একটু কাব্যিক।
তাছাড়া বেশ অর্থপূর্ণ।
কেন ?
অধিকাংশ হিন্দুই স্বপ্ন দেখে জীবনের গোধূলি বেলায় এখানে আসবে।
তা ঠিক, তবে গোধূলিয়া নামকরণের পিছনে এ অর্থ নেই।
গোধূলিয়ার আর কি অর্থ হতে পারে ?
যে দশাশ্বমেধ রোড দিয়ে আমরা এলাম, সেখানে আগে একটা খাল ছিল।···
তাই নাকি ?
হ্যাঁ!
কতকাল আগে ?
বোধহয় একশ'-দেড়শ' বছর আগেও ছিল এবং সে খালের নাম ছিল গোদাবরী।
আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, খালের নাম গোদাবরী ?
দেবী হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ। কাশীর গুরুত্ব বাড়াবার জন্য পণ্ডিতরা নানারকম কাহিনী তৈরী করেছেন। যেমন বলা হয় কাশীর গঙ্গায় সব পবিত্র নদী এসে মিশেছে কিন্তু আসলে তা ত হয় নি বা হতে পারে না।
তা ত বটেই।
তাই সেকালের পণ্ডিতরা এই খালের নাম দিয়েছিলেন গোদাবরী আর অশিক্ষিত মানুষরাও বিশ্বাস করতো এই খালের সঙ্গে গোদাবরীর ধারার কোন না কোন যোগাযোগ ছিল।
আশ্চর্য ব্যাপার!
সেই গোদাবরী হল গৌদাবরী। তারপর হল গোদৌলিয়া আর গোধূলিয়া।
আমি আর মন্তব্য করার প্রয়োজন মনে করি না শুধু হাসি।
দেবী বললো, হাসবে না। এখানকার বহু ব্যাপারেই এই রকম অবিশ্বাস্য কাহিনী জড়িয়ে আছে। দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখেছ মনিকর্ণিকা ঘাটের দিকে পাথরের একটা সুন্দর মন্দির কাত হয়ে পড়ে আছে ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি। শুনেছিলাম, যিনি মন্দির তৈরী করান তিনি মন্দির তৈরী হবার পর পরই যেই বললেন মাতৃ-ঋণ শোধ করলাম···
আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দেবী বললো, অমনি সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরটা কাত হয়ে পড়ে গেল, তাই তো ?
হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই শুনেছি।
ওসব বাজে কথা। কোন গুণী জ্ঞানী লোকের কাছেই এ-কাহিনীর সমর্থন পাবে না। তাঁরা মনে করেন, বন্যার জন্যই মন্দিরটি এভাবে কাত হয়ে গেছে।
এটাই বিশ্বাসযোগ্য কথা।
এককালে বহু গুণী-জ্ঞানী-তপস্বী এখানে থাকলেও, সাধারণ মানুষের

মধ্যে কুসংস্কার আর অন্ধ ধর্মজ্ঞানই বড় কথা। এদের কাছে যুক্তি বা বিশ্বাস-যোগ্য কথার কোন দাম নেই।

ভাবলেও অবাক লাগে।

আমার ত ঘেন্না লাগে।

হঠাৎ রিকশায় ব্রেক করেই রিকশাওয়ালা বললো. চক !

আমি পকেটে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম. ওকে কত দেব ?

তুমি নামো। আমি দিচ্ছি।

কেন ? আমার কাছে ত খুচরো আছে।

থাক।

দেবী ব্যাগ থেকে একটা আধুলি বের করে রিকশাওয়ালাকে দিয়ে আমাকে ডাকল, এসো।

আমি ওর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললাম, তুমি ত ঘড়ি কিনে দিচ্ছ। আমি যদি রিকশা ভাড়াটা দিতাম, তাহলে কি ক্ষতি হতো ?

আমার দেওয়া আর তোমার দেওয়া একই ব্যাপার।

যার মনে সংশয় আছে তার সঙ্গে তর্ক করা যায়। যুক্তি দিয়ে হয়ত তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু যার মনে সংশয় নেই ? তার সঙ্গে যুক্তি-তর্ক করে কি লাভ ? সে ত সিদ্ধান্ত বদলাবে না।

কাল রাত থেকে দেবীর আচরণ আমার কাছে যতই অস্বাভাবিক বা অবাস্তব মনে হোক না কেন, ওর মনে কোন দ্বিধা নেই। সংশয় নেই। মেয়েদের মনে সব সময়েই দ্বিধা, সংশয় বেশী। ঈষৎ চাঞ্চল্যে পুরুষ প্রেমে পড়ে, হঠাৎ আবেগে সংসার ত্যাগ করে, সাময়িক উত্তেজনায় আত্মহত্যা করে বা অন্যকে খুন করে। মেয়েরা নৈব নৈব চ। সাময়িক চাঞ্চল্যে, আবেগে বা উত্তেজনায় তারা ভেসে যায় না কিন্তু ওরা যখন দ্বিধা সংশয় কাটিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয় তখন তারা কোন কারণেই সে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে না। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর নজীর রয়েছে। পুরুষ যুদ্ধ করতে গিয়ে চুক্তি করেছে, আত্মসমর্পণ করেছে কিন্তু মেয়েরা যখন হাতে অস্ত্র নিয়েছে, তখন সে জয়লাভ করতে না পারলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে।

কাল রাত থেকেই দেবীর কথা ভাবছি। ঐ গভীর রাত্রে ও আমার ঘর থেকে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ভেবেছি। আজ সকাল থেকে যখনই সুযোগ পেয়েছি তখনই ওর কথা ভেবেছি। না ভেবে পারি নি। নারী চরিত্র সম্পর্কে আমার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নেই তবু প্রথমে মনে হয়েছিল, দেবী বোধহয় আমাকে ভালোবেসেছে। প্রেমে পড়েছে। পরে মনে হয়েছে এ ত শুধু ভালবাসা বা প্রেম নয়। আরো কিছু। এত ভেবেও এই আরো কিছুর কারণ বুঝতে পারলাম না। তবে এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে কোন রাগ, শোক, দুঃখ বা অভিমান না থাকলে ও এভাবে হঠাৎ মাঝরাতে আমার অন্ধকার ঘরে আসত না। এমন নিঃসঙ্কোচ দ্বিধাহীন হয়ে আমার সঙ্গে মিশতেও পারত না।

ও রিকশা ভাড়া দিলেও আমি প্রতিবাদ বা জোর করে দেবার চেষ্টা করলাম না। কোন কথা না বলে ওকে অনুসরণ করে ঘড়ির দোকানে গেলাম। একবার পছন্দ করার কথা বলতেই আমি শুধু বললাম, তোমার আর আমার পছন্দ একই ব্যাপার। ও একটু হেসে একটা ঘড়ি পছন্দ করে আমার হাতে পরিয়ে দিল। দোকানদার ভদ্রলোক হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, যাই বলুন, আপনার স্ত্রীর পছন্দ···

আমি কথাটা শুনেই চমকে উঠলাম কিন্তু দেবী অত্যন্ত সহজ সরলভাবে নিজেকে দেখিয়ে বললো, কেন আমার স্বামীর পছন্দ বুঝি খারাপ ?

দোকানদার ভদ্রলোক দু'হাত জোড় করে বললেন, কভি নেহি, কভি নেহি।

দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই আমি দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি হল ?

কোনটা ?

দোকানদার ভদ্রলোক না হয় বুঝতে পারেন নি কিন্তু তুমি কিভাবে···

ও এই কথা !

হ্যাঁ, এই কথা।

দেবী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মুহূর্তের জন্য কোথায় যেন তলিয়ে গেল। তারপর বললো, এই স্বীকৃতি ত জীবনে কোনদিন কারোর কাছে পাব না, তাই আনন্দে আবেগে ঐ কথা বলে ফেলেছি। এবার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি খুব রাগ করেছ ?

আমি বললাম, রাগ করাই উচিত ছিল কিন্তু পারলাম না।

কেন ?

যে দু'হাত ছেড়ে ঝাঁপ দিয়েছে তাকে ঝাঁপ দিও না বলে কি লাভ ?

ও হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, আমি বুঝি দু'হাত তুলে ঝাঁপ দিয়েছি ?

কাল রাত থেকে তোমার কথাবার্তা কাণ্ডকারখানা দেখে ত আমার তাই মনে হচ্ছে।

দু'হাত তুলেই যদি ঝাঁপ দিতে পারতাম, তাহলে কি কাল রাত্রে তোমার কোন ক্ষতি না করেই ফিরে আসতাম ?

তার মানে ?

চকের রাস্তায় অনেক মানুষের ভিড়। তার উপর গাড়ি-ঘোড়া-সাইকেল রিকশার স্রোত। তারই মধ্যে দেবী আমার একটা হাত মুহূর্তের জন্য ধরে বললো, দু'হাত তুলে ঝাঁপ দিলেও অনেক বন্ধন আমাকে টেনে ধরে আছে।

তোমার আবার কিসের বন্ধন ? বেশ ত মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বাধীন ভাবেই দিন কাটাচ্ছ।

সে তুমি বুঝবে না।

আমি বুঝব না ?

না।

কেন ?

তুমি যে পুরুষ মানুষ।
তাতে কি দোষ করলাম ?
আমি ত বলি নি দোষ করেছ।
কিন্তু আমি পুরুষ বলে...
হ্যাঁ, পুরুষ বলে আমার দুঃখ বা বন্ধন তুমি বুঝবে না।
না বললে বুঝব কেমন করে ?
একটা খালি রিকশা পাশ দিয়ে যেতেই দেবী থামিয়ে আমাকে বললো, ওঠ।
উঠলাম। তারপর ও উঠেই বললো, গোধুলিয়া।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখন বাড়ি ফিরবে না ?
এক্ষুণি বাড়ি গিয়ে কি করব ? চল, জলযোগের মিষ্টি খাই।
কাশীতে জলযোগ ?
এখানে কলকাতার গোলযোগ-জলযোগ সবই পাবে।
তাই নাকি ?
দু'জনেই হাসি।

একটু পরে আমি বললাম, যাই বল, ঘড়ির দোকানদার ভদ্রলোক আমাকে একটা অপদার্থ ভাবলেন।

কেন ?

আমার চেহারা দেখেই উনি বুঝেছেন, হয় আমি বৈদ্যবাটি-শ্রীরামপুর স্টেশনের বুকিং ক্লার্ক অথবা প্রাইমারী স্কুলের অঙ্কের মাস্টার। আর তোমাকে দেখলেই মনে হয় কোন জমিদারের আদুরে নাতনী।

তাই নাকি ?
একশ' বার।
আর কিছু মনে হয় না ?
হয় বৈকি।
শুনি।

মনে হয়—মানে ঐ দোকানদার ভদ্রলোক ভাবলেন আমার অর্থ নেই, বুদ্ধি নেই, ব্যক্তিত্ব নেই।

ব্যস ? আর কিছু ভাবেন নি ত ?
ভাবতে পারেন।
যদি বলি উনি ঠিক উল্টো কথাগুলোই ভেবেছেন।
তুমি বললেই ত উনি ভাবতে পারেন না।
আমি বলছি উনি ভাবলেন, তুমি কত সুখী, কত নিশ্চিন্ত।
কেন ?

উনি ত দেখলেনই তোমাকে তোমার কথা ভাবতে হয় না, আমিই তোমার সব ভাবনা-চিন্তার ভার নিয়েছি।

সত্যিই যদি ভাবনা-চিন্তার ভার নিতে, তাহলে ত আমি বেঁচে যেতাম।
আমি কি বলেছি তোমার ভাবনা চিন্তার ভার নেব না ?

তুমি বললেই ত আমি সব ভার তোমাকে দিতে পারি না।

কেন ?

তুমি কেন এসব আলতু-ফালতু ঝামেলা সহ্য করবে ?

যদি বলি আমার ভাল লাগে।

ভাল লাগা হচ্ছে মানুষের মনের একটা সাময়িক অবস্থা। তার উপর নির্ভর করে...

তুমি কি করে জানলে এটা আমার মনের সাময়িক অবস্থা ?

তোমার মনের এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলেও আমি তোমাকে...

কেন ?

তোমার উপর আমার কি অধিকার ?

যে অধিকারে কাল মাঝ রাত্রে আমি তোমার ঘরে গিয়েছিলাম ?

সেটা অধিকার নয়, আবেগ, উত্তেজনা বা...

দেবী আমার একটা হাতের উপর নিজের হাত রেখে বললো, বিশ্বাস কর, আমি হঠাৎ কোন আবেগ বা উত্তেজনার ঘোরে কাল তোমার কাছে যাই নি। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একটু শান্তি পাব বলেই তোমার কাছে গিয়েছিলাম।

ওর গলার স্বরে কেমন যেন আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত। আমি আর তর্ক করলাম না। শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি ?

বিশ্বনাথের মূর্তি স্পর্শ করে বলতে পারি, আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলি নি।

না, না, বিশ্বনাথকে আর টানাটানি করতে হবে না।

জলযোগের সামনে রিকশা থামতেই আমি বললাম, এই ত একটু আগে জল-খাবার খেলাম। এখন আর কিছু খাব না। বরং বিকেলের দিকে আসব।

তাহলে চল, তোমাকে হরসুন্দরী ধর্মশালা দেখিয়ে আনি।

চল।

এক মিনিটেরও পথ না। এই রাস্তার উপরেই দোতলা বাড়ি। সামনে গেট। গেটের পাশে হিন্দী আর বাংলায় লেখা—হরসুন্দরী ধর্মশালা। রাস্তার উপরে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ বাড়িটার দিকে চেয়ে রইলাম। বিশেষ লোকজন চোখে পড়ল না। একতলার বারান্দায় দু' একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। বোধহয় অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছেন। দোতলার বারান্দায় দুটো-একটা ধুতি-শাড়ি শুকোচ্ছে। সব মিলিয়ে কেমন যেন বিবর্ণ, বিষণ্ন চেহারা। অনেকটা বাঙালীর লুপ্ত-বিলুপ্ত ঐতিহ্যের মত অবস্থা।

দোতলার বারান্দায় মুহূর্তের জন্য একজন প্রবীণা মহিলাকে দেখেই মনে হল, মা নাকি ? বোধহয় আমাকেই দেখলেন।

হঠাৎ মনটা একটু উতলা হয়ে উঠল। তখনই মনে পড়ল এইখানেই ত আমার মা জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়েছেন, এই বাড়িরই কোন এক ঘরে

মায়ের স্নেহ উপভোগ করার পর থেকেই ত আমি জীবনের মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কি ভাবছি, ভাবছি আমি হঠাৎ ছোট্ট শিশু হয়ে গেছি। আমি আপন মনে মাতালের মত হাঁটছি। এ-ঘর থেকে ও-ঘর যাচ্ছি, বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে এক্কা টমটম দেখছি। মা ডাকছেন দীপ, কোথায় গেলি বাবা ? এদিকে আয়।

দীপ ভিতরে যাবে না ?

পাশে দাঁড়িয়ে দেবী আমাকে দীপ বলে ডাকতেই আমি চমকে উঠলাম। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, চল।

আমি যেন কেমন স্বপ্নাতুর হয়েই ওর পিছন পিছন হরসুন্দরী ধর্মশালায় ঢুকলাম। দেবী সামনের বারান্দায় বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কি যেন বললো। বোধহয় ভিতরে যাবার অনুমতি নিল। তারপর আমাকে বললো, এসো।

আমি ওর পিছন পিছন একতলা-দোতলার প্রত্যেকটা ঘর ঘুরলাম. রান্নার জায়গাগুলোতেও উঁকি দিলাম, উঠোনে দাঁড়ালাম। না, সব শূন্য। কোন স্মৃতি, কোন চিহ্ন নেই। নীচে নেমে এসে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, বিশ-বাইশ বছর আগের পুরোনো রেজিস্টার দেখতে পারি ?

উনি ঠোঁট উল্টে বললেন, না, সেসব নষ্ট হয়ে গেছে।

দেবী জিজ্ঞাসা করল, এবার যাবে ?

কি একটু ভেবে বললাম, চল, আরেক বার ভিতরটা ঘুরে আসি।

চল।

আমি ভিতর দিকের কোণার দিকের ঘরে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আস্তে আস্তে মেঝের উপর বসলাম। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ঐ বিগ্রহ-বিহীন শূন্য মন্দিরের মেঝেয় প্রণাম করলাম। মনে মনে মাকে কত কথা বললাম, কত কথা শুনলাম। গলা জড়িয়ে মাকে আদর করলাম, মা আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, তুই কি চিরকালই ছোট থাকবি ? কোনদিনই বড় হবি না ?

সবাই যে বলে আমি অনেক বড় হয়েছি ?

বড় হলে মার কোলের মধ্যে এসে এভাবে কেউ কাঁদে ? তুই আর বড় হবি না।

হঠাৎ মাথার উপর একটা হাতের ছোঁয়া লাগতেই ঝাপসা চোখে তাকিয়ে দেখি দেবী কাঁদছে। আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। ছোট শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে ওর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, দেবী, একবার আমাকে দীপ বলে ডাকবে ?

ও কাঁদতে কাঁদতে দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে কোনমতে বললো, দীপ !

এবার আর রিকশায় নয়, হাঁটতে হাঁটতেই বাড়ি ফিরছিলাম। বড় রাস্তা পার হয়ে গলিতে ঢুকতে যাব, এমন সময় দেবী বললো, চল, একটু ঘাটে ঘুরে আসি।

এত বেলায় গঙ্গার ধারে যাবে ?

এমন কিছু ত বেলা হয় নি।

চল।

নিঃশব্দে ওর পিছন পিছন দশাশ্বমেধ ঘাটে গেলাম। দু'একবার এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করলাম। হঠাৎ একজন বৃদ্ধ মাঝি এসে জিজ্ঞাসা করল, বাবুজি, নৌকা চড়বেন ?

আমি বললাম, না।

দেবী বললো, না কেন ? চল একটু ঘুরে আসি। ভাল লাগবে।

প্রতিবাদ করার মত মনের অবস্থা ছিল না। কিছু না বলেই ওর পিছন পিছন সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছলাম। দেবী নীচু হয়ে গঙ্গা স্পর্শ করে আমার মাথায় একটু জল ছিটিয়ে দিতেই আমি একটু হাসলাম।

হাসলে কেন ?

তুমি আমার মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে বলে। এসব ত মা-মাসীরা করেন।

তোমার মা-মাসী যখন নেই তখন আমিই না হয় সে কাজটা করে দিলাম।

বুড়ো মাঝি জলের মধ্যে একটু নেমে নৌকাটা কাছে টেনে আনতেই আমরা উঠলাম। পাশাপাশি বসলাম। নৌকায় বসেই একবার দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে চেয়ে দেখি বিশেষ লোকজন নেই। সামান্য কয়েকজন নারীপুরুষ স্নান করছেন।

দেবী বললো, এবার পুজোর সময় এখানে এসো।

কেন ?

বিজয়ার দিন দশাশ্বমেধ ঘাট সত্যি দেখার জিনিস।

সেদিন কি হয় ?

সারা শহরের সমস্ত দুর্গা প্রতিমা এই ঘাটে এসে জমা হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরতি চলে আর লাখ লাখ মানুষ ঘাটে দাঁড়িয়ে বা নৌকায় চড়ে বেড়াতে বেড়াতে তাই দেখে।

আর কি হয় ?

সন্ধ্যার পর নৌকার উপর অতগুলো মূর্তি যখন আরতি হয় তখন এই

গঙ্গার রূপও যেন পাল্টে যায়। চারদিকে আলোয় আলো, কাঁসর ঘণ্টা ঢাকের আওয়াজ, ধূপ-ধুনো, আরতি কীর্তন আর লোকের ভিড়—সব মিলিয়ে সত্যি অপূর্ব দেখায়।

বিসর্জন হয় কখন ?

অনেক পরে। মিত্তির বাড়ির ঘট বিসর্জনের পর একে একে অন্যান্য মূর্তির বিসর্জন হয়।

মিত্তির বাড়ির ঘট বিসর্জনের পর কেন ?

চৌখাম্বার জমিদার ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। খুব প্রাচীন ও বনেদী পরিবার। বোধহয় ওদের বাড়িতেই সব চাইতে বেশী দিন ধরে পূজা হচ্ছে। তাই…

তাই বলে এখনও ওদের মূর্তি বিসর্জন না হলে অন্য মূর্তি বিসর্জন হবে না ?

এসব ব্যাপারে একটা প্রথা চালু হলে সেটা চলতেই থাকে। তাছাড়া চৌখাম্বার মিত্তির বাড়ির ঐতিহ্যই আলাদা।

কেন ? জমিদার ছিলেন বলে ?

শুধু তাই নয়। ও বাড়ির প্রমদা মিত্র শুধু বড় জমিদারই ছিলেন না, নামকরা পণ্ডিতও ছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

স্বামীজির নাম শুনেই আমার মনে একটু শ্রদ্ধা এলো। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তাই নাকি ?

হ্যাঁ। স্বামীজি যখনই কাশী এসেছেন তখনই ওদের বাড়ি উঠতেন।

তুমি ত কাশীর অনেক ইতিহাস জানো।

অনেক ইতিহাস জানি না ; কিছু জানি।

বুড়ো মাঝি দু'হাতে দুটো দাঁড় টেনে নৌকা এগিয়ে নিয়ে চলেছে হরিশ্চন্দ্র ঘাটের দিকে। আমি এদিক-ওদিক দেখছি। দেবী মাঝে মাঝে গঙ্গাজলে একটা হাত ডুবিয়ে দিচ্ছে। একটু পরে ও আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগছে ?

ভাল।

নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে।

কেন ?

কাশীর নোংরামী আর কুসংস্কার থেকে দূরে থেকে অনেক দিনের অনেক ইতিহাস যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আঙুল দিয়ে একটু দূরের একটা ঘাট দেখিয়ে দেবী বললো, ঐ চৌষট্টি ঘাটের কাছেই মধুসূদন সরস্বতীর আশ্রম ছিল।

কোন্ মধুসূদন সরস্বতী ?

আমার প্রশ্ন শুনে দেবী একটু হেসে বললো, তোমাদের মত কলকাতার ছেলেদের এই হচ্ছে দোষ। কিছু বই মুখস্থ করে বি-এ, এম-এ পাশ করো ঠিকই কিন্তু নিজের দেশের বিষয় কিচ্ছু জান না।

এবার আমি হেসে বললাম, এই বুঝি আমার প্রশ্নের উত্তর হল ?

না। শঙ্করাচার্যর দর্শনকে কাশীতে যিনি প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় করেন সেই বাঙালী পণ্ডিত হচ্ছেন মধুসূদন সরস্বতী।

তাই নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শঙ্করাচার্যও ত কাশীতে এসেছিলেন।

শুধু এসেছিলেন তাই নয়, এখানকার মণিকর্ণিকার শ্মশানেই শঙ্কর-ভাষ্যের জন্ম হয়।

জন্ম হয় মানে ?

দেবী আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, সে কাহিনী জান না ?

না।

দেবী শুরু করল, শঙ্করাচার্য মণিকর্ণিকা শ্মশানে ঘুরাঘুরি করছেন। এক চণ্ডাল ওঁকে বললো, সরে যাও। চণ্ডালের কথা শুনে শঙ্করাচার্য চমকে উঠলেন। ভাবলেন, কি সরে যাবে ? আত্মা না দেহ ? আত্মা বা চৈতন্য ত চির সত্য। সে ত কখনও অপবিত্র হয় না, হতে পারে না। তবে কি দেহ সরিয়ে নিতে বলছে ? ক্ষিতি-অপ-তেজঃ-মরুৎ ও ব্যোমের এই দেহের কোনটি অপবিত্র ? দেবী একটু হেসে বললো, মণিকর্ণিকার শ্মশানে শঙ্করাচার্যের এই উপলব্ধি থেকেই শঙ্করভাষ্যের জন্ম।

আমি মুগ্ধ, স্তম্ভিত হয়ে শুধু বললাম, কি আশ্চর্য ! কত সামান্য একটা ঘটনা থেকে…

আমি কথাটা শেষ করার আগেই দেবী বললো, সব সময়ই সামান্য একটা ঘটনা থেকে ইতিহাস সৃষ্টি হয় ; সেদিন তুমি যদি রাগ না করতে তাহলে কি আমি ওভাবে রাত্তির বেলায় তোমার কাছে যেতাম ? নাকি আজ এভাবে তোমার পাশে বসে নৌকায় চড়ে বেড়াতাম ?

তা ঠিক।

বুড়ো মাঝি জিজ্ঞাসা করল, আর আগে যাব ?

দেবী বললো, না। ফিরে চল। পাশের শ্মশান দেখিয়ে আমাকে বললো, এটা হরিশ্চন্দ্র ঘাট। এখানেই রাজা হরিশ্চন্দ্র…

কলকাতার ছেলেরাও রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী জানে।

কেন এভাবে চিমটি কাটছ ?

একটু আগে ঘড়ি কিনে দিলে আর আমি তোমাকে চিমটি কাটব ?

হঠাৎ দেবীর মুখের চেহারা পাল্টে গেল। বললো, এভাবে কথা বললে আমি এক্ষুনি ঘড়িটাকে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

ঘড়িটা কি আমার ?

নিশ্চয়ই।

তাহলে তুমি জলে ফেলে দেবে কেন ?

হঠাৎ রাগ করে বলেছি।

এর মধ্যেই রাগ করতে শুরু করলে ?

রাগ করা সব সময়ই অন্যায় কিন্তু আমাকে ওভাবে কথা বলাটাও বোধহয় তোমার উচিত হয় নি।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে হাসি।

দেবী বললো মাঝে মাঝে ঝগড়া করতে বেশ ভাল লাগে, তাই না ?

হ্যাঁ।

ঝগড়ার পর ভাব হলে আরো ভাল লাগে, তাই না ?

আমি হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বুঝি আরো ভাল লাগছে ?

'একশ' বার লাগছে।

আরো ভাল লাগছে মানে কি রকম লাগছে ?

মিট-মিট করে হাসতে হাসতে দেবী জিজ্ঞাসা করল, জানতে চাও ?

হ্যাঁ।

তোমাকে আরো ভাল লাগছে, আর··

দেবী কথাটা শেষ না করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর কি ?

এই বুড়ো মাঝি না থাকলে তোমাকে একটু কাছে টেনে নিতাম।

কি সর্বনাশ !

সত্যি কথাটা বললাম বলে তোমার ভাল লাগল না, তাই না ?

না, না, তা কেন হবে ?

তাহলে সর্বনাশের কি হল ? আমি কি শিশু না কি দিদির মত বুড়ী যে তোমাকে একটু কাছে পেতেও ইচ্ছা করবে না ?

দেবীর কথা শুনে আমি স্তম্ভিত না হয়ে পারি না। ভাবি এর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই ? ও কি জানে না এ সংসারে বাস করতে হলে অলিখিত কিছু অনুশাসন মেনে চলতে হয় ? আমার সঙ্গে হৃদ্যতা-ঘনিষ্ঠতা করার পরিসীমা খুব বিস্তৃত নয়। মনে মনে লুকিয়ে লুকিয়ে হয়ত অনেক কিছুই সম্ভব, কিন্তু এভাবে প্রকাশ্যে মনের ইচ্ছা বা সুপ্ত প্রবৃত্তি প্রকাশ করা কি খুব রুচি-সম্মত ? তাছাড়া সবকিছু পরিণতিরই একটা নিয়ম আছে। গাছে ফুল হয় ফল ধরে কিন্তু ছোট্ট সামান্য একটা বীজ বা চারাকে সে পরিণতিতে পৌঁছবার আগে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতে হয়। সেই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা না করেই দেবী কোন অধিকারে এভাবে নিজের মনের ইচ্ছার কথা আমাকে জানালো ?

আমিও রক্ত-মাংসের মানুষ। অতি সাধারণ মানুষ। আমার ঘর না থাকলেও গৃহী ; সংসার না থাকলেও সংসারী। ক্ষুধা-তৃষ্ণার মত আমার কাম-ক্রোধও আছে। ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে আমি স্নেহের কাঙাল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেবীর মত কোন মেয়েকে ভালবাসায় ভরিয়ে দিতেও মন ব্যগ্র।

দেবীকে প্রথম দিন দেখেই আমার ভাল লেগেছিল। ভাল না লাগার কোন কারণ ছিল না। ওর রূপ আছে যৌবন আছে আন্তরিকতা আছে। আর কি

চাই ? কলকাতায় ফিরে যাবার পর বোধহয় মনে মনে উপলব্ধি করেছিলাম আমি ওকে ভালবাসি। সম্ভবত সেই অকারণ উপলব্ধি আর ভিত্তিহীন ধারণার মূলধন নিয়েই এখানে ছুটে আসি। এখানে এসে মনে হয়েছে বোধহয় ভুল করি নি, কিন্তু...

আমার মত বেহায়া মেয়েকে নিয়ে আর কত ভাববে ? এসো বাড়ি যাই।

আমি চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি দশাশ্বমেধ ঘাটে পেঁছে গেছি। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাড়া দিয়েছ ?

না।

কত দেব ?

বুড়ো মানুষ ! দুটো টাকাই দিয়ে দাও।

মাঝিকে দুটো টাকা দিয়ে নৌকা থেকে নেমে পড়লাম। আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলাম। সকালবেলায় যে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ভিখারীর দল পুণ্যলোভাতুর স্নানাথীদের কাছে ভিক্ষার আশায় লাইন করে বসে থাকে তারা এলোমেলো হয়ে গেছে। কেউ পয়সা গুনছে, কেউ ভিক্ষার চাল ভাঙা হাঁড়িতে চড়িয়েছে। ওদের মধ্যে যারা বিলাসী তারা গাঁজার কলকেয় টান দিচ্ছে।

বললাম, আমার মত মানুষের চাইতে এরা অনেক সুখী।

কেন ?

যত দুঃখ-দুর্দশাই থাক না কেন এদেরও ঘর-সংসার আছে, প্রিয়জন আছে।...

তোমার নেই ?

জানি না।

হাতে শাঁখা সিঁথিতে সিঁদুর না থাকলে বুঝি আপন ভাবা যায় না ?

আমি চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চাইলাম।

দেবী গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে কি দেখছ ? জবাব দাও।

আমি জবাব দিতে পারলাম না। মুখ নীচু করে হাঁটতে শুরু করলাম।

হাজার হোক ভিখারিণীর মত তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে গেছি বলে তুমি আমাকে ঠিক মর্যাদা দিতে পারছ না।

কি বলছ ?

ঠিকই বলছি।

আমি আবার চুপ।

আমি চুপ করে থাকলেও দেবী চুপ করে রইল না। বললো, ভয় নেই দীপ, আমি ভিখারিণীর মত ভিক্ষা নিয়েই চলে যাবো।

তার মানে ?

তার মানে তোমার ধন-সম্পত্তির উপর আমি হাত দেব না।

আমার আবার ধন সম্পত্তি কোথায় ? তাছাড়া ভিখারিণীর মত কি ভিক্ষা নেবে ?

শুধু অর্থই কি মানুষের একমাত্র সম্পদ? আমি যে সম্পদের কথা বলছি সে সম্পদ তোমার আছে, কিন্তু...

সোজা কোথায় বল ত কি বলতে চাইছ।

বলব?

বলো।

কথায় কথায় বাঙালীটোলার গলির মধ্যে এসে গেছি। দেবী বলল, বাড়ি গিয়ে বলব।

গলির মধ্যে আর কথা না বলে তাড়াতাড়ি বাড়ি গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই দিদি বললেন, ঘড়ি কিনতে এতক্ষণ লাগল?

বললাম—না দিদি ঘড়ি কিনতে এতক্ষণ লাগে নি। ঘড়ি কেনার পর একটু হরসুন্দরী ধর্মশালায় গিয়েছিলাম।

গিয়েছিলি?

হ্যাঁ।

দিদি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, মানুষ চলে যায় কিন্তু তার স্মৃতি তো পড়ে থাকে।

আমি কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে বসবার ঘরে ঢুকতেই দেবী বললো, দিদিকে ঘড়িটা দেখিয়ে যাও।

ওর কথাটা শুনে একটু লজ্জিতবোধ করলাম। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ঘড়িটা দেখিয়ে বললাম, দিদি, ঘড়িটা খুব সুন্দর না?

খুব আগ্রহের সঙ্গে ঘড়িটা দেখে দিদি বললেন, হ্যাঁ। খুব ভাল হয়েছে।

এত দামী ঘড়ি আমি কিনতে চাই নি কিন্তু তোমার বড়লোক নাতনীর জন্য বাধ্য হয়ে কিনতে হল।

দেবী সঙ্গে সঙ্গে বললো, আচ্ছা দিদি এর চাইতে সস্তা ঘড়ি হাতে দিয়ে আমার মত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করা কি ঠিক?

দিদি একটু রাগ করেই ওকে বললেন, তোর কি কথা বলার কোন ছিরি হবে না?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, দিদি, সবাই কি আমার মত ভদ্র সভ্য হয়?

দিদি বললেন, তা যা বলেছিস। এবার তোরা খেতে চল। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

দিদি রান্নাঘরের দিকে একটু এগোতেই দেবী আমাকে বললো, তুমি বেশ মোসাহেবী করতে পারো।

আমি মোসাহেবী করলাম?

এটাও যদি মোসাহেবী না হয় তাহলে মোসাহেবী কাকে বলে?

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আমার ঘরে যাবার একটু পরেই দেবী এলো। জিজ্ঞাসা করল, পান খাবে?

না, আমি পান খাই না।

আঁচলের ভিতর থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও। এতে ত আপত্তি নেই ?

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কি দেখছ ? নাও।

কিন্তু…

আবার কিন্তু কিসের ?

মানে আমি সিগারেট খাই না।

এতদিন খাও নি বলে কি কোনদিনই খাবে না ?

না তা না।…

সব কিছুই একদিন না একদিন শুরু করতে হয়। আজ না হয় সিগারেট খাওয়াই শুরু করলে।

হঠাৎ সিগারেট কিনলে কেন ?

ছেলেরা একটু-আধটু সিগারেট না খেলে কি দেখতে ভাল লাগে ?

লাগে না ?

না।

কেন ?

কেমন মেয়ে মেয়ে লাগে।

আমাকে ভালো লাগে না বলেই কি…

ভালো লাগে না তা একবারও আমি বলি নি…

তাহলে…

সিগারেট খেলে আরো বেশী ভালো লাগবে।

আমি আর তর্ক না করে একটু হেসে হাত বাড়িয়ে বললাম, দাও।

দেবীর হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়েই বললাম, দেশলাই কোথায় ?

সরি ! সিগারেট খেতে যে দেশলাই লাগে তা খেয়ালই নেই। একটু দাঁড়াও এখুনি আনছি।

দেবী চট করে রান্নাঘর থেকে দেশলাই এনে দিতেই আমি সত্যি সত্যি একটা সিগারেট ধরালাম। একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, ভাল লাগছে ?

দেবী সোজাসুজি আমার কথার জবাব না দিয়ে একটু আনমনা হয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকাল। তারপর দৃষ্টিটা গুটিয়ে এনে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আসল কথা কি জান দীপ, ভাল হয়ে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। শুধু সংযম আর নিয়ম মেনে চলতে কি কারুর ভাল লাগে ?

আমি বুঝতে পারলাম না ওর ভাল হয়ে থাকা বা সংযম আর নিয়ম মেনে চলার সঙ্গে আমার সিগারেট খাবার কি সম্পর্ক। তবুও কোনও প্রশ্ন করলাম না।

দেবী আমার একটা হাতের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে

বললো, এই পৃথিবীতে ভাল হয়ে থাকার কোন মূল্য নেই। ভাল হয়ে থাকলেই বঞ্চনার জ্বালা ভোগ করতে হবে। আমি সে যন্ত্রণা ভোগ করছি বলে তুমি কেন ভোগ করবে? ও হঠাৎ আমার হাতটা একটু জোরে চেপে ধরে বললো, তিলে তিলে শুকিয়ে শুকিয়ে আমি তোমাকে মরতে দেব না।

মিনিটখানেক চুপচাপ বসে থাকার পর দেবী নিঃশব্দে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বাধা দিলাম না। আমিও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। একবার মনে হল দিদির কাছে যাই। জিজ্ঞাসা করি, দিদি, দেবীর বিয়ে দেবে না? দিদি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন, হঠাৎ তুই ওর বিয়ের কথা বলছিস কেন? একথার অনেক জবাব দেওয়া যায়। বলতে পারি, হাজার হোক ওর এখন বিয়ে না দিলে আর কবে বিয়ে দেবে? এই ধরনের অনেক জবাব দেওয়া ছাড়াও সোজাসুজি বলতে পারি, দিদি, একটা কথা বলব?

বল।

আমার মনে হয় এখুনি দেবীর বিয়ে দাও।

কেন? ও কিছু বলেছে?

না, কিছু বলে নি। তবে ওর কথাবার্তা শুনে মনে হয় ওর বিয়ে করার ইচ্ছা হয়েছে।

আমার মনে হল, না, দিদির সঙ্গে এসব আলোচনা করা ঠিক হবে না। হয়ত মনে করবেন আমিই ওকে বিয়ে করতে চাই। অথবা অন্য কিছু। তাছাড়া আরো অনেক কারণে দেবীর কথা তোলা ঠিক হবে না। শিখা নামে একটা আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে মাঝে মাঝে পিসীর বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। পিসী বাড়িতে না থাকলে বা কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে আমার সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বলতো। পরে একদিন কথায় কথায় পিসী বললেন, শিখাকে দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

পিসী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আর বলিস না বাপু! কত কাণ্ড করে ওর বাবা-মা মেয়েটার বিয়ে দিল কিন্তু স্বামীর ঘর করা ওর কপালে সইল না।

কেন? শিখা কি বিধবা?

প্রায় সেই রকমই।

প্রায় সেই রকমই মানে? স্বামী কি খুব অসুস্থ?

না না, সে হারামজাদা ঘোড়ার মত টগবগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তবে ?

ঐ হারামজাদারা মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কেন ?

এক নম্বরের ছোটলোক ছাড়া কি বলব ! সব কথা ওরাও বলে না, আমিও জিজ্ঞাসা করি না। তুইই বল, এসব বিষয় কি আলাপ-আলোচনা করা যায় ?

তা ত বটেই।

তবে পাঠ শুনতে ঘাটে গিয়ে চৌধুরী গিন্নীর কাছে শুনেছি, মেয়েটার বাবা বিশেষ কিছু দিতে পারি নি বলে ওরা ওকে রেখে চলে গেছে।

কিন্তু

কিছু কিন্তু নেই রে। ঝি-চাকরের দেমাগ থাকতে পারে কিন্তু বামুনের ঘরের বউদের একটু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেই শ্বশুরবাড়িতে ঝাঁটা-লাথি খেতে হবে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাই বলে বিয়ে করা বৌকে স্বামী তাড়িয়ে দেবে ?

পিসী হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন, মনে হচ্ছে তুই যেন শিখার কথা শুনে অবাক হয়েছিস ?

অবাক হবো না ?

এই বাঙালীটোলায় অমন গণ্ডা গণ্ডা শিখা পাবি। আবার শিখার শ্বশুরবাড়িরও অভাব নেই এই বাঙালীটোলার গলিতে !

বল কি পিসী ?

আমার নীচের তলায় মণির কথা তোকে বলেছি ?

মানে, মণি পিসী ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

বলবে বলেছিলে কিন্তু বল নি।

মণি কাশীতে না জন্মালেও ছোটবেলা থেকেই এখানে। ওর বাবা-মা এখানে, এই বাঙালীটোলায় বহুকাল ছিলেন। মণি যখন তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সের তখন ঘাটে পাঠ শুনতে গিয়ে জঙ্গমবাড়ির এক মহিলার সঙ্গে তার আলাপ হয়।

তারপর ?

একদিন মার সঙ্গে মণিও পাঠ শুনতে গেলে ওকে দেখে ঐ ভদ্রমহিলার বড্ড পছন্দ হয় এবং ছেলের বিয়ে দিতে চান। মণিকে বা মণির মাকে দেখে উনি বুঝতে পারেন নি ওদের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। উনি নিশ্চয়ই আশা করে-ছিলেন ছেলের বিয়েতে অনেক সোনা-দানা পাবেন।

মণি পিসীদের বাড়িতে গিয়ে ত বুঝতে পেরেছিলেন যে ওরা অত্যন্ত সাধারণ পরিবার।

না, তা বুঝতে পারেন নি।

সে কি ?

ছেলের বিয়ে দিতে এসে ত কেউ রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর দেখে না। বাইরে থেকে কেউ জানতেও পারে না কার কত সোনাদানা টাকাপয়সা আছে।

কিন্তু যে-কোন বাড়িতে গেলেই ত মোটামুটিভাবে তাদের অবস্থা-বোঝা যায়।

পিসী একটু বকুনি দিয়ে বললেন, তুই ছোঁড়া বড্ড তর্ক করিস। বাইরে থেকে দেখে বাঙালীটোলার সব বামুনদের অবস্থাই এক মনে হয়। কোন বাড়ি দেখে কি তোর মনে হয়েছে এ বাড়িতে বিলেতফেরত ব্যারিস্টার থাকেন ?

আমি আর তর্ক করি না। হাসি। তারপর চুপ করে শুনে যাই।

ঐ ভদ্রমহিলার ছেলের সঙ্গেই মণি পিসীর বিয়ে হয়ে গেল। মাস কয়েক পরে গ্রামের জমিজমা দেখতে যাচ্ছেন বলে ওরা মণি পিসীকে বাপের বাড়িতে রেখে কিছুদিনের জন্য দেশে গেলেন কিন্তু তারপর তাদের আর কোন খবর পাওয়া যায় না।

তারপর ?

তারপর আর কি ? তাদের আর কোন হদিশ পাওয়া গেল না।

কি আশ্চর্য ?

আগেই আশ্চর্য হচ্ছিস কেন ? আগে সবকিছু শোন। ইতিমধ্যে মণির একটা মেয়ে হয়েছে এবং সেও বছর দু'তিনেক হয়ে গেছে, এমন সময় মণির বাবা মারা গেলেন।

হা ভগবান !

মণির মা এর-ওর বাড়ি রান্না করে কোন মতে সংসার চালাতে চালাতেই দশজনের সাহায্যে ছোট মেয়েটার বিয়ে দিলেন কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মেয়েটা শাঁখা-সিঁদুর খুইয়ে মার কাছে ফিরে এলো।

চমৎকার !

পিসী যেন মণি পিসীর দুঃখের কাহিনী বলতেও কষ্ট বোধ করেন। তাইতো বললেন, ও যে কি দুঃখ-কষ্টে দিন কাটিয়েছে তা আমি ভাবতেও পারি না।

শ্বশুরবাড়ি থেকে আর ওকে নিতে আসে নি ?

মণির যখন তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স তখন একবার ওর হতচ্ছাড়া স্বামীর সঙ্গে কেদার ঘাটে দেখা হয়েছিল কিন্তু সে হারামজাদা বদমাইসী করে ওকে চিনতে পারল না।

মণি পিসীর মেয়ে কোথায় ?

একবার বন্যার পর এখানে খুব কলেরা হয়। সেই কলেরাতেই ওর বোন আর মেয়েটা মারা যায়।

মণি পিসীর বিষয়ে আমি আর প্রশ্ন করি নি। পিসী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, কাশীতে থাকতে থাকতে কত হাজার হাজার মণি দেখলাম তা

বলতে পারব না। কার জীবনে যে কি ঘটেছে তা শুধু বাবা বিশ্বনাথই জানেন।

তাইতো দেবীর ব্যাপারে দিদিকে আমি কিছু বললাম না। জানি না হয়ত ওর জীবনেও কিছু অঘটন ঘটে গেছে। দিদি, পিসী বা দেবী কেউই আমাকে কিছু বলে নি কিন্তু দেবীর হাবভাব আলাপ-আচরণ দেখে মনে হয়…

বসে বসে কি ভাবছ ?

আপন মনে বসে বসে কত কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ দেবী এসে প্রশ্ন করতেই একটু যেন চমকে উঠলাম। একটু হেসে বললাম, না, কি আর ভাবব !

দেবী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কেন, বলতে লজ্জা করছে ?

লজ্জা করবে কেন ?

তবে কি ভয় করছে ?

ভয় ?

হয় লজ্জা না হয় ভয় ! যে-কোন একটা কারণে আমাকে কিছু বলছ না। তবে কি দ্বিধা ?

এবার আমি কোন জবাব দিই না।

দেবী ইজিচেয়ারে বসে বললো, আমার কাণ্ডকারখানা দেখে তোমার মনে অনেক প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। আমি সেজন্য তোমাকে দোষ দিই না।

আমি মুখ নীচু করে বসে থাকি।

দীপ !

বলো।

চলো সারনাথ ঘুরে আসি।

এখন ? এত বেলায় এখন সারনাথ গেলে ফিরতে দেরী হয়ে যাবে না ?

হলেই বা ক্ষতি কি ?

দিদি যদি কিছু মনে করেন ?

কি মনে করবেন ? দেবী একটু মুচকি হেসে বললো, তোমার প্রতি দিদির অগাধ বিশ্বাস। তিনি জানেন তোমার দ্বারা আমার কোন সর্বনাশ হবে না।

তুমি উকিল হলে না কেন ?

উকিল হবো কেন।

যে-কথা আমরা কখনই বলতে পারব না, সে-কথা উকিলবাবুরা নির্বিবাদে বলতে পারেন।

ও ! এই জন্য ?

হ্যাঁ, এই জন্য।

আমি কি মিথ্যে কথা বলেছি ?

আমি ত তা বলি নি।

তবে ?

সত্যি কথাও এভাবে বলার কি দরকার ? তাছাড়া তুমি কি করে আমার সম্পর্কে দিদির মনের কথা জানলে ?

শুনতে চাও।

যদি আপত্তি না থাকে।

বিন্দুমাত্র না।

তাহলে বলো।

দেবী গম্ভীর হয়ে শুরু করল, নিজের প্রশংসা আমি করতে চাই না কিন্তু তবু একথা নিশ্চয় তুমি স্বীকার করবে আমাকে দেখে অনেকেরই ভাব করতে ইচ্ছে করে। দু-একজন অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দিদি একটু ইঙ্গিত পেতেই তাদের বিদায় করে দেন। অথচ তোমাকে নিয়ে যে আমি যেখানে খুশী ঘুরে বেড়াচ্ছি তার জন্য দিদি একটি কথাও বলছেন না।

কিন্তু আমার সম্পর্কে দিদির উদারতার কারণ কি ? আমি কি সন্ন্যাসী ? নাকি অবোধ শিশু ?

দেবী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ওসব কথা বাদ দাও। চলো ঘুরে আসি।

দিদি কোথায় ?

নিশ্চয়ই শুয়ে শুয়ে কোন ঠাকুর-দেবতার গল্প পড়ছেন।

দাঁড়াও, আমি দিদিকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

যাও কিন্তু দেখো, দিদি আপত্তি করবেন না।

আমি দিদির ঘরে যেতেই বললেন, কিছু বলবি ?

বললাম, দিদি আমি ত আর কয়েক দিনের মধ্যেই চলে যাবো, তাই ভাবছিলাম একটু সারনাথ ঘুরে আসি।

ক'দিনের মধ্যেই চলে যাবি কেন ? হাজার হোক তুই সোনা বউয়ের ছেলে। তোকে কাছে পেলে যে কি ভাল লাগে তা বলতে পারব না।

তা জানি বলেই ত এসেছি।

এখনই সারনাথ যাবি ?

তাই তো ভাবছিলাম।

তুই কি একলা যেতে পারবি ? দেবী কি করছে ?

আমার ঘরে বসে বই পড়ছে।

তুই বরং ওকে সঙ্গে নিয়ে যা।

ও বই পড়ছে ! ও বোধহয় এখন যাবে না।

না, না, ওকে নিয়ে যা। তুই চলে গেলে ত ও হতভাগীও আর ঘর থেকে বেরুবে না।

ফিরতে ফিরতে নিশ্চয়ই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তুমি চিন্তা করো না।

তবে বেশী রাত করিস না।

বেশী রাত কেন করব ? মনে হয় সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যেই ফিরতে পারব।

দিদির ঘর থেকে বেরুতেই দেখি দেবী দাঁড়িয়ে আছে। হাসতে হাসতে আমার পিছন পিছন আমার ঘরে ঢুকেই বললো, দেখে মনে হয় ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জান না!

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কি করব? তোমার জন্য আরো কত কি করতে হবে তা কে জানে!

তাহলে আরো কিছু করতে চাও?

এই মাঝ-পথে গাড়ি থেকে নেমে পড়া কি ঠিক হবে?

দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। গলিতে পা দিতে না দিতেই দেবী বললো, মুক্তির স্বাদই আলাদা!

আমি হাসতে হাসতে বললাম, সারনাথের পথে পা বাড়াতে না বাড়াতেই যে তুমি ভগবান বুদ্ধের মত কথা বলতে শুরু করলে।

তাই নাকি?

তা না হলে হঠাৎ এমন কী মুক্তির স্বাদ পেলে?

আমার মত সাধারণ মেয়েরা বাড়ির বাইরে বেরুতে পারলেই মুক্তির আনন্দ পায়।

বাড়িতে থাকলেই কি মেয়েরা বন্দিনী হয়ে যায়?

একশ'বার।

কেন?

আমাদের মত নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হলে সব পুরুষরা একদিনেই আত্মহত্যা করতো।

বাঙালীটোলার গলি এখন একটু নির্জন। ভোরবেলায় কমণ্ডলু হাতে নিয়ে পিঁপড়ের মত লাইন দিয়ে যাঁরা গঙ্গায় গিয়েছিলেন, তাঁরা বাবা বিশ্বনাথ আর ছত্রিশকোটি দেবতার মাথায় জল ঢেলে বাজার-হাট করে মধ্যাহ্নের সূর্য মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন অনেক আগেই। দু'মুঠো তণ্ডুল সিদ্ধ করে উদর পূর্তি করে তাঁরা এখন একটু ঝিমুচ্ছেন। গামছা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করে কলতলায় যাবার এখনও দেরী আছে। এই গলিতে যাঁদের চাল-ডাল-আটা-ময়দা, আলুরি-ফুলুরি, দানাদার গুজিয়া বা লক্ষ্মীর পাঁচালীর দোকান আছে তাঁরাও এখন ঝাঁপ বন্ধ করে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এমন কি ষাঁড়গুলোও ক্লান্ত হয়ে এখন একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছে।

এই নির্জন গলি দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার মত বয়সে সব মেয়েরাই একটু অতৃপ্তির জ্বালা ভোগ করে।

ঠিক, কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ আছে।

তোমার নেই ?

না।

আমি হাসতে হাসতে বলি, এরপর বোধহয় বলবে তোমার বর্তমানও নেই।

দেবযানী চোখ দুটো একটু উজ্জ্বল করে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, না, তা বলবো না।

কেন ?

তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি ; তবু বলবো বর্তমান নেই ?

আমি কোন জবাব দিলাম না। গলি পার হয়ে মোড়ের মাথায় এসে টাঙ্গা নিয়ে দুজনে উঠলাম। টাঙ্গা চলতে শুরু করল কিন্তু তবু আমি চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ দেবী খেয়াল না করলেও একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে ? উত্তরের অপেক্ষা না করেই ও আমার কপালে হাত দিল।

আমি একটু গম্ভীর হয়েই বললাম, ভয় নেই তোমার, সেবা করতে হবে না।

আমি জানি তোমাকে আমার সেবা করতে হবে না।

কি করে জানলে ?

আমার দিকে না তাকিয়েই দেবী গম্ভীর হয়ে বললো, আমার মত কাঁচা বিধবার সেবা নেবার সাহস তোমার নেই।

আমি স্তম্ভিত, হতবাক হয়ে ওর একটা হাত চেপে ধরে বললাম, কি বললে ?

ঠিকই ত শুনেছ। আবার শুনতে ইচ্ছে করছে ?

আমি ওর দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা গুটিয়ে নিলাম। দেখলাম মধ্যাহ্নের যে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ঝলসে যেতো সে সূর্য ম্লান। অস্তগামী।

দেবী !

বলো।

তুমি ত আগে কিছুই…

অনেকবার ভেবেছি কিন্তু বলব বলব করেও শেষ পর্যন্ত বলতে পারি নি। উদাস দৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকিয়েই দেবী আমার হাতের উপর হাত রেখে বললো, বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি আমাকে ক্ষমা…

কি আজেবাজে কথা বলছ ?

সত্যি দীপ, এভাবে তোমাকে কাছে টেনে নেওয়া ঠিক হয় নি।

টাঙ্গা ছুটছে। আশেপাশে কত মানুষ কত ভিড়। কত দোকান, কত গাড়ি-ঘোড়া কিন্তু কিছু দেখছি না। দেখতে পারছি না। কিছু বলতেও পারছি না।

দেবী বললো, ভানুদা মারা যাবার পর হঠাৎ যেন অন্ধকার মনে হল। মনে হল এ পৃথিবীতে আমার আপনজন কেউ নেই। তারপর তোমার কথা মনে হল।

হঠাৎ আমার কথা কেন মনে হল ?

তা বলতে পারব না ; তবে মনে হল, তুমি বোধহয় আমাকে দূরে ঠেলে দেবে না।

দিদিকেও তোমার আপন মনে হল না ?

বুড়ী দিদিমা নিশ্চয়ই আপন লোক কিন্তু এ বয়সে তাঁকে ভাল লাগার একটা সীমা আছে।

ভানুদা বেঁচে থাকতে এসব কথা মনে হয় নি ?

না।

কেন ?

ভানুদার কাছে এত কিছু পেয়েছি যে বিধবা হবার দৈন্য কখনো মনকে কষ্ট দেয় নি।

বহুকাল আগে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং সন্ন্যাসের দৃশ্য দেখে ঊনত্রিশ বছর বয়সের এক রাজপুত্রের মনে বৈরাগ্য দেখা দেয়। তারপর ঘুরতে ঘুরতে গয়ার কাছে এসে পাঁচজন সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। একদিন ঐ পঞ্চ সন্ন্যাসী ওঁকে ত্যাগ করে চলে গেলেও ঐ উন্মাদ রাজপুত্রের তপস্যার ব্যাঘাত ঘটল না। প্রায় ছ বছর পর শ্রেষ্ঠীকন্যা সুজাতা পরমান্ন দিয়ে তাঁর সেবা করার পরই উনি নৈরঞ্জনা নদী তীরের উরুবিল্বার এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় বোধ লাভের সাধনা শুরু করলেন এবং সেই অবিস্মরণীয় বৈশাখী পূর্ণিমার রাতেই ইনি বোধি লাভ করলেন। তারপর পঁয়ত্রিশ বছরের ভগবান বুদ্ধ ঋষিপত্তনে অতীতের ঐ পঞ্চ সন্ন্যাসীর সামনে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র ব্যাখ্যা করেন।

আমরা টাঙ্গায় চড়ে অতীতের সেই ঋষিপত্তনে চলেছি ধর্মচক্র প্রবর্তনের সূত্র ধরে নির্বাণ লাভের আশায় নয় কিন্তু তবু মনটা উদাসীন হয়ে গেল। মনের মধ্যে সব চিন্তা-ভাবনা হিসেব-নিকেশ উল্টে-পাল্টে একাকার হয়ে গেল।

দীপ, বাড়ি ফিরব ?

কেন ?

অনেক দুর্বলতাই ত লুকিয়ে রাখতে পারি নি কিন্তু আরো দুর্বলতা প্রকাশ করা কি ঠিক হবে ? চলো বাড়ি ফিরে যাই।

আমি অপলক দৃষ্টিতে ওর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু মাথা নেড়ে বললাম, না, যাব না।

না বলছ কেন ? চলো ফিরে যাই।

ঐ একইভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খুব আস্তে আস্তে বললাম, সে আর সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় কেন ?

দৃষ্টিটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে বললাম, হরসুন্দরী ধর্মশালায় একসঙ্গে চোখের জল না ফেললে হয়ত ফিরে যেতাম কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়।

তুমি সত্যি আমার সঙ্গে সারনাথ যাবে ?

আমি একটু হেসে বললাম, মণিকর্ণিকা না যাওয়া পর্যন্ত তোমাকে ছাড়ছি না।

দেবী দপ করে জ্বলে উঠল, এসব আজেবাজে কথা বললে আমি এক্ষুনি নেমে যাব।

এই টাঙ্গা থেকে নেমে গেলেই কী সব শেষ হয়ে যাবে ? নাকি আমাকে ভুলতে পারবে ?

দেবী কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পরে বললো, ভুলতে পারব না ঠিকই কিন্তু এরকম ঘনিষ্ঠতা ত থাকতে পারে না।

কেন ?

বাইরে থেকে দিদি পিসী বা অন্য সবাই ভাবছেন এটা নিছক আত্মীয়তা। বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু আমরা যে অন্য দিকে মোড় ঘুরেছি তা ত কেউ জানেন না।

আজ না জানলেও কাল জানবেন।

তখন এ ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে পারবে ?

পারব বৈকি।

কোন অধিকারে ?

তোমাকে ভালবাসি বলে।

দেবী একটু হেসে বললো, শুধু ভালবাসার অধিকার নিয়ে এ-ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই ঘনিষ্ঠতার পরিণতি ভেবে দেখেছ ?

ভালবাসার অধিকারেই মানুষ মানুষের কাছে আসে। আমিও আসব।

ও একটু করুণার হাসি হেসে আমাকে বললো, দীপ, তুমি নিছকই একটা শিশু। কিছু বোঝো না।

কেন ?

আমার মত বিধবার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ হবার একটা সীমা আছে। তাছাড়া আজ বাদে কাল দিদি মারা গেলে তুমি কিভাবে আমার কাছে আসবে ?

দিদি মারা যাবার পর তুমি আপত্তি করলে আসব না।

আমি আপত্তি না করলেই তুমি আসতে পারবে ?

একশ বার।

কোন্ দাবী বা মর্যাদা নিয়ে আসবে বা আমিই তোমাকে আসতে দেব ?

আমি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারলাম না।

দেবী বললো, তাছাড়া তার পরিণতি কখনও শুভ হবে না।

কেন ?

তুমি দেবতা হতে পারো কিন্তু আমি ত সাধারণ মানুষ। আমি যদি আমার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চেপে রাখতে না পারি ?

আমি আবার চুপ করে রইলাম।

দু-এক মিনিট পর দেবী বললো, দীপ, তুমি কাল কলকাতা ফিরে যাও। আর এখানে এসো না।

তাহলে চিঠি লিখে আমাকে এভাবে টেনে আনলে কেন ? কি দরকার ছিল এ-ঘনিষ্ঠতা করার ? কেন অত রাত্রে ওভাবে আমার কাছে এসে...

দীপ ! বলেছি ত অন্যায় করেছি ভুল করেছি।

ভুল করলে অন্যায় করলে কিছু মাশুল দিতে হয়।

তোমাকে এভাবে দূরে সরিয়ে দিয়েই ত সারাজীবন ধরে তার মাশুল দেব।

তাতে আমার কি লাভ ?

লাভ নেই জানি কিন্তু একটা অন্যায়, একটা ভুল করেছি বলে কি সারা-জীবন ভুলই করব। নাকি তুমি সে ভুলের মাশুল গুনবে ?

সারনাথ এসে গেছি। টাঙ্গা থামল। ভাড়া মিটিয়ে নিঃশব্দে নেমে পড়লাম। ভিতরে ঢুকলাম কিন্তু অশোকের তৈরী স্তূপ বা মূলগন্ধকুটি বিহার দেখতে গেলাম না। সবুজ মাঠের এক কোণায় দু'জনে চুপ করে বসলাম। দেবী দুটো হাঁটুর উপর মুখ রেখে আপন মনে একটা একটা ঘাস ছিঁড়ছে আর ফেলে দিচ্ছে। আমিও ঘাসের উপর আঙুল দিয়ে হিজিবিজি কাটছি। এইভাবেই অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল বাড়ি যাই। দেবী কোন কথা না বলেই উঠল। আমার পিছন পিছন বাইরে এলো। রিকশায় উঠলাম।

সারনাথ থেকে কাশী মাইল ছয়েক রাস্তা। ঘণ্টা খানেকের বেশীই রিকশায় পাশাপাশি এলাম কিন্তু কেউই কোন কথা বললাম না। গোধূলিয়ার মোড় পার হবার পর আমি বললাম, তুমি বাড়ি চলে যেও। আমি একটু ঘুরে আসছি।

বাঙালীটোলার গলির মুখে রিকশা থামতেই দেবী নেমে বললো, আমি যাচ্ছি।

আমি কোন কথা না বলে রিকশার ভাড়া দিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে চলে গেলাম।

সূর্য অস্ত গেলেও ওপারের বালুভূমিতে এখনও গোধূলির ম্লান আলো ছড়িয়ে আছে। এবারে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে সন্ধ্যার আলো জ্বালারও দেরী নেই। চারদিকে পাঠ চলছে। কোথাও গীতা কোথাও ভাগবত, কোথাও রামায়ণ বা মহাভারত। মাধবীলতার মত এক এক দল বুড়োবুড়ী পাঠ শুনছেন। যাঁরা প্রমোদ ভ্রমণে এসেছেন তাঁরা পরিপাটি সেজেগুজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অথবা নৌকা চড়ে কাশীর শোভা দেখছেন। এছাড়া একদল ছেলেমেয়ে নিছক উদ্দেশ্যহীন হয়েই এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আমি চুপ করে একটু নিরিবিলিতে বসতেই কানে এলো—

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথজনের বন্ধু
অখিলের বিপদভঞ্জন।
এ সব সভার মাঝ ইথে নিবারিতে লাজ
তোমা বিনা নাহি অন্যজন॥

যে প্রভু পালিত সৃষ্টি সংহার করিতে ঋষ্টি
পুনঃ পুনঃ হন অবতার।
তাঁহার চরণ ছায়া স্মরিয়া সঁপিনু কায়া,
অনাথার কর প্রতিকার॥

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাতেই শুনলাম—গীতা কেবল কর্মের দিকেই দেখাইতেছেন—ভগবানের দিকে চাহিয়া কর্ম করাই দেবভাবের লক্ষণ। অহং বুদ্ধিতে কর্ম করাই অসুরের লক্ষণ। কর্ম ত্যাগ মূর্খতার লক্ষণ।

শুনতে ভাল লাগল না। অন্য দিকে তাকিয়ে আপন মনে বসে বসে কত কি ভাবছিলাম। হঠাৎ কলগুঞ্জন শুনে দেখি পাঠ শেষ। বুড়োবুড়ীরা বাতের ব্যথা, মোচার তরকারী ব: সন্তানসম্ভাব্য ছোট পুত্রবধূর গল্প শুরু করেছেন।

এগারটা ছেলেমেয়ে ত এই পেট থেকেই বেরিয়েছে কিন্তু সাত জন্মে এসব ন্যাকামী কোনদিন দেখি নি, করিও নি। কানে আসছে তিন-চার হাজারেও নাকি কুলোবে না।

তুমি ত শুধু শুনছ কিন্তু আমাকে ত নিজের চোখে দেখতে হয়েছে। ধিড়িঙ্গী ধিড়িঙ্গী মেমগুলো কিভাবে কোমর দুলিয়ে বুক নাচিয়ে ধাড়ী ধাড়ী ডাক্তারগুলোর সামনে ঘুরে বেড়ায় আর কথায় কথায় হি-হি হা-হা করে তা তুমি ভাবতে পারবে না।

আমার আর ভেবে কাজ নেই বাপু। শুনেই সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। না জানি দেখলে কি হতো।

আমার বড় বৌমা ত তিরিশ বছর বয়সে প্রথম সন্তান প্রসব করলেন কিন্তু তাঁর ন্যাকামী আর ঢল-ঢল ভাব দেখলে মনে হতো ঝাঁটা পেটা করি কিন্তু···

আর শুনতে পারলাম না। উঠে অন্য জায়গায় বসলাম। তাতেও কি শান্তি আছে? সেখানেও একদল পুণ্যলোভাতুর বৃদ্ধ পরনিন্দা পরচর্চায় মশগুল। সহ্য করতে না পেরে উঠে পড়লাম কিন্তু দু পা এগুতে না এগুতেই পিসীর সঙ্গে দেখা। আমার মুখের সামনে মুখ এনে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে তুই এখানে কি করছিস?

কি আবার করব? এমনি একটু ঘুরছি।

কিন্তু এই ত শুনলাম তুই আর দেবী সারনাথ গিয়েছিস ফিরতে দেরী হবে।

একটু আগেই ফিরে এসেছি।

দেবী কোথায়?

বাড়ি গেছে।

পিসী দু'হাত দিয়ে মুখখানা ধরে বললেন, তোর মুখখানা এমন কেন দেখাচ্ছে রে?

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন দেখাচ্ছে?

তোকে কেউ কিছু বলেছে?

না না, কেউ কিছু বলে নি।

তাহলে এমন গম্ভীর শুকনো শুকনো লাগছে কেন ?

এবার আমি পিসীকে একটু জড়িয়ে ধরে বললাম, আমার কিছু হয় নি। আর দেরী না করে তুমি ডাক্তারকে চোখ দেখিয়ে চশমা নাও।

বাজে বকিস না।

ভাল কথা পিসী, আমি কাল সকালে চলে যাচ্ছি।

কালই ?

হ্যাঁ পিসী। খুব জরুরী কাজ আছে।

কিন্তু তুই যে বলেছিলি যাবার আগে দু-একদিন আমার কাছে থাকবি।

আমি ত আবার আসছি।

কবে ?

দু-এক মাসের মধ্যেই।

যদি হঠাৎ মারা যাই।

ছোট্ট মেয়ের মত পিসীকে গলা জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, অন্যের কথা বলতে পারি না কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অমন করে ফাঁকি দেবে না।

কিন্তু···

আমি তাড়াতাড়ি পিসীর মুখের উপর একটা হাত আলতো করে রেখে বললাম, কোন কিন্তু নয় পিসী। আমার কোলে মাথা রেখেই তোমাকে মরতে হবে।

সে সৌভাগ্য কি আমার হবে ?

হবেই। তুমি দেখে নিও।

পিসী আমার একটা হাত ধরে বললেন, আমার সঙ্গে চল।

না পিসী, আমি একটু এখানে থাকি।

এই অন্ধকারে ?

যারা ছোটবেলায় মাকে হারায় তারা ত সারা জীবনই অন্ধকারে পড়ে থাকে।

পিসী চুপ করে রইলেন।

একটা কথা বলবে পিসী ?

বল।

ছোটবেলায় যারা মাকে হারায় তারা বোধহয় কোনদিনই সুখী হয় না, তাই না ?

পিসী বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, বোধহয়।

পিসী আর দাঁড়ালেন না। আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। ঐ আবছা আলোতেই দেখতে পেলাম পিসীর চোখ দুটো ছলছল করছে। একটু দূরে গিয়েই আঁচল দিয়ে চোখ মুছবেন।

পিসী চলে যাবার পর কতক্ষণ ঐখানে একলা একলা বসেছিলাম খেয়াল নেই। বোধহয় ঘণ্টা খানেক। তার বেশীও হতে পারে। হাতে নতুন ঘড়ি, কিন্তু অভ্যাস ত নেই। তাই কখন এসেছি বা কতক্ষণ বসে আছি, তার হিসেব রাখি নি। হঠাৎ এক মূর্তি আমার পাশে এসে দাঁড়াতেই চমকে উঠে দেখি দেবী।

তুমি?

দেবী আমার পাশে বসতে বসতে বললো, হ্যাঁ আমি।

হঠাৎ এখানে এলে?

পিসীর ওখানে না দেখতে পেয়ে এখানেই চলে এলাম।

এত রাত্তিরে তোমার এখানে আসা ঠিক হয় নি।

এত রাত্তিরে মানে? মোটে ত সাতটা বাজে।

তাই নাকি?

ঘড়িটা কি রাগ করে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়েছ?

আমি ঠিক অতটা পাষণ্ড এখনও হই নি। হাতে যে ঘড়ি আছে তা আমার খেয়ালই ছিল না।

যাগ গে। এখানে এভাবে একলা একলা বসে আছো কেন?

এমনি। ভাল লাগছে।

কেন মিথ্যে কথা বলছ? এমনি বসে নেই তা ত জানি, কিন্তু ভাল লাগছে বলছ কেন?

আমি ওর কথার কোন জবাব দিলাম না।

আমি কথা না বললেও দেবী চুপ করে রইল না। জিজ্ঞাসা করল, তুমি কালই চলে যাবে?

হ্যাঁ।

দিদি যদি বারণ করেন?

বলব জরুরী কাজ আছে।

দিদি যদি বিশ্বাস না করেন?

আমার কিছু করার নেই।

কাল কখন যাবে?

সকালেই।

সকালে কোন ট্রেনে?

সকালে উঠেই মোগলসরাই চলে যাব। সেখান থেকে একটা না একটা ট্রেন পেয়ে যাব।

আর বুঝি এখানে থাকতে ভাল লাগছে না ?

না।

কলকাতায় গেলে ভাল লাগবে ?

জানি না।

তবে এভাবে হুড়মুড় করে যাবার কি দরকার ?

কলকাতা ছাড়া আর কোন চুলোয় যাব ?

এখানে থাকতে পার না।

এখানে থাকব কেন ?

কলকাতার মত এখানেও যদি ছাত্র-ছাত্রী পাও তাহলে থাকতে পার না ?

তাতে তোমার কি লাভ ?

অনেক ব্যবসা লোকসান দিয়েও চালাতে হয়।

এসব ভাবাবেগের কথা যুক্তির কথা না।

মানুষের জীবনে ভাবাবেগের কি কোন দাম নেই ?

আছে বৈকি ?

তবে ?

শুধু ভাবাবেগে জীবন কাটান সম্ভব নয়।

যাই হোক তুমি এখানেই থেকে যাও।

কেন ?

আর কিছু না হোক অন্তত তোমাকে দেখতে পাব।

এসব দুর্বলতা ত্যাগ করো।

বিধবা হয়েছি বলে কি চোখের দুর্বলতাও ত্যাগ করতে হবে ? বিধবা হয়েছি বলে কি অন্ধ হয়ে থাকতে বল ?

আমি একটু থতমত খেয়ে বললাম, দেবী রাগ করো না।

রাগ করব কোন অধিকারে ?

যে অধিকারে এই অন্ধকারে আমাকে খুঁজতে এসেছ।

দেবী খুব জোরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়েই উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তুমি কি আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরবে ?

আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল।

দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত কেউই কোন কথা বললাম না। বাড়িতে ঢুকতে যাবার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে দেবী বললো, দিদিকে বলো না রাগ করে ঘাটে বসেছিলে। বলো বেড়িয়ে ফেরার পথে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

আমি কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে ওর পিছন পিছন উপরে উঠলাম। বারান্দা পার হয়ে আমার ঘরে ঢুকতে যাবার মুখেই দিদির সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে এতক্ষণ একলা একলা কি করছিলি ?

কাল চলে যাব বলে একটু বেড়িয়ে এলাম।

দিদি বেশ রাগ করেই বললেন, তিন-চার দিনের জন্য এত পয়সা নষ্ট করে এলি কেন ?

রাগ করছ কেন ?

এসব আজেবাজে কথা বললে কার না রাগ হবে ? দিদি রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েই বললেন, কাল তোর যাওয়া হবে না।

কিন্তু আমার খুব জরুরী কাজ…

দিদি রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, যত জরুরী কাজই থাক, কাল তোর যাওয়া হবে না।

যদি টিউশনিগুলো হারাই ?

হারালে আমাকে পড়াবি, আমি তোকে মাইনে দেব।

কোর্ট-কাছারির মত যুক্তিতর্ক দিয়ে সংসারে চলা যায় না। সংসারের নিয়ম-কানুন আলাদা। বুঝলাম দিদির সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। চুপ করে নিজের ঘরে এসে ইজিচেয়ারে বসলাম। দু-এক মিনিটের মধ্যে দেবী এসে বললো, দিদি খেতে দিচ্ছেন, হাত-মুখ ধুয়ে এস।

যাচ্ছি।

দেবী চলে যেতেই আমি বাথরুমে গেলাম। সেখান থেকে রান্নাঘর।

দিদি আমাদের দু'জনের খাবার দিয়েই বললেন, কাল অমাবস্যা বলে আজ বাতের ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে। আমি শুতে যাচ্ছি। তোরা খেয়ে নে।

আমি বললাম. এখানে কি সবাই বাতের রুগী ? সবার কাছেই শুনি বাতের ব্যথায় কষ্ট পান।

দিদি বললেন, বাতের কি দোষ ? একে স্যাঁতসেঁতে তার উপর সূর্যের মুখ দেখা দায়।

দিদি আর বসলেন না। নিজের ঘরে শুতে গেলেন। খেয়ে-দেয়ে আমিও নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গেলাম। ইজিচেয়াবে বসতেই হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে নজর পড়ল। দেখি মোটে নটা বাজে। কলকাতায় এমন সময় অনেক দিন মেসেও ফিরি না। খেতে খেতে দশটা বাজবেই। তারপর অন্যান্য বোর্ডারদের সঙ্গে একটু-আধটু গল্পগুজব অথবা কিছু পড়াশুনা। বারোটার আগে ঘরের আলো অফ হয় না। এখানে ?

কিছুক্ষণ ইজিচেয়ারে বসে থাকার পর মনে পড়ল দেবীর দেওয়া সিগারেট-দেশলাই জামার পকেটে আছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে শুরু করলাম। সিগারেট শেষ হয়ে গেলেও আমি আগের মতই ইজি-চেয়ারে বসে রইলাম। কতক্ষণ ঐভাবে বসেছিলাম আর কখনই বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দু'চোখ বুজেছিলাম তা জানি না। হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার মাথায় হাত দিচ্ছে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি দেবী। আমি কিছু বলার আগেই ও বললো, এভাবে বসে বসে ঘুমুচ্ছ কেন ? বিছানায় শুয়ে পড়ো।

এত সকাল সকাল ঘুমুবার অভ্যাস নেই। হঠাৎ একটু তন্দ্রার ঘোরে চোখ বন্ধ করেছিলাম।

মনে হল দেবী একটু হাসল। বললো, আমি কতক্ষণ তোমার মাথায় হাত দিচ্ছি জান ?

কতক্ষণ ?

প্রায় আধঘণ্টা হবে।

আমি চমকে উঠি, সেকি ?

পৌনে ন'টায় খাওয়া-দাওয়া মিটে গেছে। আর এখন বাজে প্রা এগারোটা।

এগারোটা ?

হ্যাঁ।

তুমি ঘুমোও নি ?

ঘুম আসছে না।

ঘুম না আসার কি হল ?

পুরুষরা মন থেকে যত তাড়াতাড়ি সবকিছু মুছে ফেলতে পারে মেয়ের তা পারে না।

দেবী কথা বলতে বলতেই আমার মাথায় হাত দিচ্ছে। বললাম, এতক্ষণ ধরে মাথায় হাত দিচ্ছ। নিশ্চয়ই ক্লান্তবোধ করছ। এবার শুতে যাও।

না আমি ক্লান্তিবোধ করছি না।

তাই কি কখনও সম্ভব ?

এই ত মুশকিল। মেয়েদের কিসে সুখ, কিসে দুঃখ তাও তোমরা বুঝতে পার না।

এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত দিলে সবাই ক্লান্ত হবে।

যদি বলি ক্লান্তবোধ করা ত দূরের কথা, তোমার মাথায় হাত দিয়ে আমার ভাল লাগছে ?

আমি আর পাল্টা প্রশ্ন করলাম না। দেবী বলল, যাকে ভালবাসা যায় তার জন্য কষ্ট করেও আনন্দ হয়, কিন্তু আমার উপর এতই রেগে গিয়েছ যে এসব কথা বোঝার মত মনের অবস্থা তোমার···

আমি তোমার উপর রাগ করি নি।

দেবী আমার হাত ধরে একটু টান দিয়ে বলল, বিছানায় শুয়ে পড়।

আমি প্রতিবাদ না করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ও আমার বিছানার একপাশে বসে আমার কপালে মাথায় হাত দিতে দিতে বলল, দীপ আমার উপর রাগ কর না। তোমার মত আমিও এই পৃথিবীতে একলা। সুখ বা শান্তি কাকে বলে তা জানতে পারলাম না।

আমি কাত হয়ে শুয়ে আছি। জানলা দিয়ে এক টুকরো চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানার একপাশে। কোন কথা বলছি না।

দেবী একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, বিয়ে করার তাৎপর্য না বুঝলেও বেনারসী শাড়ী আর গহনা পেয়ে খুব আনন্দ হয়েছিল, কিন্তু সে আনন্দ কপালে সহ্য হল না।

আমার একটা হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে জিজ্ঞেস করল, ঘুমিয়ে পড়লে ?

না।

দেবী আবার শুরু করল, ক' বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল জান ?

না।

পনের বছরে। গায়-হলুদের আগে কোনদিন শাড়ী পরি নি। যাকগে ওসব। বিয়ের কতদিন পর বিধবা হয়েছি জান ?

না।

পরের বছরই। দেবী একটু হেসে বলল, স্বামী মারা যাবার পরও আমার কোন দুঃখ হয় নি, এক ফোটা চোখের জলও ফেলি নি।

কেন ?

ফুলশয্যার রাত্রে ঐ মোটা ভুঁড়িওয়ালা লোকটা আমাকে জড়িয়ে ধরতেই আমি ভয়ে এমন চিৎকার করেছিলাম যে সারা বাড়ির লোক ছুটে এসেছিল। তারপর যে ক'দিন ওখানে ছিলাম সে ক'দিনই শাশুড়ীর কাছে শুতাম।

কাশীতে কি সবাই দুঃখী ?

বলতে পারি না, তবে বোধহয় সুখী স্বাভাবিক লোককে বিশ্বনাথ সহ্য করতে পারেন না। আমার মত সাধারণ লোকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু যেসব রাজা-মহারাজা বা বড় বড় জমিদাররা এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন তাঁরাও পথের ভিখিরী হয়ে গিয়েছেন।

ওদের কথা বাদ দাও। কোন রাজার রাজত্বই চিরকাল থাকে না। থাকতে পারে না।

শুধু রাজা-মহারাজা কেন, এক কালের বড় বড় পণ্ডিতদের বাড়িতে গিয়ে দেখে এসো কি অবস্থা। বংশধররা যেমন মূর্খ তেমন গরীব। ইউ পি গভর্নমেণ্ট পেন্সন বন্ধ করে দিলে রাতারাতি যে কত বিধবাকে বিশ্বনাথের গলিতে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে হবে, তার ঠিকঠিকানা নেই।

জানি, কিন্তু বুঝতে পারি না সোনার অন্নপূর্ণা এখানে বসে বসে কি করছেন ?

চাঁদের আলোও আরো একটু উদার হয়ে আমার বিছানায় এসে পড়েছে। দেবীর অস্পষ্ট মুখ একটু স্পষ্ট হয়েছে এই আলোয়। কবার ওর মুখের দিকে তাকাতেই ধরা পড়ে গেলাম।

কি দেখছ ?

চাঁদের আলোয় তোমার সৌন্দর্য দেখছিলাম।

তাহলে তুমিও কি আমার মত প্রেমে পড়লে ?

তুমি প্রেমে পড়েছ নাকি ?

ভয় নেই তোমাকে বিপদে ফেলব না।

কেন, বিপদে ফেলতে ইচ্ছে করছে নাকি ?

পনের বছরের কিশোরী ভালবাসা কাকে বলে না জানলেও এখন ত সব কিছু জানি। দেবী একটু হেসে বলল, তোমাকে বিপদে ফেলার ইচ্ছা যে মনে আসে নি, তা বলব না।

কি সর্বনাশ !

দেবী হঠাৎ আমার বুকের উপর হাত রেখে বলল, সত্যি একবার মনে হয়েছিল এমনভাবে শুকিয়ে শুকিয়ে মরব না। যে যাই বলুক, আমি আমার পাওনা মিটিয়ে নেবো।

এখন কি ঠিক করেছ শুকিয়ে শুকিয়েই মরবে ?

ঠিক বলতে পারি না, তবে তোমাকে নিশ্চয়ই বিপদে ফেলব না।

আজও কি সারারাত এখানেই কাটাবে ?

যদি অনুমতি দাও।

অনুমতি না দিলে থাকবে না ?

না।

এ ঘরে আসার আগে কি আমার অনুমতি নিয়েছ ?

না।

কেন ?

অনেকক্ষণ তোমার ঘরের সামনে ঘোরাঘুরি করছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না এসে পারলাম না।

আমিও আর পারলাম না। বালিশ থেকে মাথাটা সরিয়ে ওর কোলের উপর রেখে বললাম, দেবী, কেন এমন পাগলামি করছ ?

কোন পাগলই পাগলামির কারণ জানে না।

তা ঠিক, কিন্তু···

আমি জানি এর মধ্যে অনেক কিন্তু আছে।

তবে ?

মন যুক্তি বোঝে কিন্তু হৃদয় ত বোঝে না। আমি ত হৃদয়ের তাগিদেই তোমার কাছে এসেছি। তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারো।

ফিরিয়ে দিলেই তুমি চলে যাবে ?

হ্যাঁ !

কেন ?

জোর করে ভালবাসা পাবার মত দৈন্য আমি সহ্য করতে পারব না।

দেবী !

বল।

কোনদিন তোমাকে সে দৈন্যের জ্বালা সহ্য করতে হবে না।

দেবী আমার কপালের উপর মুখখানা রেখে বলল, তাহলে সত্যি আমি ভুল করি নি।

কখন আমি ওর কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়েছি আর কখন ও আমার মাথা বালিশের উপর রেখে, গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে নিজের ঘরে শুতে গেছে, আমি কিছুই জানতে পারি নি। অন্য দিন জানলা দিয়ে রোদ্দুর এলেই ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু আজ প্রথম যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘর অন্ধকার দেখে আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম পাতলা হয়ে এলে কাদের যেন কথাবার্তা কানে এলো। প্রথমে ঠিক বুঝতে না পারলেও পরে সবই শুনতে পেলাম।

হ্যাঁরে, সত্যি বলছিস প্রদীপ চলে যায় নি?

বললাম ত যেতে চেয়েছিল কিন্তু দিদি কিছুতেই মত দিলেন না।

কিন্তু তাই বলে কেউ এত বেলা অবধি ঘুমুতে পারে? ও নিশ্চয়ই চলে গেছে।

তুমি বিশ্বাস কর পিসী, তোমার সোনা বউয়ের ছেলে এখনও ঘুমুচ্ছে।

এত বেলা অবধি ঘুমোবে কেন? ওর কি শরীর খারাপ?

হয়ত কাল বই-টই পড়ে অনেক রাত্রে শুয়েছেন।

ও ঘরে যা রোদ্দুর আসে তাতে কেউ এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুতে পারে না।

বোধহয় ভোরবেলার দিকে জানালা বন্ধ করে দিয়েছে।

আমি আর দেরী না করে বিছানা ছেড়ে ঘরের বাইরে আসতেই পিসী অবাক হয়ে বললেন, তুই তাহলে আছিস?

কি করব বল? দিদি কিছুতেই...

আসতে না আসতেই কেউ যেতে দেয়?

তুমি সাত-সকালে কি আমার খবর নিতে এসেছ?

পিসী একবার দেবীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন এখন ক'টা বাজে জানিস?

ক'টা?

দশটা বেজে গেছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, দশটা বেজে গেছে?

দেবী কোন মতে হাসি চেপে বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ।

এত বেলা হয়ে গেছে অথচ আমাকে একটু ডাকতে পারলে না?

আপনি ঘুমুচ্ছেন আমি ডাকব কেন?

পিসী জিজ্ঞাসা করলেন, তোর শরীর ভাল আছে ত?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

পিসী বললেন, আমি যাচ্ছি। তুই একবার আসিস।
আচ্ছা।
পিসী চলে যেতেই দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কোথায় ?
আজ অমাবস্যা বলে কালীবাড়ি গিয়েছেন।
চা খাওয়াবে না ?
তুমি চোখে-মুখে জল দিয়ে এসো। আমি চা নিয়ে আসছি।
আমি বাথরুম ঘুরে ঘরে আসার পর পরই দেবী দু'কাপ চা নিয়ে এলো। ওর হাত থেকে এক কাপ চা নিতেই বললাম, তুমি আমাকে বিপদে না ফেলে ছাড়বে না।
ও চা নিয়ে মোড়ায় বসতে বসতে বললো, কেন ?
তুমি যা শুরু করেছ তাতে ধরা না পড়ে উপায় নেই।
ধরা ত পড়বেই।
তার মানে ?
শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায় ? একদিন না একদিন ধরা ত পড়তেই হবে।
দিদি বা পিসী জানলে কি কেলেঙ্কারী হবে ভাবতে পারো ?
যখন জানবে তখন ভেবে দেখব।
দু'জনে চা খাচ্ছি। চা খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে দেবী বললো, কাল রাত্তিরে ত তুমি কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়লে কিন্তু যখনই তোমাকে ঠিক করে শুইয়ে দিতে গিয়েছি তখনই...
দেবী কথাটা শেষ না করে শুধু হাসল।
আমিও হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, তখনই কি হয়েছে ?
তুমি এমনভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরেছ যে প্রায় সারা রাতই..
সত্যি ?
দেবী সারা মুখে একটু মিষ্টি হাসির আবীর ছড়িয়ে বললো, ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে তুমি শুধু ভালবাসা চাও না, আদরের কাঙাল।
দরজার ওপাশ থেকে হঠাৎ বামুন দিদির গলা শোনা গেল, দেবী, দাদাকে জলখাবার খেতে দেবে না ?
দেবী বললো, তুমি ঠিক কর। আমি আসছি।
জলখাবার খেতে শুরু করতে না করতেই দিদি এসেই আমার হাতে একটা পোস্টকার্ড দিয়ে বললেন, তোর এই চিঠিটা পিসীর বাড়িতে এসেছে।
আমার চিঠি ? আমি অবাক হয়েই পোস্টকার্ডটা হাতে নিলাম। ঝড়ের বেগে চিঠিটা পড়েই আমি চমকে উঠলাম। মুখ ফসকে বলেই ফেললাম, কি সর্বনাশ !
দিদি আর দেবী প্রায় একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে ?
আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, আমাদের মেসের মালিক কার্তিকবাবু লিখেছেন আমার এক ছাত্রীর বাবা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গিয়েছেন। জরুরী কারণে ওরা আমাকে পত্রপাঠ কলকাতা ফিরে যেতে···

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই দেবী জিজ্ঞাসা করল, কোন ছাত্রীর বাব. মারা গিয়েছেন ?

কল্পনার বাবা।

শিবনাথবাবু ?

হ্যাঁ।

দিদি জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রলোকের কত বয়স হয়েছিল ?

বছর পঞ্চাশেক হবে।

মাত্র ?

হ্যাঁ। তাছাড়া স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল।

উনি কি চাকরি করতেন ?

না, উকিল ছিলেন।

কটি বাচ্চা ?

দুটি মেয়ে। একটি বি. এ. পরীক্ষা দেবে আর ছোটটি ত ক্লাশ সিক্সে পড়ে।

দিদি আপন মনে বললেন, কখন যে কার কি সর্বনাশ হবে তা কেউ বলতে পারে না। এবার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি আজই রওনা হবি ?

হ্যাঁ দিদি, আমি আজই রওনা হবো। ওরা সত্যি আমাকে খুব স্নেহ করেন। সুতরাং এ সময়ে না যাওয়া অত্যন্ত অন্যায় হবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই চলে যা। রাত্রে মোগলসরাই থেকে অনেক গাড়ি পেয়ে যাবি।

দিদি ভিতরের দিকে চলে যেতেই দেবী জিজ্ঞাসা করল, মেসের কার্তিক-বাবু পিসীর ঠিকানা জানলেন কেমন করে ?

মেসের যে কোন বোর্ডার বাইরে গেলেই কার্তিকবাবু ঠিকানা জেনে নেন।

দু এক মিনিট চুপচাপ থাকার পর দেবী জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, তোমাকে ওরা ডাকছেন কেন ?

ঠিক বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই কোন জরুরী কারণ আছে।

তা ত বটেই কিন্তু ওদের ত অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন ?

আত্মীয়-স্বজন থাকলেও তাদের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি একবার পিসীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

চল, আমিও যাই।

দিদিকে বলে এসো।

আমি চট করে একটা বিনুনি করে নেব। তুমি একটু দাঁড়াও।

বেশ ত দেখাচ্ছে। আর বিনুনি করতে হবে না।

হঠাৎ পিছন ফিরে থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ও বললো, তুমি যে চোখে আমাকে দেখছ, সে চোখে ত অন্যরা দেখবে না।

আমি বসে পড়লাম। দেবী ভিতরে চলে গেল। বেশীক্ষণ নয়, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ও তৈরী হয়ে ফিরে আসতেই নিজের সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ঠিক আছে ?

আমি একবার ওর দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা নামিয়ে নিয়ে বললাম, কেন যে আমাকে এভাবে জ্বালিয়ে মারতে চাও, তা বুঝতে পারছি না।

তার মানে ?

আর মানে জানতে হবে না। চলো।

ও কথা কেন বললে, তা তোমাকে বলতেই হবে।

আর রূপের প্রশংসা শুনতে হবে না। চলো, তাড়াতাড়ি ঘুরে আসি।

শুধু তুমিই আমার রূপ দেখতে পাও। আর ত কেউ···

আবার কে তোমার রূপের প্রশংসা করবে ? এ অধিকার ত আর কেউ পেতে পারে না।

আমিও দিতে চাই না।

আমি হেসে ওর একটা হাত ধরে একটু টান দিয়ে বললাম, চল, আর দেরী করো না।

দেবী দরজার বাইরে পা দিয়েই একটু জোরে বললো, দিদি, আমরা বেরুচ্ছি।

দিদি নিজের ঘর থেকেই বললেন, খুব বেশী দেরী করিস না।

দেবী বললো, আচ্ছা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেবী বললো, এবার টিউশনি করা ছেড়ে দিয়ে একটা চাকরি নাও।

ইচ্ছে করলেই কি চাকরি পাওয়া যায় ? টিউশনি যোগাড় করতেই কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে, তা জান না।

ইচ্ছে করলেই চাকরি পাওয়া যায় না, তা জানি কিন্তু এবার থেকে একটু জোর দিয়ে চেষ্টা কর।

কল্পনার বাবাই কাকাবাবুকে বলেছিলেন হয়ত কয়েক মাসের মধ্যে একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে পারবেন, কিন্তু এমনই কপাল যে···

উনি মারা গিয়েছেন বলে কি আর তোমার চাকরি হবে না ?

না, তা নয়।

রাস্তায় নেমে চলেছি। এক মিনিট পর দেবী বললো, তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি হলেই চলে এসো।

ওদের ছুটি হলেই কি আমি চলে আসতে পারি ?

কেন ?

আমি ত স্কুলে মাস্টারী করি না, বাড়িতে প্রাইভেট পড়াই।

প্রাইভেট পড়াও বলে কি তাদের কেনা গোলাম হয়ে গিয়েছ ?

আমি হাসি। বলি, গোলাম না হলেও আসা যায় না।

তুমি না এলে আমি টেলিগ্রাম করব, কাম সার্প।

আমি হাসতে হাসতে থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, না, না ওসব পাগলামি করো না। শেষকালে সত্যি সত্যি পালে বাঘ পড়লে আমি আসতে পারব না।

তুমি না এলেই আমি টেলিগ্রাম করব।

কিন্তু…

কোন কিন্তু নয়। টেলিগ্রাম পাবার আগে চলে এলেই কোন ঝামেলা থাকবে না।

তুমি ত আচ্ছা মেয়ে!

খুব সাধারণ মেয়ে যে আমি না, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ?

আমি হাসতে হাসতে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, একটু একটু।

আর একটা কথা বলে দিই।…

কোন কথা?

নিয়মিত চিঠি না পেলে আমি একদিন হঠাৎ কার্তিকবাবুর মেসে গিয়ে হাজির হবো।

এসো, কিন্তু তাহলে শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন কে আবার নতুন করে লিখবে?

ওসব ঠাট্টা বেরিয়ে যাবে।

না, না, দেবী, পাগলামি করো না। সময় সুযোগ পেলেই আমি চলে আসব।

কথা দিচ্ছ?

হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।

পিসীর বাড়ির দরজা বন্ধ দেখে অবাক হলাম। খুব জোরে কড়া নাড়তেই পিসী নেমে এসে দরজা খুলে দিলেন। কোন প্রশ্ন করার আগেই বললেন, আজ এরা সবাই মধু চক্রবর্তীর দিদিমার নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তাহলে ত আজ তোমার বাড়িতে ডাকাতি করা যায়।

পিসী হাসতে হাসতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, তোর মত একটা ডাকাত সব লুঠ করে নিলে ত শান্তিতে মরতে পারতাম।

দেবী দরজায় খিল দিয়ে বললো, পিসী, তুমি আর দিদি এই ছেলেটাকে আর তুলো না। অনেক হয়েছে।

উপরে উঠতে উঠতে পিসী বললেন, কেন তোর কি হিংসে হচ্ছে?

না হওয়াটাই ত আশ্চর্যের ব্যাপার।

পিসী এবার আমার দিকে ফিরে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর কাছে কার চিঠি এলো?

আমার এক ছাত্রীর বাবা মারা গিয়েছেন বলে আমি আজই যাচ্ছি।

আজই?

হ্যাঁ, আজই। তাই ত তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

হা ভগবান। লোকটা মরার আর সময় পেল না?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা পিসী, ভদ্রলোকের মৃত্যুটা বেশী দুঃখের নাকি আমার চলে যাওয়াটা।

পিসী নির্বিবাদে বললেন, আমার কাছে তোর চলে যাওয়াটাই বেশী দুঃখের।

পিসীর ওখানে গল্পগুজব আর টুকটাক খাওয়া-দাওয়া করতে বেশ বেলা হয়ে গেল। তারপর দিনটা যে কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গেল তা নিজেই টের পেলাম না। রওনা হবার ঠিক আগে পিসী এবাড়ি এলেন। আমি দিদি আর পিসীকে প্রণাম করে বেরুতেই দেবী বললো, দিদি আমি ওকে রিকশায় চড়িয়ে দিয়ে আসছি। গলি দিয়ে যেতে যেতে কেউ কোন কথা বললাম না। তারপর মোড়ের মাথায় এসে রিকশায় উঠতেই দেবী আমাকে প্রণাম করে আমার হাতে একটা খাম দিয়ে বললো, পরে খুলে দেখো।

ক দিন ধরে দেবীর সঙ্গে এত কথা বলেছি কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা কথাও বলতে পারলাম না। নিঃশব্দে ওর হাত থেকে খামটা নিয়ে স্থাণুর মত রিকশায় বসে রইলাম।

বিশ্বনাথের গলি, গোধুলিয়ার মোড় বিশ্রাম্ভু সরবতের দোকান জলযোগ পার হতেই হরসুন্দরী ধর্মশালা। রিকশা খানিকটা এগিয়ে গেলেও থামালাম, নামলাম। হরসুন্দরী ধর্মশালার সামনে একটু দাঁড়িয়ে মনে মনে বললাম, মা যাচ্ছি। আবার আসব।

ক'মিনিটের মধ্যেই বেনিয়াবাগ পৌঁছে মোগলসরাইয়ের বাসে উঠে বসলাম। বাস ছাড়বে একটু দেরী আছে। দেবীর দেওয়া খামখানা হাতেই ছিল। একটু নাড়াচাড়া করেই খুলে ফেললাম। ছোট একটা চিঠি—দীপ পিসীর কাছে শুনেছি আগামী ২৭শে চৈত্র তোমার জন্মদিন। সেদিন নিশ্চয়ই তুমি আমার কাছে আসতে পারবে না। সঙ্গে সামান্য ক'টা টাকা দিলাম। এই টাকা দিয়ে ঐদিন নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি কিনে পরলে আমি সত্যি খুশী হবো—দেবী।

বুঝলাম সঙ্গের কাগজের মোড়কে টাকা আছে। খুলে দেখার প্রয়োজন মনে করলাম না ঃ পকেটে রেখে দিয়ে ওর চিঠির উপর দিয়ে বারবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

আশ্চর্য! এই পৃথিবীর জনারণ্যে কে যে কার জন্য সৃষ্টি হয়েছে কেউ তা জানে না। জানতে পারে না। কোথায় ছিলেন পিসী দিদি বা দেবী আর কোথায় ছিলাম আমি। হঠাৎ ধূমকেতুর মত ছিটকে এসে পড়লাম

এদের মাঝে। আজ কলকাতায় ফিরে যাবার পথে মনে হচ্ছে শৈশবে মাতৃহারা হয়েও বোধহয় এদের স্নেহ ভালবাসার জন্যই আমি হারিয়ে যাই নি। হারিয়ে যাব না।

মন্ত্রমুগ্ধের মত মোগলসরাই এলাম হাওড়ার টিকিট কিনলাম ফোর ডাউন বোম্বে মেলে চাপলাম। উপরের বাঙ্কে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমুতে পারলাম না। ঐ তিনটি নারীকে নিয়ে কত কথা মনে পড়ল।

আচ্ছা দিদি এভাবে দু'জনে থাকতে তোমাদের ভাল লাগে?

কি করব বল ভাই? আমার না হয় বয়স হয়েছে কিন্তু এই মেয়েটা ত বুড়ী হয় নি। বুঝি ওর কষ্ট হয় কিন্তু কিছু করার ত উপায় নেই।

আমিও ত একলা মানুষ কিন্তু বাইরের পাঁচটা কাজে দিনগুলো ঠিকই কেটে যায়।

সংসার না করলেও পুরুষদের দিন কেটে যায় কিন্তু সংসার না থাকলে মেয়েদের দিন কাটান সত্যি মুশকিলের। দিদি একটু থেমে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, যেভাবেই হোক এখন তবু দিন কেটে যাচ্ছে কিন্তু আমি যখন থাকব না তখন যে মেয়েটার কি হবে তা ভাবতে গেলে পাগল হয়ে যাই।

মনে পড়ল দেবীর কথা।—মনে হল আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমি আর দিদি খুবই চিন্তিত।

সে ত খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু এসব চিন্তা করে কি লাভ?

লাভ-লোকসান ভেবে কি মানুষ ভাবনা-চিন্তা করে?

তা ঠিক তবুও যে ব্যাপারে চিন্তা করে কারুর কিছু করণীয় নেই সে ব্যাপারে মাথা না ঘামানই ভাল।

তুমি কি রাগ করে একথা বলছ?

রাগ করে বলব কেন? বাস্তব সত্যি কথা বলছি।

আমাদের কারুরই কিছু করণীয় নেই?

দিদির মেয়াদ ত ফুরিয়ে এসেছে। হার্টের রুগী। কখন যে দিদি লুকিয়ে পড়বেন তার ঠিক নেই। আর তুমি? তুমি আমাকে নিয়ে হরসুন্দরী ধর্ম-শালায় গিয়ে চোখের জল ফেলতে পারবে কিন্তু তার বেশী কিছু করার ক্ষমতা কি তোমার আছে?

আমি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারি না। মুখ নীচু করে থাকি।

দেবী একবার প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, আমার মত অভাগীকে সমবেদনা জানান সহজ লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাসাও কঠিন না কিন্তু তার বেশী কিছু করতে গেলেই অধিকাংশ পুরুষ পিছিয়ে আসবে।

ওর কথা শুনে লজ্জায় দুঃখে অপমানে আমি ইজিচেয়ার থেকে উঠে জানলার সামনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে দেবী আমার

কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বললো, দীপ তোমাকে অত সাধারণ মনে করি না বলেই ত স্বেচ্ছায় তোমার কাছে মাথা নীচু করলাম।

আমি ঘুরে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি ?

সত্যি।

আরো কত কথা মনে পড়ছিল ট্রেনে শুয়ে শুয়ে। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা নিজেই বুঝতে পারি নি। লোকজনের চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভাঙলে দেখি সবাই বাক্স-পেটরা বিছানাপত্র ঠিকঠাক করতে বসেছে। বুঝলাম হাওড়া পৌঁছতে বিশেষ দেরী নেই।

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে চাদরটা স্যুটকেসে ভরতে ভরতেই ট্রেন হাওড়া স্টেশনে ঢুকল।

কলকাতা।

কাশী থেকে কলকাতা এলেই চমকে উঠতে হয়। কলকাতা যেন কাশীর উলটো পুরাণ। কাশীতে মৃত্যুর জয়গান এখানে বেঁচে থাকার সংগ্রাম উন্মাদনা। ওখানে ত্যাগে মাহাত্ম্য এখানে সম্পদে সম্ভোগ।

ক'দিন আগেই কলকাতা থেকে গিয়েছি কিন্তু মাত্র এই ক'দিনের ব্যবধানেই কেমন যেন পালটে গেছি। এই চিৎকার এই দৌড়দৌড়ি এই গাড়িঘোড়ার ভিড় সমস্ত মানুষের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখেই মন খারাপ হয়ে গেল। নাকি একটু ভয় পেলাম ?

মেসে পৌঁছতেই কার্তিকবাবু বললেন, তাহলে চিঠি পেয়েছিলে।

পাব না কেন ?

কিছু বলা যায় না। আগে এক পয়সার পোস্টকার্ড এখানকার টেলিগ্রামের চাইতে অনেক জোরে দৌড়তে পারতো। এই কথা বলতে বলতেই উনি টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা চিঠি বের করে আমাকে দিয়ে বললেন, তোমার কাকাবাবু—মানে মাস্টারমশাই এই চিঠিটা দিয়ে বলেছেন আসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ওর সঙ্গে দেখা করে।

আমি কোন কথা না বলে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাকাবাবুর চিঠিটা পড়লাম···স্নেহের প্রদীপ অত্যন্ত দুঃখের কথা তোমার ছাত্রী কল্পনার বাবা শ্রীমান শিবনাথ হঠাৎ মারা গিয়েছেন। ওদের পরিবারের সঙ্গে আমি বিশেষ-ভাবে জড়িত তা তুমি জান। তাই এই বিপর্যয়ের সময় তুমি যদি ওদের পাশে দাঁড়াও তাহলে বিশেষ সুখী হবো। যাই হোক ফিরে এলেই দেখা করো। সাক্ষাতে সব কথা হবে।

আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গেলাম। বসলাম। তারপর শুয়ে শুয়ে ভাবলাম আমি সামান্য গৃহশিক্ষক। আমি ওদের কি সাহায্য করতে পারি ? ওরা ধনী হয়েও আমার মত সাধারণ ছেলের কি সাহায্য ওদের প্রয়োজন হতে পারে ? বরং আমিই ওদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী।

চা এলো। দুটো সিগারেট আনালাম। চা খেয়ে পর পর দুটো সিগারেটও খেলাম। কিন্তু মনে মনে অনেক যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ করে হিসেব মেলাতে

পারলাম না। শেষ পর্যন্ত স্নান-খাওয়া সেরে কাকাবাবুর কাছেই চলে গেলাম।

কাকাবাবু আর কাকিমা কাশীর কথা শোনার পর কাকাবাবুই ও-বাড়ির কথা শুরু করলেন, বড়ই দুঃখের কথা শিবনাথ মারা গেল আর ওর এই হঠাৎ মৃত্যুর কারণ কি জানিস ?

কি ?

পারিবারিক ঝগড়া আর মামলা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বলেন কি ?

হ্যাঁ। মরার আগের দিন রাত্রে জ্যাঠতুতো ভাইদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক হবার পরই শিবনাথ অসুস্থ হয় আর সকালেই সব শেষ।

কি আশ্চর্য !

দুঃখের কিন্তু আশ্চর্যের নয়। সম্পত্তি থাকলেই এসব নোংরামি আর মামলা-মোকদ্দমাও থাকবে।

কথায় কথায় শিবনাথবাবুদের পারিবারিক ইতিহাস জানলাম। আর জানলাম জ্যাঠামশায়ের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে না করে পিতৃবন্ধু ল কলেজের অধ্যাপকের মেয়েকে শিবনাথবাবু বিয়ে করার জন্যই পারিবারিক গণ্ডগোল আরো গুরুতর হয়। আলাদা বাড়িতে সংসার শুরু করায় পারিবারিক যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্নই হয়ে যায়। শিবনাথবাবু বাবার পুরানো চেম্বারে বসে ওকালতি করলেও ও বাড়ির কারুর মুখদর্শনও করতেন না। তবে ব্যাঙ্কশাল বা আলিপুর কোর্টে জ্যাঠতুতো ভাইদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা হতো।

বড়লোকের বাড়ির পারিবারিক কেচ্ছা শোনার মত মন আমার ছিল না কিন্তু কাকাবাবুকে বাধা দিতে পারছিলাম না বলে বাধ্য হয়েই অনেক কিছু শুনলাম। আর পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু কাকাবাবু আমি ওদের কি করতে পারি ?

শিবনাথের স্ত্রী শ্যামলী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। ও সব কিছুই সামলে নিতে পারবে কিন্তু বাড়িতে ত একজন পুরুষ মানুষ চাই। তাই ওর খুব ইচ্ছা তুই ওদের বাড়িতে থাকিস।

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমাকে বলতে না দিয়ে কাকিমা বললেন, শ্যামলীর কোন ভাই নেই। আর ও শ্বশুরবাড়ির কারুর সাহায্য নেবে না। ওর পক্ষে ত শুধু দুটো মেয়েকে নিয়ে থাকা সম্ভব নয় তাই···

কিন্তু কাকিমা চিরটা কালই ত পরের বাড়িতে কাটালাম। আর পরের বাড়িতে থাকতে মন চায় না।

কাকাবাবু বললেন, তা ঠিক তবে তুই ত কৃপাপ্রার্থী হয়ে ওদের কাছে থাকবি না। কল্পনাকে যেমন পড়াচ্ছিলি তেমনই পড়াবি। শুধু মেসে না থেকে ওদের বাড়িতে থাকবি।

কাকিমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ও বাড়িতে থাকলে তোর মেসের খরচা বেঁচে

যাবে আর শ্যামলী যখন তোকে এত স্নেহ করে তখন বলা যায় না হয়ত তোকে কিছু করেও দিতে পারে।

ওঁরা দুজনেই আমাকে অনেক বোঝালেন। ওঁরা ভাবতে পারেন নি আমি এ প্রস্তাবে খুব উৎসাহী হবো না। ওঁরা আশা করেছিলেন আমি এক কথায় হাসিমুখে ওঁদের প্রস্তাব মেনে নেব। আমি কিছুতেই বলতে পারলাম না কাকাবাবু এ সংসারে অন্যের বাড়িতে অন্ন গ্রহণের কি গ্লানি তা আমি মর্মে মর্মে জানি। যিনি যত হাসিমুখেই আমাকে আশ্রয় দিতে চান পরে সে হাসি অনুকম্পায় পরিণত হবেই। বলতে পারলাম না বড়লোকের অনুকম্পার চাইতে কার্তিকবাবুর মেসের বোর্ডার হয়ে থাকা অনেক আনন্দের গর্বের ও সম্মানজনক।

কিছু বলতে পারলাম না। নীরব শ্রোতা হয়ে ওঁদের বক্তব্য শুনে গেলাম। কাকাবাবুর সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব। কারণ জীবনের চরম দুর্দিনেও ওঁদের স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হই নি। কিন্তু আজ মনে মনে বুঝলাম কাকাবাবুর মত শুভাকাঙ্ক্ষীরও সব কথায়, পরামর্শে স্বীকৃতি জানান সহজ ব্যাপার নয়। বোধহয় উচিতও নয়। তবু ওঁদের কথাই মেনে নিলাম।

আপনারা যখন বলছেন তখন আমি আর কি বলব? থাকব ওঁদের ওখানে। তবে যদি চাকরি-বাকরি পেয়ে বাইরে কোথাও চলে যেতে হয়, তখন যেন ওঁরা আমাকে বাধা না দেন।

কাকাবাবু বললেন, না না তা দেবে কেন? তবে এখানে চাকরি পেলে ত ওখানে থাকতে কোন অসুবিধে নেই।

কাকিমা বললেন, দ্যাখ হয়ত তোর অদৃষ্টই পালটে যাবে। মানুষের কখন কি হয় তা কি বলা যায়?

নিছক কথার কথা বললেও মনে হয় কাকিমা যেন কিছু একটা বিশেষ কারণেই আমাকে একটু লোভ দেখালেন।

ভেবেছিলাম বিকেলের দিকে একবার কল্পনাদের বাড়ি যাবো কিন্তু কাকাবাবুর ওখান থেকে মেসে ফিরেই শরীরটা বিশেষ সুবিধের লাগল না বলে চুপ করে শুয়ে রইলাম। অনেক রাত্রে যখন নৃপতি খেতে যাবার জন্য ডাকল তখন আর মাথা তুলতে পারছি না। নৃপতি আমার কপালে হাত দিয়েই চমকে উঠল, এ কী! আপনার ত বেশ জ্বর।

তাই নাকি রে?

হ্যাঁ। কপালে হাত দিতেই ত...

তুই যা। আমি কিছু খাব না।

একেবারেই কিছু খাবেন না, তাই কি হয়? একটু দুধ খান।

আমার মতামত জানানোর আগেই নৃপতি সামনের বারান্দা থেকে চিৎকার করল, বটুক প্রদীপবাবুর খুব জ্বর। চট্ করে কুঞ্জর দোকান থেকে একপো দুধ নিয়ে আয় ত।

এই মেসে বাক্স-বিছানা নিয়ে প্রথম দিন যখন আসি তখন নৃপতিই আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, আপনিই প্রদীপবাবু ত?

হ্যাঁ।

কাঁধের উপর বিছানা আর হাতে সুটকেশ নিয়েই বললো আসুন আমার সঙ্গে।

ঘরে পেঁছে দিয়েই বললো একটু জিরিয়ে নিন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দু' এক মিনিটের মধ্যেই বটুক এক কাপ চা আর দু'খানা থিন এরারুট এনে দিল। বুঝলাম কার্তিকবাবু এ মেসের মালিক হলেও নৃপতিই আসল নৃপতি। আর বুঝলাম কর্তব্যে নৃপতি অদ্বিতীয়।

একটা মানুষ যে কত পরিশ্রম করতে পারে আর কতজনের ফাই-ফরমাস খাটতে পারে তা নৃপতিকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ভোর পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা—একটা পর্যন্ত নৃপতি উন্মাদের মতো ছুটোছুটি করে। এর মাঝে দুপুরের দিকে ঘণ্টা খানেক—ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম। তবু ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। কার্তিকবাবু নিজে রোজ শিয়ালদ থেকে বাজার করে আনেন, ঠাকুর রান্না করে কিন্তু বাকি সবকিছু নৃপতি। পঁয়ত্রিশ জন বোর্ডারের পঁয়ত্রিশ রকম রুচি। অফিস থেকে ফিরে এসে কেউ চা-টোস্ট, কেউ চিড়ে-দই, কেউ ছটা চাঁপা কলা, কেউ তেলে ভাজা আর মুড়ি, কেউ বা অন্য কিছু খাবেন। নৃপতির সব মনে থাকে। অফিস থেকে ফিরে এলেই যে যার ঘরে টেবিলের উপর খাবার পাবেন। সব বোর্ডারের ডাইংক্লিনের বিল আর হিসেব নৃপতির মুখস্থ।

আপনার তিন টাকা কুড়ি পয়সা হয়েছিল। এই নিন এক টাকা আশী।

তোর কাছে রেখে দে।

ঘরে বসেই শুনতে পাই কে যেন চিৎকার করলেন, নৃপতি।

কে ওকে ডাকলেন তা আমরা কেউ বুঝতে না পারলেও ও ঠিক বুঝতে পারে। নৃপতি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় আসছি। এক মিনিটের মধ্যে মদন-বাবুর কাছে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করে বলুন কি বললেন?

হ্যাঁ রে আজ মণি-অর্ডারটা করবি নাকি?

আজ না পারলেও কাল ঠিক করে দেব। কাল করলেও ঠিক সময়ে পেঁছে যাবে।

তা যাবে।

এই ছুটোছুটির মাঝখানে নৃপতি হঠাৎ আমার ঘরে এসে জানিয়ে যায় আজ ঠাকুর মাছে বড্ড বেশী ঝাল দিয়েছে। আপনি খেতে পারবেন না। আপনার জন্য দই এনে রেখেছি। মনে করে ঠাকুরের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন।

আমি অবাক হয়ে শুধু নৃপতির দিকে তাকিয়ে থেকেছি। ভেবেছি এই আন্তরিকতা কর্তব্যবোধ কি সংসারের আর কোথাও পাবো?

একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আচ্ছা নৃপতি তুমি নিজে একটা মেস করছ না কেন?

নৃপতি মাথা নেড়ে বললো না না তাহলে কর্তাবাবুর কাছে বেইমানী করা হবে। এগার বছর বয়স থেকে ওর কাছে আছি। এখন কি ওকে ছেড়ে যেতে পারি ?

এই হচ্ছে নৃপতি। ওর ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, পরনে ছেঁড়া গেঞ্জি আর ময়লা ধুতি। তবু এই নৃপতির কাছে হেরে না গিয়ে উপায় নেই।

বটুক দুধ এনে দিতেই নৃপতি আমাকে দুধ খাইয়ে দিয়ে বললো এবার ঘুমিয়ে পড়ুন। দরকার হলে কাল সকালে একবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনব।

পরের দিন সকালের দিকে জ্বরটা অনেক কম থাকলেও বিকেলের পর থেকেই বেশ বাড়তে শুরু করল। আশেপাশের ঘরের বোর্ডাররা ছাড়াও কার্তিকবাবু মাঝে মাঝেই এসে আমাকে দেখে গেলেন। আমি আচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকলেও ওঁদের কথাবার্তা শুনছিলাম। শুনলাম আগামী কাল সকালে জ্বর না ছাড়লে ডাক্তারবাবুকে ডাকতে হবে।

সকালে বটুককে ধরে ধরে কোন মতে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে চা-বিস্কুট খেয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙ্গলে দেখি রায় ফার্মেসীর সতীশ ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করছেন আর কার্তিকবাবু পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কার্তিকবাবুর পিছনে নৃপতি ছাড়াও আরো দু একজন দাঁড়িয়ে।

দুপুরে ক্যাপশুল আর মিকচার খাবার সময় জিজ্ঞাসা করলাম হ্যাঁরে নৃপতি ডাক্তারবাবু কি বললেন রে ?

বললেন দিন কতক ওষুধপত্র খেতে হবে।

তবে কি সর্দিগর্মির জ্বর না ?

তা ত বলতে পারি না।

কিন্তু মেসে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে ত তোদের সবাইকে…

নৃপতি আমার মুখের কাছে জলের গেলাস ধরে বললো, এসব আজেবাজে কথা না ভেবে চুপ করে শুয়ে থাকুন।

পরের দুটো দিন কিভাবে কেটে গেল, বুঝতেও পারলাম না জানতেও পারলাম না। তার পরের দিন কার্তিকবাবু বললেন, ভয়ের কিছু নেই। প্যারা-টাইফয়েড হয়েছে।

আমি খুব আস্তে আস্তে বললাম, পাশেই ত মেডিকেল কলেজ। আমাকে ওখানেই পাঠিয়ে দিন।

নৃপতি আমার কথা শুনে একটু হাসল। কার্তিকবাবু গম্ভীর হয়ে

বললেন, হাসপাতালে পাঠাবার মত অসুখ তোমার হয় নি। আজকালকার দিনে প্যারাটাইফয়েড আবার কোন অসুখ নাকি ?

যখন জ্বর খুব বাড়তো তখন প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম। কিন্তু জ্বর কমলে সবকিছু বুঝতাম, দেখতাম। মেসের সবাই মিলে আমাকে এমন দেখাশুনা ও সেবাযত্ন করছিলেন যে ঐ অসুস্থ অবস্থাতেও আমি লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায় প্রায় মরে যাচ্ছিলাম। কদিন পরে যখন কাকাবাবু আর কাকিমা আমাকে দেখতে এলেন তখন আমি অনেকটা ভাল। ওরা আমাকে ওদের বাসায় নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেও কার্তিকবাবু বললেন, না, না, মাস্টারমশাই, এখন আর ওকে নিয়ে টানাটানি করবেন না।

কাকাবাবু বললেন, কিন্তু কার্তিকবাবু এই অবস্থায় কি ওকে মেসে রাখা ঠিক ?

কাকাবাবুর কথায় কার্তিকবাবু হঠাৎ রেগে গেলেন। বললেন, মেস চালাই বলে কি আমরা মানুষ না ? আসল বিপদটাই যখন কেটে গেছে তখন আর ভয় নেই। আর কদিনের মধ্যেই ও ভাল হয়ে যাবে।

সেই সেদিন থেকে কাকাবাবু আর কাকিমা রোজ আমাকে দেখতে আসতেন। বেশ কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করতেন, আমাকে ওষুধ-পথ্য খাওয়াতেন, বগলে থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার দেখতেন। তারপর ওঁরা চলে যেতেন।

সেদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, বিকেলের মেয়াদ ফুরিয়ে সন্ধ্যে নেমে এলো কিন্তু কাকাবাবু বা কাকিমা এলেন না। মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। নৃপতি এসে ঘরের আলো জ্বালাতেই দেখি খুব আস্তে আস্তে কল্পনা আমার ঘরে ঢুকল। আমি অবাক হয়ে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই দেখি কাকাবাবু কাকিমা কল্পনার মা আর একটি মেয়েও আমার ঘরে এলেন। আমি তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে বললাম, আপনারা ?

অন্য কেউ কিছু বলার আগেই সদ্যবিধবা কল্পনার মা বললেন, কালই ওর কাজকর্ম মিটল। তাই এর আগে আসতে পারিনি।

ওঁর দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়েই আমি দৃষ্টিটা নামিয়ে নিলাম। কোন কথা বলতে পারলাম না। মুখ নীচু করে বসে থাকলেও দেখলাম নৃপতি কয়েকটা চেয়ার দিয়ে গেল। কাকিমা আর কল্পনা আমার বিছানার এক পাশে বসলেন। ওঁরা তিনজন সামনেই চেয়ারে বসলেন। কিছুক্ষণ কারুর মুখেই কোন কথা এলো না। তারপর কল্পনার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রদীপ আজ কেমন আছো ?

মুখ নীচু করে চাপা গলায় উত্তর দিলাম অনেকটা ভাল আছি।

কাকিমা আমার মাথায় হাত দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই সেদিনের পর আর ত জ্বর হয় নি ?

না।

কল্পনার মা বললেন, এমন সময়ই তোমার শরীর খারাপ হলো যে আমি কিছুই করতে পারলাম না।

আমি বললাম, আপনাদের এই রকম চরম বিপদের দিনে আমিও ত কিছু করতে পারলাম না।

আমাকে ত নানাজনে সাহায্য করেছেন কিন্তু এমন অসুখের মধ্যেও তোমাকে একলা একলা কাটাতে হলো।

না না, মেসে আছি বলে আমার কোন কষ্ট হয়নি। এখানকার সবাই আমার জন্য যা করেছেন তার তুলনা হয় না।

কাকিমা বললেন, তবু বাড়ীর সেবাযত্ন ত আলাদা জিনিস।

নৃপতি চা-বিস্কুট আনতেই কল্পনার মা বললেন, এসব আবার আনতে বললে কেন?

আমি ত বলিনি। ও নিজেই নিয়ে এসেছে।

কাকিমা ট্রে থেকে চা-বিস্কুট নিয়ে কল্পনাকে দেবার পরই পিছন ফিরে বললেন, এই যে আলপনা।

কল্পনার মা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে ত আলপনার আলাপ হয়নি, তাই না?

না।

উনি পাশ ফিরে বললেন, আলপনা, এই হচ্ছে প্রদীপ।

হাতে চায়ের কাপ থাকলেও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ও আমাকে নমস্কার করার চেষ্টা করল। আমিও হাত জোড় করে নমস্কার করে বললাম, আপনি চা খান।

কাকিমা আর কল্পনার মা প্রায় একসঙ্গে বললেন, ওকে আর আপনি বলতে হবে না।

শারীরিক মানসিক ক্লান্তি সত্ত্বেও একটু হেসে বললাম, যে মেয়ে বি-এ পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁকে আপনি বলাই কর্তব্য।

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, কলেজে পড়া ছেলেমেয়েদের আপনি বলাই আজকালকার নিয়ম।

আরো দু'পাঁচ মিনিট এই আলোচনা চলার পর কল্পনার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার বাড়িতে কবে আসছ?

ভাবছি ক'দিন পিসীর কাছে কাটিয়ে আসার পর…

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উনি বললেন, না না এই শরীর নিয়ে তুমি এখন কাশী যেও না। বরং দু' এক মাস পরে আমরা সবাই মিলে কাশী ঘুরে আসব।

সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবু বললেন, প্রদীপ, সেই ত ভাল।

একবার মনে হল চিৎকার করে বলি, কাকাবাবু বহুকাল খাঁচার পাখী হয়ে জীবন কাটিয়েছি। ঐ জীবনের যন্ত্রণা আমি জানি। এই ত মাত্র ক'দিন প্রাণভরে আকাশের কোলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি আর আমাকে…

হঠাৎ কাকিমা আমার পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাবছিস?

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে শুধু বললাম, আমি ত অসুস্থ অবস্থাতেই পিসীর কাছে চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু মেসের সবাই মিলে বারণ করায়···

সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিতে দিতে কাকিমা বললেন, পিসী যখন তোকে অত ভালবাসেন তখন নিশ্চয় যাবি কিন্তু এই শরীর নিয়ে না গিয়ে দু এক মাস পরেই···

বলতে পারলাম না, কাকিমা, শুধু পিসী না, আর একজনের জন্য আমার কাশী যাওয়া দরকার। সে শুধু বাল্যবিধবাই নয়। আমারই মত নিঃসঙ্গ। দিনের আলোয় সে আমার কাছে আসতে না পারলেও রাতের অন্ধকারে সে নীরবে আমার কাছে এসে চোখের জল ফেলে। হরসুন্দরী ধর্মশালায় সে নিজের চোখের জল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছে। কাকিমা আর কিছু নয়, শুধু আমাকে একটু কাছে পেয়ে আমাকে একটু সেবা-যত্ন করেই সেই সর্বহারা মেয়ে নিজের সব দুঃখ ভুলতে চায়, দোহাই কাকিমা আমাকে তোমরা কাশী যেতে বারণ করো না।

সম্ভব হলে আরো অনেক কথাই বলতে পারতাম। বলতাম কাকিমা তোমাদের সবার চাইতে দেবীকেই আমার অনেক আপন মনে হয়। আমি অনেক কিছুই ওকে দিতে পারব না, দিলেও ও নেবে না নিতে পারবে না কিন্তু নিজেকে ত তার কাছে বিলিয়ে দিতে পারব এবং তাতেই আমার শান্তি পরম তৃপ্তি। এই শান্তি এই তৃপ্তি পাবার অধিকারটুকু তোমরা কেড়ে নিও না।

এসব কিছুই বলতে পারলাম না। বলব কীভাবে? কোন মানুষ কি তার মনের কথা বলতে পারে? পারে না। মনের কথা মনেই থেকে যায়। আমি শুনে বললাম, পর পর দু'দিন পিসীকে স্বপ্ন দেখলাম। তাছাড়া বড্ড বেশী পিসীর কথা মনে হচ্ছে। হাজার হোক বয়স হয়েছে। হঠাৎ যে কোনদিন চলে যেতে পারেন। তাই ভাবছিলাম শরীরটা একটু সুস্থ হলে দিনকতক পিসীর কাছে কাটিয়ে আসি।

কল্পনার মা বললেন, পিসীর কাছে যেতে তোমাকে বারণ করতে পারি না। তবে এই সর্বনাশের পর তুমি আমাদের ওখানে থাকলে অনেকটা ভরসা পেতাম। আমার কোন ভাই নেই, ছেলে নেই; শ্বশুরবাড়ির সবাই ত আমাকে পথে বসাতে চান। তাই···

চোখের জল না ফেললেও কথাটা শেষ করতে পারলেন না। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। কাকাবাবু ওঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি মন খারাপ করো না। প্রদীপ একটু সুস্থ হলেই তোমার ওখানে চলে যাবে।

আমি মুখে প্রতিবাদ করলাম না কিন্তু মনে মনে স্বীকৃতি জানাতেও পারলাম না। দুই হাঁটুর উপর মুখ রেখে চুপ করে বসে রইলাম।

একটু পরেই নৃপতি ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর থেকে শিশি খুলে একটা লাল-কালো রঙের ক্যাপসুল বের করে আমার হাতে দিয়েই জলের গেলাসটা আনল। আমি নিঃশব্দে ওষুধটা খেয়ে নিতেই ও বললো, এতক্ষণ বসে বসে কথা বলছেন কেন? শুয়ে শুয়ে কথা বলুন।

নৃপতি দাঁড়াল না। যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল, তেমনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু ঘরের সবাইকে বুঝিয়ে দিল যে আমার সঙ্গে এতক্ষণ বকবক করা ঠিক হয় নি।

অন্য কেউ কিছু বলার আগে আলপনা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মা, চলো। এবার বাড়ি যাই।

আস্তে আস্তে সবাই উঠলেন। কাকিমা বললেন, কাল সকালে তিন-চার দিনের জন্য আমরা বহরমপুর যাচ্ছি। বড় ভাসুর খুবই অসুস্থ। ফিরে এসেই আবার আসব।

আচ্ছা।

কাকাবাবু বললেন, এই ক'দিন এরা রোজ একবার তোকে দেখে যাবে। কোন কিছুর দরকার হলে ওদের বলতে লজ্জা করিস না।

আমি বললাম, আমি ত এখন বেশ ভালই আছি। ওঁদের রোজ রোজ কষ্ট করে আসতে হবে না।

কল্পনার মা বললেন, এইটুকু পথ আসতে আবার কষ্ট কি? টেবিলের দিকে ইসারা করে বললেন, সামান্য একটু ফল রেখে গেলাম। খেও।

ওঁরা সবাই চলে যাবার একটু পরেই নৃপতি আমার জন্য এক গেলাস দুধ নিয়ে এলো। গেলাসটা হাতে নিয়ে আমি বললাম, নৃপতি, আমার অসুখের জন্য সব চাইতে তোমাকে বেশী ঝামেলা ভোগ করতে হল।

নৃপতি সাদাসিধে মানুষ। ও বললো, ঝামেলা মনে করলে সব কাজই ঝামেলা।

তা ঠিক কিন্তু তোমাকে ত অনেক কষ্ট করতে হল।

আপনি দুধ খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আর কোন কথা না বলে দুধ খেয়ে খালি গেলাসটা ওর হাতে দিতেই ও জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি মেস ছেড়ে দেবেন?

নৃপতির প্রশ্ন শুনে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ একথা জানতে চাইছ কেন?

মাস্টারমশাই কর্তাবাবুকে বলছিলেন যে···

কাকাবাবু কি বলছিলেন?

বলছিলেন আপনি সুস্থ হলেই ঐ ছাত্রীদের বাড়ি চলে যাবেন।

কথাটা শুনেই বিরক্ত লাগল। এ মেসের মালিক কার্তিকবাবু। আমরা পয়সা দিয়ে থাকি, কিন্তু আমাদের সবারই একটা স্বাধীন সত্তা আছে। মর্যাদা আছে। এই কথাটা আমিই সময় মত কার্তিকবাবুকে বলতে পারতাম, কাকাবাবুর বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। যাই হোক আমি চুপ করে গম্ভীর হয়ে রইলাম।

আমার মুখের চেহারা দেখে নৃপতি নিশ্চয়ই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারল। বললো, আপনি মন খারাপ করছেন কেন? ইচ্ছা না হলে যাবেন না। হাজার হোক পরের বাড়িতে থাকার চাইতে মেসে থাকা অনেক আনন্দের।

আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললাম, নৃপতি এ সংসারে সহজ সরল সাধারণ কথাগুলোই অধিকাংশ মানুষ বুঝতে চায় না বা বোঝে না।

পরের দিন সকালে ডাক্তারবাবু এসে আমাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাসতে হাসতে বললেন, তোমাকে আর ক্যাপসুল খেতে হবে না। ঐ সাদা ট্যবলেট আরো তিন দিন খেয়ে বন্ধ করে দিও। তারপর দিনকতক একটা টনিক খেও।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছেন কেন?

হাসছি এই জন্য যে তুমি সুস্থ হয়ে গেছ। তোমাকে আর এই বুড়ো ডাক্তারের হাতে অত্যাচার সহ্য করতে হবে না।

কার্তিকবাবু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। উনি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি ও স্বাভাবিক খাওয়া দাওয়া করতে পারে?

নিশ্চয়ই। এবার ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, আজ থেকে তুমি একটু আধটু বাইরে বেরুতে শুরু করো।

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে থাকার পর আমি ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, ডাক্তারবাবু আপনাকে ত বিশেষ কিছুই দিই নি। এবার আস্তে আস্তে সব টাকা শোধ করে দেব।

ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আমার কিছু পাওনা নেই। তুমি বোধহয় জান না, কার্তিকদা ধারে কারবার করেন না!

আমি অবাক হয়ে কার্তিকবাবুর দিকে চাইতেই উনি বললেন, এখন তোমাকে টাকা-পয়সার চিন্তা করতে হবে না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওরা দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে ওঁদের চলে যাবার পথের দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

দুপুরে পেট ভরে মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে ঝিমুনি এলেও ঘুমোন বারণ ছিল বলে একটা পুরনো পূজা সংখ্যা পড়ছিলাম। তারাশঙ্কর আর শরদিন্দুর দুটো বড় গল্প শেষ করে বনফুলের গল্পটা পড়তে পড়তেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে চোখ বন্ধ করেছিলাম। হঠাৎ নৃপতির ডাকাডাকিতে চোখ মেলে তাকিয়েই দেখি, দরজার কাছে আলপনা আর কল্পনা দাঁড়িয়ে।

একি? ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে আসুন।

ঘরে ঢুকে কল্পনা আমার হাতে একটা ঠোঙা দিতেই আলপনা বললো, মার ভীষণ মাথা ধরেছে বলে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু আপনারাই বা…

আপনারাই না, তোমরা।

আমি একটু হেসে বললাম, বসো।

নৃপতি ঘর থেকে বেরুতেই আলপনা জিজ্ঞাসা করল, আজ কেমন আছেন?

ভাল।

দু-এক মিনিট চুপ করে থাকার পর মনে হল হাজার হোক ওরা আমাকে দেখতে এসেছে। আমার এভাবে চুপ করে থাকা ঠিক নয়। কল্পনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি খেতে ইচ্ছে করছে ?

ও জবাব দেবার আগেই আলপনা বললো, না না ও কিছু খাবে না। একটু আগেই খেয়েছে।

আমি একটু হেসে বললাম, আমি জানি আপনি ওর দিদি ওকে শাসন করার অধিকার আপনার আছে কিন্তু এখানে সামান্য কিছু খেলে, বোধহয় খুব অন্যায় হবে না।

আশা করছিলাম কোন গুরু-গম্ভীর জবাব শুনব কিন্তু তা শুনতে পেলাম না। আলপনা হাসতে হাসতে বললো, এই সামান্য ক'টা মাস দু-চারটে ছাত্র-ছাত্রী পড়াতে না পড়াতেই বেশ ত মাস্টার মশাইদের মত কথা বলতে শিখেছেন।

ভেবেছিলাম গম্ভীর হয়ে থাকব কিন্তু সম্ভব হল না। চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললাম, কুলীন না হলে কি বামুন হওয়া যায় না ?

আলপনা এবার আর হাসি চাপতে পারল না। একটু জোরে হাসতে হাসতে বললো, আপনি যে টোলবাড়ির পণ্ডিতদের মত কথা বলছেন!

কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, এই দিদি টোলবাড়ি কাকে বলে রে ?

আলপনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিড়িমিড়ি পণ্ডিতদের স্কুল।

আমি হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলাম, এখুনি নৃপতি এসে জিজ্ঞাসা করলে কি আনতে বলব ?

ও আনতে চাইলেই আনতে দিতে হবে ?

আমি কিছু না বললেও নৃপতি কিছু না এনে পারবে না।

তাহলে চা আনতে বলবেন ?

শুধু, চা ?

তা হয় না। আপনি মিষ্টি না নোনতা ভালবাসেন ?

আমার কথা শুনেও বুঝতে পারছেন না ?

একটু লজ্জিত হয়ে বললাম, মেয়েরা সাধারণত নোনতাই ভালবাসে।

একটু সহজ হয়ে আলপনা বললো, সামান্য কিছু নোনতাই আনতে দিন।

আমি উঠে গিয়ে নৃপতিকে দুটো চিকেন কাটলেট আর ক'টা সন্দেশ আনতে বলে এলাম।

আমি ফিরে আসতেই আলপনা বললো, আপনার মেসটা বেশ ভাল!

ভাল মানে ?

সাধারণ মেসবাড়ির মত কোন হৈ-হুল্লোড় নেই।

একদম না।

আপনি কি এখানে অনেক কাল আছেন ?

না না, এই ত মাত্র কয়েক মাস।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

কিন্তু মেসের সবার কথাবার্তা ব্যবহার দেখে মনে হয় আপনি এখানকার পুরোনো বাসিন্দা।

আমি একটু হেসে বললাম, হ্যাঁ মেসের সবাই আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। এই অসুখের সময় তা আরো ভালো করে বুঝতে পেরেছি।

কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, আপনার মেসে থাকতে ভাল লাগে ?

খুব ভাল লাগে।

আলপনা জিজ্ঞাসা করল, বাড়ির চাইতে মেসে থাকতে বেশী ভাল লাগে ?

আমি একটু শুকনো হাসি হেসে বললাম, নিজের বাড়িতে ত কোনদিন থাকি নি ; তবে পরের বাড়িতে থাকার চাইতে মেসে থাকা নিশ্চয়ই ভাল।

আমি কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আলপনার মুখের চেহারা বদলে গেল। বুঝলাম, কথাটা বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু যে কথা বলে ফেলেছি তা তো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। চুপ করে রইলাম।

অস্বস্তি থেকে বাঁচালো কল্পনা। জিজ্ঞাসা করল, প্রদীপদা আপনি সারাদিন এই ঘরের মধ্যে থাকেন ?

বললাম, এতদিন অসুস্থ ছিলাম বলে ঘরের মধ্যেই কাটিয়েছি। তবে আজই ডাক্তারবাবু বাইরে বেরুবার অনুমতি দিয়েছেন।

আলপনা আবার জিজ্ঞাসা করল, আজ বেরিয়েছিলেন ?

না। ভেবেছি কাল থেকে একটু একটু বেরুব।

আলপনা জিজ্ঞাসা করল, আমরা না এলে আজই বোধহয় বেরুতেন।

না। এখন ঘরেই থাকতাম।

তাই কি ?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমরা আসব তা ত জানতেন না।

জানতাম না ঠিকই কিন্তু মনে মনে আশা করছিলাম কেউ না কেউ আসবেনই।

কথাবার্তা বলতে বলতেই নৃপতি ওদের জন্য চিকেন কাটলেট আর সন্দেশ এনে দিয়ে বললো, একটু পরে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নৃপতি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আলপনা বললো, এত খাবার কে খাবে ?

ওয়ান কাটলেট প্লাস টু ছোট ছোট সন্দেশ—এত খাবার হয় না। চটপট খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি একটা কাটলেট প্লেটে তুলে কল্পনাকে

দিয়ে বললাম, তুমি শুরু কর। এবার দ্বিতীয় প্লেটটা আলপনার সামনে ধরে বললাম, প্লীজ, শুরু করুন।

একবার আমার দিকে তাকিয়ে আলপনা প্লেটটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি শুধু দর্শক হয়ে বসে থাকবেন ?

আপনারা আসার একটু আগেই আমি দুধ আর বিস্কুট খেয়েছি। তাছাড়া এখন এসব খাবার খাওয়া ঠিক উচিত হবে না।

চা খাবেন ত ?

নৃপতি দিলে নিশ্চয়ই খাব।

নৃপতিকে বলে দেব ?

বলতে হবে না। মনে হয় এক কাপ চা পাবো।

তাহলে শুরু করব ?

নিশ্চয়ই।

ওদের খাওয়া শেষ হতে না হতেই নৃপতির এক চেলা এসে তিন কাপ চা দিয়ে গেল।

কল্পনা বললো, আমি চা খাব না।

সঙ্গে সঙ্গে আলপনা বললো, ঠিক আছে আমি খেয়ে নেবো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বুঝি চা খেতে খুব ভালবাসেন ?

দাদু-দিদার আদরে মানুষ হয়ে আমি একেবারে গোল্লায় গেছি।

না, না, আমি তা বলি নি।

আপনি না বললেও আমি জানি আমি একটা রাজার বাঁদর তৈরী হয়েছি।

ওর কথা শুনে আমি না হেসে পারি না।

আলপনাও হাসে। বলে, হাসছেন কেন ? এতক্ষণ আমার বাচালতা দেখেও বুঝতে পারেন নি দাদু-দিদা আদর দিয়ে আমার বারোটা বাজিয়েছেন।

আমি হাসতে হাসতে বলি, যে বলে আমি পাগল, সে কখনই পাগল নয়।

দাদু-দিদা আমাকে পুরো পাগল বানাতে পারেন নি, তবে হাফ পাগল যে হয়েছি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আপনি রিয়েলি ভেরী ইণ্টারেস্টিং মেয়ে।

ইণ্টারেস্টিং...কিনা জানি না তবে হেসে খেলে জীবন কাটাতে আমার ভাল লাগে।

সেই ত ভাল।

কিন্তু হেসে-খেলে জীবন কাটানোরও সমস্যা আছে।

কেন ?

আলপনা একটু থেমে বললো, শুনতে চান ?

আপত্তি না থাকলে শুনতে পারি।

কোন কিছু বলতেই আমার আপত্তি নেই

তাহলে বলুন।

একটু মুচকি হেসে ও বললো, তেমন কিছু নয় ; তবে এই হেসে-হেসে কথা বলার জন্য অনেক ছেলেই ভাবে আমি তাদের প্রেমে পড়েছি।...

ভয় নেই, আমি সে ভুল করব না।

এসব কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না।

অন্য কেউ না পারলেও আমি পারি।

আলপনা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, যাক তাহলে আপনার সঙ্গে প্রাণ খুলে মেশা যাবে।

কথায় কথায় আমাদের চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। কল্পনা বললো, দিদি বাড়ি যাবি না ?

আলপনা জবাব দেবার আগেই আমি বললাম, সত্যি কথায় কথায় আপনাদের অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। আপনাদের মা নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন।

আলপনা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, পাঁচ মিনিটের ত রাস্তা। দরকার হলে মা ডেকে পাঠাতেন। যাই হোক আজ চলি।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, সময় পেলে আবার আসবেন।

আলপনা ওর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললো, আমার আবার সময়ের অভাব কোথায় ? লেখাপড়ার ঝামেলা চুকে গেছে। এখন শ্বশুরবাড়ি না যাওয়া পর্যন্ত আমার অফুরন্ত সময়।

ওর প্রত্যেকটা কথা শুনেই হাসি পায়। বলি আপনার কথা শুনতে বেশ লাগে।

বেশী উৎসাহ দেবেন না। তাহলে আমি মাথায় চড়ে বসব।

ওদের সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসার পথে কার্তিকবাবু ডাকলেন, প্রদীপ শুনে যাও।

ওর সামনে হাজির হতেই উনি বললেন, এই সন্ধ্যেবেলায় ঘরে বসে না থেকে একটু বাইরে ঘুরে এলে ত শরীরটা ভাল লাগত।

কাল থেকে বেরুব।

তবে কাল থেকেই আবার টিউশনি শুরু করো না।

আমি হেসে বললাম, না না, সপ্তাহখানেকের আগে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে যাচ্ছি না।

আচ্ছা যাও।

উনি চলে যেতে বললেও আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মুগ্ধ বিস্ময়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম ভূতের মত চেহারার এই লোকটা আমাদের মেসের মালিক। সারাদিন চাল-ডাল তেল-নুন সব্জী আর মাছের হিসেব করেন। একটি পয়সার গরমিল হলে উনি বোধহয় তিন দিন দাড়ি কামান না। দেখে মনে হয় না, মানুষটার দেহের মধ্যে হৃৎপিন্ড বলে কোন পদার্থ আছে। অথচ কি আশ্চর্য দরদী মন।

দাঁড়িয়ে আছো কেন? কিছু বলবে?

না, কিছু বলব না।

তাহলে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর।

ঘরে ফিরে এসেও কার্তিকবাবুর চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলাম না। একটু পরে নতুন ছোকরা চাকরটা কাপ-প্লেট গেলাস নিতে এলে হঠাৎ টেবিলের উপর দৃষ্টি পড়তেই দেখি একটা ছোট লেডিজ পার্স। বুঝলাম ওরা ফেলে গেছে। একবার মনে হল ফিরিয়ে দিয়ে আসি। আবার মনে হল ব্যস্ত কি? কাল ওরা কেউ না এলে ফিরিয়ে দিয়ে আসব। এসব ভাবতে ভাবতেই পার্সটা খুলে দেখি একটা একশ টাকার নোট আর একটা প্রেসক্রিপসন। বুঝতে পারলাম ওর মা ওষুধ কিনতে দিয়েছিলেন কিন্তু আলপনা ভুলে গেছে। একবার মনে হল ওষুধটা হয়ত আজই দরকার। পার্সটা এখুনি দিয়ে আসাই উচিত হবে কিন্তু এখন বেরুতে গেলেই কার্তিক-বাবু চেপে ধরবেন। হয়ত বলবেন—যদি অত জরুরী হয় তাহলে ওরাই এসে নিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত পার্সটা নিজের কাছেই রেখে দিলাম।

আটটা বাজতে না বাজতেই ঠাকুর খাবার দিয়ে গেল। ন'টার মধ্যেই শুয়ে পড়লাম কিন্তু এত সকাল সকাল কি ঘুম আসে? হঠাৎ মনে হল আলপনা মেয়েটা বেশ প্রাণখোলা হাসি-খুশী। শরতের মেঘের মত নির্মল ও স্বচ্ছন্দ। যতক্ষণ কাছে থাকে কথা বলে মনটা খুশীতে ভরে যায়। ওর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা নিজেও জানতে পারলাম না।

ভোরবেলার দিকে ঘুম ভাঙলেও আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল নৃপতির ডাকাডাকিতে। উঠে দেখি আটটা বেজে গেছে। চা খেয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে আসতেই ন'টা হয়ে গেল। তারপর ডাক্তারবাবুর নির্দেশ মত দুধ টোস্ট আর ডিম খেয়ে খবরের কাগজখানা নিয়ে বসতে না বসতেই দেখি আলপনা হাসতে হাসতে আমার ঘরে ঢুকল। অভ্যর্থনা না করে অপরাধীর মত আগেই বললাম, খুব উচিত ছিল পার্সটা পৌঁছে দিয়ে আসা কিন্তু···

তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নি বা মা আমাকে ফাঁসিও দেন নি।

তবুও আমার কর্তব্য···

ছোট্ট লেডিজ রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ও বললো, আগে একটু জিরিয়ে নিই। তারপর আপনার কর্তব্যের কথা শুনব, কি বলেন?

লজ্জিত হয়ে বললাম, সরি? বসুন বসুন।

আলপনা চেয়ারে বসতেই বললাম, শুধু পার্সটা নেবার জন্যই এই সাত সকালে আপনাকে এত কষ্ট করতে হল।

কে বললো শুধু পার্স নেবার জন্য বেরিয়েছি ?

আমার অনুমান।

আপনার অনুমান ঠিক নয়। এখান থেকে ব্যাঙ্কে যাব, ব্যাঙ্ক থেকে বোনের স্কুলে যাব, তারপর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরব।

চা খাবেন ত ?

তা খেতে পারি।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দু' কাপ চায়ের কথা বলে ঘরে আসতেই ও জিজ্ঞাসা করল, আজ বিকেলে কখন বেড়াতে বেরুবেন ?

বেড়াতে বেরুব মানে একটু ঘুরে আসব।

কখন ?

সন্ধ্যের আগে না।

তাহলে বিকেলের দিকে মেসেই থাকবেন ?

আর কোথায় যাব ?

বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সিনেমা-থিয়েটার যেখানে মন চাইবে সেখানেই যেতে পারেন।

আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব নেই। আর সিনেমা থিয়েটার বিশেষ দেখি না।

আলপনা অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার কোন আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব নেই, তাই কখনো হতে পারে ?

বিশ্বাস করা বা না করা আপনার ইচ্ছা। তবে আমি সত্যি কথাই বলছি।

আমি অবিশ্বাস করছি না কিন্তু...

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ঐ কিন্তুটাই আমার জীবনের ট্র্যাজেডি।

আমার কথা শুনে আলপনা হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না।

দু' কাপ চা এলো। দু'জনে চা খেতে শুরু করলাম কিন্তু তখনও কারুর মুখে কোন কথা নেই। একটু পরে আলপনা জিজ্ঞাসা করল, আপনি দিনগুলো কাটান কিভাবে ?

একটু ম্লান হাসি হেসে বললাম, দিন কাটাই না ; কোন মতে দিনগুলো পার হয়ে যাচ্ছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়ে এসে এই মেসেই থাকেন ?

হ্যাঁ।

ভাল লাগে ?

মেসে ভাল লাগার মত কি আছে ? শুয়ে-বসে সময়টা কাটিয়ে দিই, এই মাত্র।

আবার কয়েক মিনিট দু'জনেই চুপচাপ রইলাম। তারপর আলপনা জিজ্ঞাসা করল, শুনেছিলাম আপনি মাঝে মাঝেই বেনারস যান ?

মাঝে মাঝে মানে ইদানীংকালে বার দু'য়েক গিয়েছি।

ওখানে কি আপনার কেউ আছেন?

আত্মীয় বলতে আমরা যা বুঝি সে রকম কেউ নেই। তবে দু'এক বৃদ্ধা আর বিধবা আছেন যাঁরা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন।

বেনারস জায়গাটা বেশ ভাল, তাই না?

আমি টুরিস্টদের মত খুব বেশী ঘুরে-ফিরে দেখি নি। যাঁদের জন্য যাই তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব করেই ক'টা দিন কাটিয়ে দিই।

আচ্ছা, ওখানকার লোকজন বুঝি সব কনজারভেটিভ?

সাধারণ লোকজন বোধহয় কনজারভেটিভ। তবে ওখানকার বিধবারা বড় দুঃখী।

কেন?

প্রায় প্রত্যেক বিধবাকেই বহু দুঃখ বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে ও হচ্ছে।

আজকালকার দিনেও বিধবাদের উপর অত্যাচার হয়?

কাশীর গলিতে এখনও আজকালকার হাওয়া ঢোকে নি। ওখানকার বিধবাদের আজও পঞ্জিকার প্রতিটি অনুশাসন মেনে চলতে হয়।

বলেন কি?

আমি একটু শুকনো হাসি হেসে বললাম, স্বাধীন ভারতবর্ষ শুধু চাষী-মজুরের দুঃখের কথাই ভাবল। বিধবাদের দুঃখের কথা ভাবার সময় কারুর হল না।

কি আশ্চর্য।

কিছু আশ্চর্য নয়। এ দেশে ধর্মের নামে কিভাবে যে মানুষের উপর অত্যাচার করা হয় তা কাশীতে না গেলে জানা যায় না।

আলপনা চট করে কোন কথা বলতে পারল না। মুখ নীচু করে আপন মনে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে ও হাতের ঘড়ির দিকে তাকাতেই আমার খেয়াল হল ওর অনেক কাজ আছে। ওকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। বললাম, আপনাকে অনেক দেরী করিয়ে দিলাম।

আলপনা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, দেরী হয় নি। ব্যাঙ্ক ত দশটায় খোলে। এখন ত মোটে সওয়া দশটা বাজে।

আমি টেবিলের দিকে হাত দেখিয়ে বললাম, আগে পার্সটা হাতে নিন। তা নয়ত আবার এই রৌদ্রে ফিরে আসতে হবে।

টেবিল থেকে পার্সটা তুলতে তুলতে আলপনা বললো, পার্স নিয়ে গেলেও আপনার কাছে আবার আসতে হবে।

কেন?

সত্যি কথা বলব?

সত্যি কথাই ত বলা উচিত।

প্রথম দিন আপনাকে আমার বিশেষ ভাল লাগে নি কেন জানেন?

না।

মনে হয়েছিল আপনার নিজস্ব কোন চিন্তাধারা নেই। বড়দের বড্ড বেশী অনুগত কিন্তু আজ ইঙ্গিত পেলাম আপনি ঠিক তা নন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আলপনা দরজার দিকে এক পা বাড়িয়েই বললো, চলি। বোধহয় বিকেলের দিকে মার সঙ্গে আসব।

আজকে আপনার মা কেমন আছেন ?

ভালই আছেন ; তবে সদ্য সদ্য বাবা মারা গিয়েছেন বলে কিছু না হলেও মা অসুস্থ বোধ করেন।

খুবই স্বাভাবিক।

তবে এতবড় একটা আঘাত মাকে একলা একলা সহ্য করতে হচ্ছে বলে ওঁর এত কষ্ট হচ্ছে।

একলা একলা কেন ?

সে অনেক কথা। পরে বলব। এখন চলি।

আচ্ছা।

আলপনা আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আমি আপন মনে একটু হাসলাম। মনে মনে বললাম, আলপনা প্রথম দিন তোমাকে দেখে আমার মোটেও ভাল লাগে নি। কেন জান ? মনে হয়েছিল অত্যন্ত অহঙ্কারী। নিজের রূপ যৌবন পারিবারিক অর্থ-প্রতিপত্তি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম আর কিছু মনে হয় নি ? মনে হয়েছিল বড়লোক দাদুর আদুরে ন্যাকা বোকা নাতনী।

সেদিন ওকে দেখে আমি ভাবতেও পারি নি ও কোনদিন আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলবে। আজ মনে হচ্ছে আমি ভুল বুঝেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি আলপনা শুধু বুদ্ধিমতী নয়, একটু স্বতন্ত্র।

কয়েক দিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হলাম। ছাত্রছাত্রী পড়ান শুরু করলাম। এতদিন টাকাকড়ির ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয় নি। কার্তিকবাবু সবকিছু করেছেন। এখন হিসেব করে দেখলাম শ' চারেক টাকা দেনা হয়ে গেছে। আমি সারা মাসেও চারশ' টাকা রোজগার করি না। প্রয়োজনে দু' একটি ছাত্রছাত্রীর বাবা-মার কাছ থেকে দশ-পনের দিন আগেই মাইনে নিয়েছি কিন্তু চারশ' টাকা ত সেভাবে জোগাড় করা যাবে না। কার্তিকবাবু মেসের মালিক হলেও ধনী নন। বোধহয় মাসের শেষে চার-পাঁচশ'র বেশী উনিও হাতে পান না। এই আয় দিয়ে দেশের বাড়িতে ওঁর বিরাট সংসার চালাতে হয়। সুতরাং উনি কিছু না বললেও আমি জানি টাকাটা ওঁর জরুরী প্রয়োজন।

দু'তিনদিন ভেবে দেখলাম কাকাবাবু বা কোন ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে এত টাকা চাওয়া ঠিক হবে না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম দেবীকেই লিখব। রাত্রে ফিরে এসেই দেবীকে দীর্ঘ চিঠি লিখলাম। সব কিছু জানালাম। তারপর

সব শেষে লিখলাম, কার্তিকবাবুকে টাকাটা দিয়ে দেওয়া দরকার। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পাশ হলেও এত টাকার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা আমার নেই। এ দৈন্যের কথা শুধু তোমাকেই জানালাম।

সপ্তাহখানেক পরে দুটি ছাত্র পড়িয়ে কলেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকান থেকে দুটি বই কিনে মেসে ফেরার পথে আমার এক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা। সে জোর করে রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল। মেসে ফিরতে ফিরতে বেশ বেলা হয়ে গেল।

বারান্দায় পা দিতে না দিতেই কার্তিকবাবু বললেন, তোমার একটা মনি-অর্ডার এসেছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। তোমার ঘরে দিদি বসে আছে। তার কাছে ফর্মটা আছে। সই করে আমাকে দিয়ে যেও। পিওন একটু পরে আসবে।

আচ্ছা।

তাড়াতাড়ি উপরে উঠলাম। দেখি আলপনা বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কতক্ষণ ?

মিনিট পনের।

কি ব্যাপার ? এই রকম অসময় ?

আলপনা একটু হেসে বললো, জানতাম মোটা টাকার মনি-অর্ডার আসবে। তাই এসে বসে আছি।

আমি তক্তাপোষের উপর বসতে বসতে বললাম, এটা আমার রোজগারের টাকা নয়। সুতরাং এ টাকা না পেলেও আমার দুঃখ করার অধিকার নেই।

ও আমার দিকে মনি-অর্ডার ফর্মটা এগিয়ে দিয়ে বললো, নিজের রোজগারের টাকাই হোক বা বাপ-ঠাকুর্দার সম্পত্তির টাকাই হোক, টাকাটা ত আপনার।

আমি ফর্মটা হাতে নিয়ে বললাম, বাবা শুধু আমাকেই রেখে গেছেন সম্পত্তি রেখে যান নি।

নিজের রোজগারের টাকা না পৈতৃক সম্পত্তির টাকাও না তবু এত টাকার মনি-অর্ডার ! আপনি ত সত্যি ভাগ্যবান !

মনি-অর্ডার ফর্মে দেখলাম পাঁচশ' টাকা এসেছে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললাম, সত্যি আমি ভাগ্যবান। যিনি এই টাকা পাঠিয়েছেন তাঁকে আমার কিছুই দেবার নেই, অথচ তাঁর কাছে ছাড়া আর কারুর কাছেই আমি কিছুই চাইতে পারি না।

উনি নিশ্চয়ই আপনাকে খুব স্নেহ করেন ?

আমাকে স্নেহ করার বয়স ওঁর নয়। উনি আমার চাইতে বছর দুয়েকের ছোট।

তাহলে উনি আপনাকে ভক্তি করেন, শ্রদ্ধা করেন।

ঠিক ভক্তি-শ্রদ্ধাও করেন না।

তাহলে বোধহয় আপনাকে ভালবাসেন।

কথাটা শুনেই চমকে উঠলাম। বললাম, উনি বিধবা।

আমার জবাব শুনে আলপনাও চমকে উঠল। বললো, হঠাৎ বলে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না।

কিছু মনে করি নি।

আমি মনি-অর্ডার দুটো সই করে কুপনটা ছিঁড়ে নিলাম। বললাম, একটু বসুন। ফর্মটা নীচে দিয়ে আসি।

ও কিছু বললো না। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পা দিতেই কুপনটা পড়লাম। দেবী লিখেছে এই রকম একটা শুভ সংবাদ পাব বলেই প্রত্যাশা করছিলাম। মেয়েদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারার জন্যই কি ভগবান পুরুষমানুষ সৃষ্টি করেছেন? কার্তিকবাবুর ৪০০ টাকা নৃপতির ধুতির টাকা তোমার আসার ভাড়া পাঠালাম। খুব তাড়াতাড়ি চলে এসো।

মনি-অর্ডার ফর্মটা কার্তিকবাবুকে দিয়ে আবার নিজের ঘরে এসেই কুপনটা আলপনার সামনে ধরে বললাম, পড়ুন।

ও কুপনটা পড়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ইনি খুব বলিষ্ঠ চরিত্রের মেয়ে তাই না?

কেন বলুন ত?

এই দু'লাইন লেখা পড়েই বোঝা যায় মনের মধ্যে কোন দ্বিধা বা জড়তা নেই।

আমি কিছু বললাম না। শুধু একটু হাসলাম।

হাসছেন কেন?

আপনার কথা শুনে।

কেন? ঠিক বলি নি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ দু' লাইন পড়ে আর কিছু মনে হল?

আপনাকে উনি খুব আপনজন মনে করেন।

আর কিছু?

এবার আলপনা হেসে বললো, আর মনে হল আপনার নিশ্চয়ই বেনারস যাওয়া উচিত।

কিন্তু তা ত সম্ভব না।

অসম্ভব হলেও আপনি যাবেন।

আমি এখন আবার কাশী গেলে কাকাবাবু কাকিমা আপনার মা—সবাই আমার উপর রাগ করবেন।

ওরা রাগ করলে আপনার কিছু যায় আসে না কিন্তু এমন শুভাকাঙ্ক্ষিনীকে দুঃখ দিলে···

আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, আপনি ভাবাবেগের কথা বলছেন, যুক্তির কথা বলছেন না।

জীবনটা ত কোর্ট রুম নয় যে শুধু যুক্তি-তর্ক করেই···

জীবনটা শুধু ভাবাবেগের জন্যও নয়।

মাথা দুলিয়ে আলপনা বললো, তর্ক করবেন না। মোট কথা আপনি যাবেন, যেতেই হবে।

আচ্ছা সে দেখা যাবে। আপনি কেন এসেছেন, তা ত বললেন না।

মা বলেছেন আজ রাত্রে আপনি আমাদের বাড়িতে খাবেন।

কেন ?

কোন কারণ নেই ; মার ইচ্ছা।

হঠাৎ ?

আপনি এত প্রশ্ন করবেন জানলে মার কাছ থেকে উত্তরগুলো জেনে আসতাম।

ওর কথা শুনে একটু হাসি।

আসবেন ত ?

আসব ; তবে ন'টা বেজে যাবে।

তা বাজুক। আলপনা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলি।

এতক্ষণে আমার খেয়াল হলো ওকে এক কাপ চা পর্যন্ত দিলাম না। বললাম, আপনাকে ত এক কাপ চাও খাওয়ালাম না।

এখন আর সে কথা বলে লাভ নেই। চলি।

আলপনা চলে গেল।

কল্পনাকে পড়াতে গেলে রোজ এক কাপ চা পাবই। মাঝে মাঝে চায়ের সঙ্গে আরো কিছু। কখনও কখনও ঐ আরো কিছুর পরিমাণ এমন হয় যে রাত্রে মেসে ফিরে আর কিছু খাই না। তবে নেমন্তন্ন একদিনও খাই নি। আজ রাত্রে কেন খেতে বললেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। আলপনা বা কল্পনার জন্মদিন নয় ত ? নাকি ওদের বাবা বা মার জন্মদিন ? অথবা অন্য কিছু ? একবার ভাবলাম এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে যাই। আবার মনে হল যদি মিষ্টি নিয়ে যাবার মত কারণ না হয়, তাহলে ? শেষ পর্যন্ত কিছু না নিয়েই সওয়া ন'টা নাগাদ হাজির হলাম।

আমাকে দেখেই কল্পনা প্রায় চিৎকার করে উঠল, মা, প্রদীপদা এসেছেন।

রান্নাঘর থেকেই ওর মা জবাব দিলেন, উপরে নিয়ে যা।

দোতলার বারান্দার রেলিঙে দু' হাত রেখে মুখ নীচু করে আলপনা আমাকে বললো, দাঁড়িয়ে কেন ? উপরে চলে আসুন।

এ বাড়িতে এতদিন আসা-যাওয়া করছি কিন্তু কোনদিন দোতলায় যাই নি। প্রয়োজনও হয় নি, অবকাশও হয় নি। একতলাতেই কল্পনার পড়ার

ঘর। এছাড়া বসার ঘর, খাবার ঘর রান্নাঘরও একতলায়। দোতলায় যাবার আমন্ত্রণ পেয়ে বুঝলাম আজ আমি সত্যি একজন বিশিষ্ট অতিথি।

কল্পনা বললো আসুন।

আমি বললাম, তুমি চল। আমি তোমার পিছনেই আসছি।

কল্পনার পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার বারান্দায় পা দেবার আগেই আলপনা বললো, আসুন, আসুন।

আমি বারান্দার একপাশে চটি খুলে একটু এগুতেই আলপনা বললো, এই ঘরে আসুন।

ঘরখানিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দুটি জিনিস স্পষ্ট বুঝলাম। এই ঘরখানি নিঃসন্দেহে আলপনার। ঘরের দেয়ালে ওর ছোট-বড় ডজনখানেক ফটো দেখেই বললাম, এটা নিশ্চয়ই আপনার ঘর?

হ্যাঁ, কিন্তু কি করে বুঝলেন?

আমি একটু হেসে বললাম, সে কথাও বলতে হবে?

কল্পনা বললো, জানেন প্রদীপদা, আমি বলি এটা দিদির স্টুডিও।

আমি হাসলাম।

আলপনা বললো, তুই চুপ কর।

এতদিন জানতাম, এদের অবস্থা ভাল কিন্তু আজ শুধু এই আলপনার ঘরখানি দেখেই বুঝলাম এরা সত্যিই ধনী। ঘরের সব কিছুর মধ্যেই এদের আভিজাত্য ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বেশ সুস্পষ্ট।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছবিগুলো দেখছিলাম। আলপনা বললো, আমি ফিল্মস্টার না। আমার ছবি কি দেখবেন।

ঘরে ছবিগুলো যখন টাঙিয়েছেন তখন সেগুলো দেখার অধিকার বোধহয় আমার আছে।

তর্ক না করে বসুন। পরে দেখবেন।

তাতে আপত্তি নেই।

ঘরের একপাশে ভিকটোরিয়ান ডিজাইনের ডিভান। আমি তারই একপাশে বসে বললাম, আপনারাও বসুন।

কল্পনা আমার পাশে বসলেও আলপনা সামনে দাঁড়িয়ে রইল। বললো, আমি সন্ধ্যে থেকে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। এখুনি আর বসতে ইচ্ছে করছে না।

আমি বসে আছি আর আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন সেটা কি ভাল দেখায়?

সব ব্যাপারে অত ভাল-মন্দ বিচার করবেন না ত।

করব না?

না।

আচ্ছা এবার আজকের নেমন্তন্নর কারণটা জানতে পারি?

আলপনা জবাব দেবার আগেই কল্পনা বললো, আজকে দিদির জন্মদিন। আপনি জানেন না?

শুনেই একটু বিরক্তবোধ করলাম। খালি হাতে জন্মদিনে নেমন্তন্ন খেতে আসা খুব সম্মানজনক নয়। আলপনা হয়ত আমার খরচ বাঁচাবার জন্যই খবরটা দেয় নি। আমি ধনী না হলেও বেকার নই। আমার আত্মসম্মান বলে কি কিছু নেই। মনে মনে ভাবলাম, সাধারণ মানুষকে অনুকম্পা করাই বোধ-হয় মহত্ত্ব। আমি আলপনার দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর হয়েই বললাম, এ খবরটা আমাকে জানালে বোধহয় আপনার কোন অন্যায় হতো না, তাই না ?

আলপনা আমার কথার জবাব না দিয়ে কল্পনাকে বললো, দ্যাখ ত মার কত দেরী।

কল্পনা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আলপনা আমার দিকে দু-এক পা এগিয়ে এসে বললো. আজ আমার জন্মদিন হলেও কোন উৎসব করার মত মন কারুরই নেই। শুধু মাকে খুশী করার জন্যই আপনাকে খেতে বলেছি।

আমি আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারি কিন্তু ··

আপনি বিশ্বাস করুন আমি মাকে পর্যন্ত কোন উপহার দিতে দিই নি। মাকে যখন কিছু দিতে দিলাম না তখন আপনার কাছ থেকে কিছু নেওয়াও বোধহয় ঠিক হতো না ?

এ কথাগুলো ত আমাকে আগেও বলতে পারতেন ?

তা পারতাম।

আর কিছু না আনি একগোছা ফুল বা একখানা বই ত আনতে পারতাম ?

ব্যস্ত কি ? পরে দেবেন।

আজকের এই দিনটা ত আর পাব না।

আলপনা কিছু বলার আগেই বারান্দায় কল্পনা আর ওর মার গলা শুনলাম আলপনা ডাকল, মা এসো।

আলপনার মা ঘরে ঢুকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার খুব খিদে লেগেছে ত—

না, না, এত তাড়াতাড়ি আমি খাই না।

উনি ডিভানের আরেক পাশে বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কখন খাও ?

দশটার আগে খাই না।

মেসের রান্না রোজ রোজ খেতে ভাল লাগে ?

খারাপ লাগে না। প্রায় এক নিশ্বাসেই বললাম, তাছাড়া মেসের সবাই আমাকে এত ভালবাসেন যে ওঁরা যা খেতে দেন তাই আমার ভাল লাগে।

ঠিক বলেছ। হাসি মুখে, আন্তরিকতার সঙ্গে যদি কেউ কিছু করে তা ত ভাল লাগবেই।

এবার আমি একটু হেসে বললাম, আজ আপনার বড় মেয়ের জন্মদিন অথচ উনি আমাকে···

ও ঐ ধরনের। আমাকে পর্যন্ত কিছু করতে দিল না।

যখন কিছুই করতে দিলেন না তখন আমাকে খাওয়ান বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।

তুমি কেন খাবে না ? তোমাকে ত এর আগে একদিনও খেতে বলি নি।

তাতে ত আমার বিশেষ লোকসান হয় নি। প্রায় রোজই ত কিছু না কিছু পেয়েছি।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর আলপনা আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল আপনি বেনারস যাচ্ছেন কবে।

ওর প্রশ্ন শুনে আমি অবাক কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই ওর মা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আবার পিসীর ওখানে যাচ্ছো ?

আমি বললাম, যেতে বললেই কি যাওয়া সম্ভব ?

আলপনা গম্ভীর হয়ে বললো, ঐভাবে কেউ টাকা পাঠিয়ে যেতে বললে না যাওয়াটা অত্যন্ত অন্যায়।

কিন্তু...

কিন্তু কিন্তু করবেন না। মানুষের স্নেহ-ভালবাসা ভক্তি-শ্রদ্ধার মর্যাদা দিতে শিখুন।

আলপনার মা একটু রাগ করেই ওকে বললেন, তুই এভাবে কথা বলছিস কেন ?

মা মনি-অর্ডার কুপনের দু'লাইন লেখার মধ্যে কি গভীর আন্তরিকতা ছিল, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

ওর মা জিজ্ঞাসা করলেন, তুই পড়েছিস নাকি ?

আমি চুপ করে মা-মেয়ের কথা শুনছি।

আলপনা বললো, উনি ঘরে ছিলেন না আমিই ত মনি-অর্ডার ফর্ম নিয়ে বসেছিলাম।

ওর মা এবার আমাকে বললেন, যখন টাকা পাঠিয়ে ঐভাবে যেতে লিখেছেন তখন বরং কদিন ঘুরেই এসো।

এবার আমি বললাম, কিন্তু এভাবে ঘন ঘন কাশী গেলে আমাকে দিয়ে কে ছেলেমেয়ে পড়াবেন ?

আলপনার মা আমাকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, সে ত ঠিক।

আলপনা এ বিষয়ে আর কোন কথা বলল না। তবে ওর গাম্ভীর্য দেখেই বুঝলাম ও একটু অসন্তুষ্ট। খাবার সময় ও কথাবার্তা ঠিকই বললো কিন্তু শুধু আমিই বুঝতে পারলাম, এই ক'দিন ও যত সহজ হয়ে আমার সঙ্গে গল্পগুজব করেছে ঠিক সে রকম সহজ হতে পারছে না। আমি সবকিছু দেখলাম, বুঝলাম কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলাম না।

সেদিন রাত্রে মেসে ফিরে এসেই দেবীকে চিঠি লিখলাম, আমি জানতাম তুমি চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই টাকা পাঠাবে। মনে মনে একথাও জানতাম তুমি শুধু কার্তিকবাবুর টাকাই পাঠাবে না ; নৃপতি যে কিছু পাবেই, তাও জানতাম। রেল ভাড়ার আশা না করলেও ফল-দুধ খাবার জন্য তুমি যে

আমাকে কিছু না পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হবে না তাও জানতাম। আমি অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটালেও আজ পর্যন্ত কারুর কাছে কোন সাহায্য চাই নি। কাকাবাবু বা কাকিমা অনেক সময় প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন কখনও কখনও স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চেয়েছেন কিন্তু আমি নিতে পারি নি। এবার যখন প্রয়োজন দেখা দিল তখন তোমাকে চিঠি লিখতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হল না। পিয়ন যখন টাকাগুলো দিল তখন হাত পেতে নিতে কোন গ্লানি বোধ করলাম না। শুধু প্রয়োজনের জন্যই তোমার কাছে টাকা চাই নি, চেয়েছি তুমি আমার পরম আপনজন বলে। এই পৃথিবীতে আমার দু-একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে কিন্তু তোমার মত আপনজন প্রাণের মানুষ ত আর কেউ নেই।

আর লিখলাম, ইদানীংকালে নানা কারণে আমি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ঠিক কর্তব্য পালন করতে পারি নি। এখন কাশী গেলে ওদের সবার কাছে আমি বড্ড ছোট হয়ে যাবো এবং ভবিষ্যতে কোনদিন ওদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। তাই এখুনি আসছি না। আমি জানি তুমি দুঃখ পেলেও আমার উপর রাগ করবে না।

সব শেষে লিখলাম, আল্পনা-কল্পনাদের বাড়িতে থাকার ব্যাপারে তোমাকে সব কিছু জানিয়েছি। এ ব্যাপারে পত্রপাঠ তোমার মতামত জানাও।

পরের দিন সকালেই সামনের আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্টাফিসের ডাকবাকসে নিজের হাতে পোস্ট করলাম। দুপুরবেলায় মেসে ফিরে এসেই দেখি চিঠি এসেছে। খামের ঠিকানা লেখা দেখেই বুঝলাম দেবীর চিঠি কিন্তু খাম খুলে দেখি পিসীর চিঠি।...এই বাঙালীটোলার একটি পরিবারের সঙ্গে আমি ক'দিনের জন্য প্রয়াগে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেই দেবীর কাছে তোর মারাত্মক অসুস্থতার খবর শুনলাম। দেবী বললো তুই অন্ন পথ্য করেছিস ও বর্তমানে ভালই আছিস কিন্তু এত বড় অসুখের সময় তুই কিভাবে মেসবাড়িতে থাকলি সেকথা ভাবতেই আমার চোখে জল আসছে। শুনেছি তোর মেসবাড়ির লোকজন অত্যন্ত ভাল ও তাঁরা সবাই তোকে অত্যন্ত সেবা-যত্ন করেছেন। বাবা বিশ্বনাথের শ্রীচরণে ওঁদের সবার মঙ্গল কামনা করি।

পিসীর চিঠি দীর্ঘ নয়। এরপর লিখছেন আজ তোর বাবা বা সোনা বউ নেই। তাদের অবর্তমানে তোর প্রতি আমার কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। তোর লেখাপড়ার ক্ষতি হবে বলে আমি এতকাল জেনেশুনেও চুপ করে বসেছিলাম কিন্তু এবার তোকে স্পষ্ট জানাচ্ছি তুই আর এভাবে একলা কলকাতায় থাকতে পারবি না। এখানে চলে আয়। যদি ছাত্র পড়াতেই হয় তাহলে এখানেও তুই অনেক ছাত্র পাবি। তাছাড়া আমাকে এভাবে একলা একলা রেখে তোর কলকাতায় থাকতে ভাল লাগে? এই বুড়ো পিসীর প্রতি কি তোর কোন দায়িত্ব নেই।

পিসীর চিঠিখানা তিন-চারবার পড়লাম তারপর চিঠিখানা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে বসে নানা কথা ভাবছিলাম। কতক্ষণ ঐভাবে বসেছিলাম

তা বলতেও পারব না। হঠাৎ কার্তিকবাবুকে দেখে চমকে উঠলাম, আপনি ?

কার চিঠি নিয়ে এত ভাবছ ?

কাশী থেকে পিসীর চিঠি এসেছে।

পিসীর কি শরীর খারাপ হয়েছে ?

না না, পিসী ভালই আছেন।

তবে ?

আমি চিঠিখানা ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, পড়ুন।

তোমার চিঠি আমার পড়া ঠিক নয়।

আমি হেসে বললাম, তাতে কিছু হবে না। তাছাড়া আপনিও আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। এই চিঠিটা পড়ে আপনার মতামত বলুন।

কার্তিকবাবু আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, নেহাত চাল-ডাল আলু-পটলের হিসেব করতে করতে চুলগুলো পাকিয়েছি। তাই বলে তোমার মত এম-এ পাশ ছেলেকে আমি কি মতামত দেব ?

ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। আপনি চিঠিটা পড়ে আপনার মতামত বলুন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উনি চিঠিটা হাতে নিতে নিতে বললেন, দাও। চিঠিটা হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে খুব মন দিয়ে চিঠিটা পড়েই বললেন পিসী ঠিক কথাই লিখছেন। শুধু ক'টা ছাত্র পড়াবার জন্য তোমার কলকাতায় পড়ে থাকার কোন মানে হয় না।

আপনি আমাকে কাশী যেতে বলেন ?

হাজার হোক এই পিসীর চাইতে কেউ তোমাকে বেশী ভালবাসেন না। তিনি যখন এমন আন্তরিকভাবে ডাকছেন তখন যাবে না কেন ?

বুড়ী পিসীর উপর নির্ভর করে দিন কাটান কি ঠিক হবে ?

কাশী গ্রাম না, সেখানেও তুমি নিশ্চয়ই দু'চারটে ছাত্র-ছাত্রী ঠিকই পেয়ে যাবে।

কিন্তু এদিকে কাকাবাবু এক ঝামেলা বাধিয়ে রেখেছেন তা জানেন ত ?

কার্তিকবাবু ভ্রু কুঁচকে একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, মাস্টারমশাই তোমার পিতৃবন্ধু। তিনি তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন কিন্তু তবু বলব তিনি তোমাকে ঠিক পরামর্শ দেন নি। তোমার ছাত্রীর বাবা মারা গিয়েছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। তাই বলে তুমি এম-এ পাশ করে কি বড়লোকের চৌকিদারী করবে ?

কার্তিকবাবু এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন। আমি বললাম, আপনার সব কথাই ঠিক কিন্তু কাকাবাবু কিছু বললে না বলতে পারি না।

আমি চাল ডাল আলু-পটলের হিসেব করেই দিন কাটাই। মেসের কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি জড়াই না। তবে তুমি ছেলের বয়সী। তোমাকে ভালবাসি বলেই আবার বলছি ছাত্রীর বাড়িতে থাকা তোমার ঠিক হবে না।

আমি একটু হেসে বললাম, এখন যদি ও বাড়িতে না থাকি তাহলে কাকা-বাবুর কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।

তোমার কাছে কাকাবাবু বড় নাকি পিসী?

নিঃসন্দেহে পিসী।

তাহলে আবার দ্বিধা কি? কার্তিকবাবুর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি চলে যাও। মাস্টারমশাই এলে বলে দেব হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে চলে গেছে।

আমি এক মুহূর্তের জন্য একটু ভেবেই বললাম, ঠিক আছে তাই হবে। তবে এ মাস ত প্রায় শেষ হয়ে এলো। ও মাসের শুরুতে মাইনেগুলো পেয়েই কাশীবাসী হচ্ছি।

কার্তিকবাবু খুশীর হাসি হেসে বললেন, আমি বলছি পিসীর মত স্নেহশীলা মহিলার কাছে গেলে তোমার কোন অকল্যাণ হতে পারে না।

ঠিক বলেছেন।

কার্তিকবাবু আমার ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললেন, অনেক বেলা হয়ে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।

হ্যাঁ, আসছি।

সেদিন সন্ধ্যায় ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়েই মেসে ফিরলাম না। ইচ্ছা করল না। কিছুক্ষণ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলাম। বেশীক্ষণ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে ভাল লাগল না। ক্লান্ত বোধ করলাম। একটু বসব বলে কলেজ স্কোয়ারে গেলাম কিন্তু ভীড় দেখে বেরিয়ে এলাম। ট্রাম রাস্তা পার হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের গেট দিয়ে সোজা বেকার ল্যাবরেটরীর মাঠে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আজ কি তিথি জানি না। দূরের আকাশে অনেক তারা। এক কোণায় এক টুকরো চাঁদ। শুয়ে শুয়ে ওদের দেখছিলাম আর ভাবছিলাম নিজের কথা। নানা কথা। আমি জানি পিসীর চাইতে আমাকে কেউ বেশী ভালবাসে না। পিসীর ডাক আমি অগ্রাহ্য করতে পারব না। আমি যাব। নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু...

বেকার ল্যাবরেটরীর মাঠে শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেও মুহূর্তের জন্য চাঁদ-তারা আমার দৃষ্টির বাইরে লুকিয়ে পড়ল। মনে পড়ল দেবীর কথা। আমি পিসীর কাছে থাকলে ও যে কি অসম্ভব খুশী হবে তা আমি জানি। জানি ভালবাসায় ও আমাকে ভরিয়ে দেবে কিন্তু...

ভাবতে গিয়েই থমকে দাঁড়াই। ভাবি আমি ওকে কি দেব? শুধু নীরব

ভালবাসা ? একফোঁটা চোখের জল ? একটু সান্নিধ্য ? কিন্তু তাতে কি ওর মন ভরবে ? ওর প্রাণের শান্তি হবে ? ওর মনের আগুন দেহের অতৃপ্তি দূর হবে ?

না, হতে পারে না। অসম্ভব। সমাজ সংস্কারের অনুশাসনকে ভুলে ও যদি ধাপে ধাপে আমার কাছে এগিয়ে আসে ? অথবা আমিই যদি ওর বৈধব্যের কারাগার ভেঙে…

ভাবতে গিয়েই মাথাটা ঘুরে উঠল। চোখে অন্ধকার দেখলাম। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করেই শুয়ে রইলাম। তারপর হঠাৎ মনে হল দেবী যদি বিদ্রোহ করতে চায় ? যদি বলে, দীপ, চলো আমরা বাঙালীটোলার এই অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে পড়ি। যদি প্রশ্ন করে, আচ্ছা দীপ মানুষ বড় নাকি সংস্কার বড় ? মানুষের জন্য সমাজ নাকি সমাজের জন্য মানুষ ? আমি কি উত্তর দেব ? আমি কি বলতে পারব দেবী মানুষের চাইতে বড় কিছু নেই। আগে মানুষ তারপর সমাজ সংসার। আমি কি ঐ জমাট বাঁধা অন্ধকার আর কুসংস্কার থেকে ওকে টেনে আনন্দময় জীবনের রূপ দেখাতে পারব ? নাকি আমি আমার বাবা-জ্যাঠার মত অচলায়তনের নির্মম অনুশাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করব ?

হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি টুকরো টুকরো কালো মেঘ আনাগোনা শুরু করেছে। কখনো চাঁদ কখনো কিছু তাবা কালো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই একটা দমকা হাওয়া এলো। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসতেই দেখি আসন্ন ঝড়ের আশংকায় মানুষ ছুটোছুটি শুরু করেছে। আমিও আর বসে রইলাম না। মেসের দিকে পা বাড়ালাম।

মেসে ঢুকতেই কার্তিকবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আজ এত দেরী করলে ?

একটু কাজ ছিল।

তোমার কাকাবাবু এসেছিলেন।

কিছু বলে গিয়েছেন ?

না।

আমি আর দাঁড়ালাম না। নিজের ঘরে গেলাম। একটু বিশ্রাম করেই বাথরুমে গেলাম। তারপর খেয়ে নিলাম। নিজের ঘরে এলাম কিন্তু শুয়ে পড়লাম না। চিঠি লিখতে বসলাম। পিসীকে লিখলাম কাকাবাবুর জন্য একটা বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি কিন্তু তোমাকে দুঃখ দিয়ে কাকাবাবুকে খুশী করা সম্ভব নয়। আমাদের মেসের কার্তিকবাবুও বললেন তোমার কাছে চলে যেতে। তাই ঠিক করেছি তোমার কাছেই থাকব। আর এভাবে একলা একলা থাকতে সত্যি ভাল লাগছে না। সামনের মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহেই আসছি। আসার আগে চিঠি দেব। দিদি আর দেবীকেও আমার আসার খবর জানিও।

পরের দিন সকালে সামনের আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্টাফিসে চিঠিটা পোস্ট

করার পরই মনে হল এই বয়সে বুড়ী পিসীর গলগ্রহ হবো? পিসী হাসিমুখে খুশী মনেই আমাকে দুবেলা অন্ন দেবে ঠিকই, কিন্তু পিসীর প্রতি আমারও ত কিছু কর্তব্য আছে। মনে হল একটা চাকরি পেলে বড় ভাল হতো। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে কত দরখাস্ত পাঠালাম, কয়েকটা জায়গায় ইন্টারভিউও দিলাম কিন্তু এমনই কপাল যে এখও পর্যন্ত একটা চাকরি পেলাম না। চাকরি পেলে কাকাবাবুকে বলতে পারতাম, কাকাবাবু যখন চাকরি পেয়ে গেছি তখন আর পরের বাড়ি থকব না। সারা জীবন পরের বাড়িতে কাটিয়ে আর পরের বাড়িতে থাকতে মন চায় না। কাকাবাবু কিছু বললেই বলতুম তাছাড়া আমি আর ছাত্র-ছাত্রী পড়াব না। আমি একা মানুষ। আমার ত আর বেশী টাকার দরকার নেই। চাকরি করে যা পাব তা দিয়ে আমার বেশ ভালভাবেই চলে যাবে।

দিন দুই পরে দুপুরে মেসে ফিরতেই কার্তিকবাবু বললেন, তোমার একটা রেজেস্ট্রী চিঠি এসেছে।

রেজেস্ট্রী চিঠি।

হ্যাঁ।

কোথায়?

নৃপতি তোমার ঘরে রেখে এসেছে।

প্রায় লাফ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘরে এসে দেখি ন্যাশনাল কেমিক্যাল কোম্পানীর ডিপো ম্যানেজারের চাকরির এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসেছে। আনন্দের আতিশয্যে পুরো চিঠিটা পড়ার আগেই দৌড়ে নীচে গিয়ে কার্তিক-বাবুকে বললাম, চাকরি পেয়েছি।

কোথায়?

ন্যাশনাল কেমিক্যাল কোম্পানীর ডিপো ম্যানেজারের···

কলকাতাতেই?

দাঁড়ান দাঁড়ান পড়ছি।

এখনও পুরো চিঠিটা পড় নি?

না পড়ছি।

ঝড়ের বেগে চিঠিটার উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললাম, ওরা পাটনায় নতুন অফিস করছেন। আমাকে পাটনাতেই কাজ করতে হবে। মাইনে তিনশ' পঁচিশ।

খুব আনন্দের কথা। কবে জয়েন করতে হবে?

সামনের মাসের ষোলই পাটনা অফিসের এরিয়া ম্যানেজারের কাছে হাজিরা দিতে হবে।

কার্তিকবাবু টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা পোস্টকার্ড বের করে আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, এক্ষুণি পিসীকে খবরটা জানিয়ে দাও। তিনি খুব খুশী হবেন।

আপনি পোস্টকার্ড রেখে দিন। আমি এখনই পোস্ট অফিসে যাচ্ছি।

পোস্ট অফিসে গিয়ে শুধু পিসীকে নয়; দিদি আর দেবীকেও চাকরি পাবার খবর জানিয়ে দিলাম। তিনটে চিঠি ডাক বাকসে ফেলে রাস্তায় পা দিতেই মনে হল আমি যেন হাওয়ায় উড়ছি। সেই ভোরবেলায় দুখানা টোস্ট আর চা খেয়ে ছাত্র-ছাত্রী পড়াতে বেরিয়েছি আর এখন সওয়া বারোটা বাজে কিন্তু তবু মনে হচ্ছে না খিদে পেয়েছে। মনে হচ্ছে না আমি আর কারুর ব্যক্তিগত কৃপা চাইছি। মনে হচ্ছে আমিও অন্য দশজনের একজন। রাস্তা পার হতে গিয়েই পান-সিগারেটের দোকানটা নজরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা বের করে পাঁচটা দামী সিগারেট কিনে একটা ধরালাম। ঐ দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই পর পর দু চারটে টান দিয়ে আস্তে আস্তে মেসের দিকে পা বাড়ালাম।

মেসে ফিরে এসেও সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমে গেলাম না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ন্যাশনাল কেমিক্যাল কোম্পানীর ঐ চিঠিটা তিন-চারবার পড়লাম। তারপর আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিতেই হাসতে হাসতে নৃপতি ঘরে ঢুকল।

কিরে হাসছিস কেন ?

নৃপতি হাসতে হাসতেই আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আজ খাওয়া-দাওয়া করবেন না ?

আজ সত্যি খিদে পাচ্ছে না।

অনেক বেলা হয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে নিন।

এই সিগারেটটা খেয়েই উঠছি।

সত্যি সিগারেটটা খেয়েই উঠে পড়লাম। স্নান করলাম। খেয়ে নিলাম। রোজ দুপুরে এই সময় খবরের কাগজ পড়তে পড়তে একটু ঘুমোই। আজ কিছুতেই ঘুম এলো না। একবার মনে হল কাকাবাবুকে খবরটা দিয়ে আসি কিন্তু দুপুরে রোদ্দুরে কিছুতেই বেরুতে ইচ্ছা করল না। শুয়ে শুয়ে চাকরির কথাই ভাবছিলাম। পাটনা যাবার আগে গোটা দুই প্যান্ট-বুশ শার্ট তৈরী করতে হবে। বোধহয় একটা বড় স্যুটকেসও কিনতে হবে। বিছানার জন্য একটা হোল্ডঅলও কিনব। মনে মনে ঠিক করলাম সামনের মাসের এক তারিখ থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ান বন্ধ করব। তারপর তিন-চার তারিখে কাশী চলে যাব। দিন দশেক ওখানে কাটিয়ে পাটনা থেকে মোগলসরাই বোধহয় তিন-চার ঘণ্টার রাস্তা। মোগলসরাই থেকে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই গোধুলিয়ার মোড়ে পৌঁছে যাব। দু'দিন ছুটি পেলেই কাশী ছুটব।

এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা টের পাই নি। নৃপতি চা এনে যখন ডেকে দিল তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। বেরুতে ইচ্ছা করছিল না কিন্তু তবু বেরুতেই হল। মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম অরে ত মাত্র চার-পাঁচ দিন। পটুয়াটোলার ছাত্রকে পড়িয়ে কল্পনার ওখানে পৌঁছতে একটু দেরীই হয়ে গেল। ঠিক করেছিলাম ওকে পড়াবার পর ওর মাকে পাটনা চলে যাবার খবর দেব কিন্তু তা হল না। বারান্দা পার হয়ে পড়ার ঘরে ঢোকার পথেই আলপনা হাসতে হাসতে বললো, আপনার দেরী

দেখে ভাবলাম বোধহয় বেনারস চলে গিয়েছেন।

না যাই নি তবে ক'দিন পরেই যাবো।

কবে যাচ্ছেন ?

বোধহয় তিন-চার তারিখে।

কবে আবার ফিরবেন ?

কলকাতা ফিরব না। ওখান থেকে পাটনা চলে যাবো।

পাটনা ?

হ্যাঁ।

কেন ?

আমি পাটনায় চাকরি পেয়েছি।

তাই নাকি ?

কল্পনা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, মা প্রদীপদা পাটনায় চাকরি পেয়েছেন।

আমি কল্পনার গাল টিপে আদর করে বললাম, তোমার মাকে চিৎকার করে বলার মত চাকরি আমি পাই নি।

আলপনা বললো, আজকালকার দিনে চাকরি পাওয়াই বড় কথা।

আমি জবাব দেবার আগেই ওদের মা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি চাকরি পেয়েছে ?

হ্যাঁ।

পাটনায় ?

হ্যাঁ।

খুব ভাল চাকরি বুঝি ?

আমি হেসে বললাম, আজকালকার দিনে মাইনে পেলে সব চাকরিই ভাল।

তবুও কলকাতা ছেড়ে যখন যাবে তখন নিশ্চয়ই···

আমি ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, ন্যাশনাল কেমিক্যাল কোম্পানীর ডিপো ম্যানেজারের কাজ পেয়েছি।

তাহলে ত নিশ্চয়ই পাঁচ-ছ'শ মাইনে হবে।

আমি একটু জোরে হেসে উঠে বললাম, ওর প্রায় অর্ধেক। এখন তিনশ' পঁচিশ পাব।

উনি বিস্মিত হয়ে বললেন, মোটে তিনশ' পঁচিশ ?

মোটে বলছেন কেন ? ঐ টাকায় ত আমি রাজার হালে থাকব।

কিন্তু আজ বাদে কাল যখন বিয়ে করবে ? দু-এক বছর পরে বছর একটি বাচ্চা···

আমি লজ্জায় মুখ নীচু করেই মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, বিয়ে করব না।

এবার উনি হেসে বললেন, আজ না করলেও কাল ত বিয়ে করবে।

এবার আলপনা ওর মাকে বললো, তুমি কি এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ওর বিয়ে দেবে?

ওর মা বললেন, দ্যাখো প্রদীপ, এই সামান্য মাইনের চাকরির জন্য তুমি কলকাতা ছেড়ে যেও না। তুমি যদি আমাদের বিষয়-সম্পত্তির কাজকর্ম দেখাশুনা করো তাহলে আমিই তোমাকে এর বেশী মাইনে দেব।

কথাটা শুনেই আমার সারা শরীর জ্বলে উঠল। খুব সংযত হয়ে শুধু বললাম, আমি ওদের চিঠি দিয়ে দিয়েছি।

সে না হয় আরেকটা চিঠি দিয়ে দেবে।

আলপনা হঠাৎ বলে উঠল, তুমি কি ভেবেছ বলো ত মা! একজন এম-এ পাশ যুবক তোমার বাড়ির গোমস্তার কাজ করবে?

ওর মা বেশ রাগ করেই বললেন, তুই চুপ কর। সব ব্যাপারে পাকামো করবি না।

আমি কল্পনাকে বললাম, পড়তে বসো। আমি আসছি। আমি এবার ওর মাকে বললাম, কল্পনার জন্য একজন নতুন মাস্টার ঠিক করবেন। আমি পয়লা তারিখ থেকে আর আসতে পারব না।

মনটা একটু বেসুরো হয়ে গেলেও কল্পনাকে পড়াচ্ছিলাম। দশ-পনের মিনিট পরে আলপনা এক কাপ চা টেবিলের উপর রেখে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কবে সিনেমা দেখাচ্ছেন?

সিনেমা?

চোখ দুটো বড় বড় করে মিট-মিট করে হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ। সিনেমা দেখাবার পর ভাল রেস্টুরেন্টে কবিরাজী কাটলেট খাওয়াবেন।

হঠাৎ?

তারপর জোর করে একটা স্ট্রবেরি…

কিন্তু কেন?

এবার মাথা দুলিয়ে বললো, চাকরি পেয়েও…

হা ভগবান! এটা কোন চাকরি পাওয়া হল?

মার উপর রাগ করে আমাকে কেন চিমটি কেটে কথা বলছেন?

আমি কারুর ওপরই রাগ করিনি।

চা খেতে খেতে কথা বলুন।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতেই কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, প্রদীপদা, আপনি সত্যি চলে যাবেন?

আমি ওর মাথায় হাত দিতে দিতে বললাম, কি করব বল। চাকরি যখন পেয়েছি তখন যেতেই হবে।

আপনি আর আমাদের এখানে আসবেন না ?

নিশ্চয়ই আসব। কলকাতায় এলেই তোমার সঙ্গে দেখা করব।

আলপনা সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমার সঙ্গে দেখা করবেন না ?

আমি হাসি। বলি, আমি পাটনা থেকে কলকাতা আসার আগেই হয়ত কল্পনার জামাইবাবুর সংসারে···

আমি কথাটা শেষ করার আগেই কল্পনা হাসতে হাসতে বললো, সত্যি প্রদীপদা, মা সেদিনই দাদুকে দিদির কথা বলছিলেন।

আমি চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়েই বললাম, কাকাবাবু যখন কেস টেক্-আপ করেছেন তখন আমি আর কবিরাজী কাটলেট খাওয়াবারও সময় পাচ্ছি না।

আলপনা একটু গম্ভীর হয়ে বললো, ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। বলুন, কবে সিনেমা দেখাচ্ছেন ?

সত্যি সিনেমা দেখবেন ?

তবে কি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি ?

কিন্তু ঠাকুর-দেবতার কোন বই চলছে কি ?

আমার কথা শুনে ওরা দু'বোন হেসে উঠল। আলপনা জিজ্ঞাসা করল, আমি কি ঠাকুমা-দিদিমা হয়ে গেছি যে ঠাকুর-দেবতার বই দেখব ?

তবে কি বই দেখবেন ?

চৌরঙ্গীপাড়ার কোন হলে···

না, না, ওসব হলে আপনাকে সিনেমা দেখাতে পারব না।

কেন ?

ওসব হলে বড্ড অসভ্য বই দেখায়।

আপনি কি তবে আমাদের ভক্ত তুলসীদাস দেখাতে চান ?

ঐ রকম বই হলেই খুব ভাল হয়।

থাক। আপনাকে সিনেমা দেখাতে হবে না।

আলপনা আর দাঁড়াল না। চলে গেল। আমি আবার কল্পনার হোম-টাসকের খাতা দেখতে শুরু করলাম।

পড়ান প্রায় শেষ হয়ে গেছে এমন সময় আলপনা কচুরি আর আলুর দমের একটা প্লেট আমার সামনে রেখে বললো, মা পাঠিয়ে দিলেন।

কল্পনা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বললো, এই দিদি, আজ কচুরি হয়েছে ?

আলপনার জবাবের অপেক্ষা না করেই ও আমার থেকে দুটি নিয়েই দৌড়ল।

আমি কচুরির প্লেটের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে আলপনাকে বললাম, খিদে থাকলে নিশ্চয়ই খেতাম কিন্তু আজ পারব না।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ও বললো, ছোট ছোট এই ক'টা কচুরি খেলে···

অনেক ত খেয়েছি ; আর কেন ?

আমি আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম।

রাস্তায় বেরিয়েই পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম সিগারেটের প্যাকেটে একটা সিগারেট আছে। সামনের একটা পান-সিগারেটের দোকানের দড়ির আগুনে সিগারেটটা ধরিয়ে টানতে টানতে মেসের দিকে হাঁটছিলাম। ভাবছিলাম কল্পনাদের বাড়ির কথা। ওরা নিঃসন্দেহে ধনী। ওর মা কি শুধু অনুকম্পা দেখিয়েই আমাকে জয় করতে চান ? আমার কি কোন মর্যাদা নেই ? সিগারেট টানতে টানতে হাঁটছি আর ভাবছি। মনে মনে ঠিক করলাম, অসুস্থতার জন্য যখন কামাই করেছি তখন এ মাসের পুরো মাইনে নেব না।

মেসে ফিরতে গিয়েও ফিরলাম না। কাকাবাবুর বাড়ি গেলাম কিন্তু দেখা হল না। বুড়ী ঝি বললো, কালীঘাটে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছেন। ফিরতে রাত হবে। মনে মনে ভাবলাম, ভালই হল। উনি হয়ত অনেক কিছু বুঝাতেন। তার চাইতে আমি আমার কথা জানিয়ে যাই। কাকাবাবুকে একটা চিঠি লিখে জানালাম, আপনাদের আশীর্বাদে ন্যাশনাল কেমিক্যাল কোম্পানীর পাটনা অফিসে ডিপো ম্যানেজারের চাকরি পেয়েছি। শুরুতে তিনশ' পঁচিশ পাব। আগামী ১৭ই পাটনায় জয়েন করতে হবে। আমি ১লা থেকে আর ছাত্রছাত্রী পড়াব না। তিন-চার তারিখে কাশী যাচ্ছি। তারপর ওখান থেকে পাটনা। কলকাতা ছাড়ার আগে নিশ্চয়ই দেখা করব। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গোলামী করতে হবে না ভেবে খুব ভাল লাগছে। কল্পনার মাকে জানিয়েছি ১লা থেকে আসব না এবং নতুন মাস্টার ঠিক করতে।

শেষে লিখলাম, কলকাতা ছাড়ার আগের ক'টা দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকব। আপনি মেসে গেলে হয়ত দেখা পাবেন না।

পরের দিন দুপুরে মেসে ফিরে দেখি কাকাবাবু বসে আছেন। একটু গম্ভীর মনে হল। আমি তাড়াতাড়ি ওঁকে প্রণাম করেই জিজ্ঞাসা করলাম, চিঠি পেয়েছিলেন ?

হ্যাঁ পেয়েছিলাম।

চাকরিটা পেয়ে বেঁচে গেলাম।

কাকাবাবু একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, চাকরি হিসেবে মন্দ না কিন্তু তুই ত এখনই প্রায় তিনশ' পাচ্ছিস।

চার বাড়ি থেকে মোট আড়াইশ' পাচ্ছি।

একটু চেষ্টা-চরিত্র করলে হয়ত এখানেই একটা চাকরি পেয়ে যেতি।

এতকাল চেষ্টা করে ত পেলাম না।

ভাবছি কলকাতা ছেড়ে যাওয়া কি তোর ঠিক হবে ?

মন আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, কলকাতায় আমার কে আছে যে এখানেই থাকতে হবে ? তাছাড়া এ চাকরি না পেলেও আমি এখানে থাকতাম না।

কোথায় যেতি ?

কাশীতে। পিসীর কাছে।

ক'দিন আর পিসীর কাছে থাকতে পারতি ?

আমাকে খাওয়ান-পরানর মত ক্ষমতা ও মন—দুইই পিসীর আছে। তাছাড়া কাশীও কম বড় শহর না। ওখানেও নিশ্চয়ই দু'তিনটে ছাত্রছাত্রী পেয়ে যেতাম।

কাকাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর বললেন, তোর সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা ছিল।

বলুন।

না, না, এখন তুই ক্লান্ত। পরে এক সময়…

এই ক'দিন ত আমি খুবই ব্যস্ত থাকব। তাই এখনই বলুন না কি বলতে চান।

বলব ?

বলুন।

কাকাবাবু আমাকে পাশে বসিয়ে সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিতে দিতে বললেন, তোর বাবা আর আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। তাই তোকে নিজের ছেলের মতই দেখি।

সে কথা আর কেউ না জানুক, আমি জানি।

তোর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে আমি মনে মনে একটা কথা ভেবেছিলাম কিন্তু…

আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভেবেছেন কাকাবাবু ?

কাকাবাবু আমার একটা হাত নিজের দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে আমার দিকে প্রায় অসহায়ের মত তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি বলব ?

কেন বলবেন না ? আপনার যা খুশী তাই আমাকে বলতে পারেন।

কাকাবাবু মুখ নীচু করে আবার একটু ভাবলেন। তারপর প্রায় আপন মনেই বললেন, ভেবেছিলাম একটা ভাল বংশের একটা ভাল মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে তোকে সংসারী করে দেব। কাকাবাবু হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, সবাই জানে তুই আমার পুত্রতুল্য। তাই এক জায়গায় মোটামুটি কথাও দিয়ে দিয়েছি।

কাকাবাবুর কথা শুনে আমি রাগে ও দুঃখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার বাবা-মা নেই বলে কি আমার ব্যক্তিগত কোন সত্তাই নেই ? আমাকে স্নেহ করেন বলে কি আমি ক্রীতদাস হয়ে গেছি। আমার বিয়ের ব্যাপারে উনি কথা দিয়ে দিলেন অথচ একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন না ? মনের মধ্যে হাজার প্রশ্ন তোলপাড় শুরু করল। ভাবছি কাকাবাবুকে কি বলব। কি করে বলব।

জানিস প্রদীপ, ওদেরও তোকে খুব পছন্দ।

কাকাবাবুর কথা শুনে আমার সারা শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল। আমি আর এক মুহূর্ত দেরী না করে বললাম, কাকাবাবু, বোধ-

হয় বিয়ে আমি করব না। করতে পারব না। আর যদিও কোন কারণে বিয়ে করতেই হয় তাহলে অত দাম্ভিক মহিলার জামাই নিশ্চয়ই হবো না।

কিন্তু প্রদীপ ও তোকে অত্যন্ত স্নেহ করে।

সঙ্গে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় অনুকম্পা মিশ্রিত থাকে।

পরিস্থিতিটাকে একটু সহজ করার জন্য উনি একটু হেসে বললেন, তুই ওকে ঠিক বুঝতে পারিস নি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, কাকাবাবু, এবার আমি খাওয়া-দাওয়া করে বেরুবো।

তুই আজ রাত্রে একবার আসবি ?

চেষ্টা করব।

আজ না হলে কাল আয়।

দেখি।

কাকাবাবু আর কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেও সব সময় কাকাবাবুর বিচিত্র আচরণের কথাই শুধু মনে পড়ছিল। ভাবছিলাম, ওঁর এত আগ্রহ কেন ? আগে ভেবেছিলাম কল্পনাকে পড়াতে যাব না কিন্তু পটুয়াটোলার ছাত্রকে পড়িয়ে বেরুতেই মনে হল কল্পনা আমার জন্য বসে আছে। চলে গেলাম। অন্য দিনের মত পড়ালাম। আলপনা এক কাপ চা দিল। খেলাম কিন্তু বিশেষ কাথাবার্তা বললাম না।

পরের দিন সকালে ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে মেসে ফিরতেই কার্তিকবাবু বললেন, এখুনি দিদি এলো।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। নৃপতি ওকে তোমার ঘরে বসিয়ে বোধহয় গল্প করছে।

আমি উপরে উঠতেই নৃপতি এক গাল হাসি হেসে ঘোষণা করল, দাদাবাবু এসে গেছেন।

ঘরে ঢোকার আগেই আমি ওকে বললাম, তাতাতাড়ি দুটো চা দুটো কেক নিয়ে আয়।

নৃপতি চলে গেল। আমি ঘরে ঢুকেই হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি কিছুই জানেন না ?

সব জানি বলেই আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

সব জানেন ?

আলপনা হাসতে হাসতে বললো, সব জানি মানে আপনার বাতিল করে দেওয়া পর্যন্ত জানি। তারপর আর কিছু হয়েছে নাকি ?

না।

আমি ত ভেবেছিলাম কাল আপনি পড়াতে আসবেন না।

আমিও একবার ভেবেছিলাম, যাব না।

তারপর গেলেন কেন ?

ভাবলাম কল্পনার প্রতি আমার কিছু কর্তব্য আছে।

আজ আসছেন ?

আসব। আগামীকালও যাব।

বেনারস যাচ্ছেন কবে ?

আগে ভেবেছিলাম তিন-চার তারিখে যাব কিন্তু এখন ভাবছি পয়লা-দোসরাই চলে যাব।

আমাকে সিনেমা দেখাবেন না ?

আমার সঙ্গে সিনেমা গেলে আপনার মা আপনাকে মেরে ফেলবেন।

চিরকাল দাদু-দিদার কাছে থেকেছি বলে মাকে ভয় করতে শিখি নি।

নৃপতি চা আর কেক আনল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথাও কাজে যাচ্ছেন ?

আপনার কাছেই এসেছি।

কোন কাজ আছে ?

না।

কিছু বলবেন ?

না।

তবে ?

মুহূর্তের জন্য আলপনা কি যেন ভাবল, তারপর বললো, হঠাৎ আপনার কথা মনে হল, তাই চলে এলাম।

কয়েক মিনিট দু'জনেই চুপ করে বসে রইলাম। তারপর আমি বললাম, মনে হচ্ছে আপনি কিছু বলতে এসেছেন কিন্তু বলছেন না।

ও হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

আবার একটু নীরবতা। তারপর আবার আমি বললাম, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আপনি যা ইচ্ছে বলতে পারেন।

সত্যি ? কোন দ্বিধা করব না ?

না।

ও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, আগে মনে হতো আপনার কোন ব্যক্তিত্ব নেই কিন্তু এখন দেখছি সত্যি আপনার ব্যক্তিত্ব আছে।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, তাই নাকি ?

একশ' বার। ও একটু চুপ করে থেকে আমাকে জিজ্ঞাসা, করল, আপনার কাকাবাবু এ ব্যাপারে এত উৎসাহী কেন, তা জানেন ?

না।

সময়ে-অসময়ে মা আপনার কাকাবাবুকে টাকা ধার দিয়েছেন। আস্তে আস্তে অনেক টাকা হয়েছে। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে পারলে বোধহয় মা আর টাকাটা ফেরত নেবেন না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

কি আশ্চর্য!

আপনি আপনার কাকাবাবুকে যত ভক্তিই করুন, আমি ওকে একটুও সহ্য করতে পারি না।

আমি ত এসব জানতাম না তাই···

যাই হোক কবে কোন ট্রেনে বেনারস যাচ্ছেন, তা জানতে পারব কি?

কাল জানাব।

জানাবেন।

ও উঠে দাঁড়াতেই জিজ্ঞাসা করলাম, এখনই যাবেন?

যাব না?

আর একটু বসুন।

আজ চলি। কাল এই রকম সময় আবার আসব।

আমি কিছু বললাম না। আলপনা নিঃশব্দে মুখ নীচু করে বেরিয়ে যেতেই মনে হল, চিৎকার করে বলি, আলপনা, আর একটু বসো কিন্তু পারলাম না।

আলপনা চলে যাবার পর সঙ্গে সঙ্গেই মনটা বেদনায় ভরে গেল। কিন্তু কেন? কেন এই ব্যথা? এই বেদনা? কেন এই বিষণ্ণতা?

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে বসে ভাবলাম। সঠিক কোন কারণ খুঁজে পেলাম না, কোন যুক্তি আবিষ্কার করতে পারলাম না। বার বার শুধু মনে হলো আলপনা আমার শুভাকাঙ্ক্ষিনী। সে আমার কল্যাণ কামনা করে, শ্রীবৃদ্ধি চায়। ভাবতে ভাবতে মনে হল, বোধহয় ওকে দুঃখ দিয়েছি, আঘাত দিয়েছি। তা নয়ত ওর সেই মুখের হাসি অমন ম্লান দেখলাম কেন?

কাকাবাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ও কি দুঃখিত? নাকি অপমানিত?

কিন্তু ও নিজেও ত কাকাবাবুকে দেখতে পারে না? ও ত বার বার করে আমাকে দূরে সরে যেতে বলছে। তবে?

যত ভাবছি তত জট পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। আমি যেন কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে হল তবে কি ও মনে মনে আশা করেছিল আমি কাকাবাবুর প্রস্তাব মেনে নেব? ও কি স্বপ্ন দেখছিল···

না, না, সে অসম্ভব। ও সুন্দরী, শিক্ষিতা। ধনীর ঘরের দুলালী। আমি? জমার ঘরে শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা সার্টিফিকেট। তাছাড়া আমার ত আর কিছু নেই।

সারাটা দ‍ুপ‍ুর শ‍ুধ‍ু আলপনার কথাই ভাবলাম। একবার মনে হল হয়ত অযথাই ভাবছি। এই ভাবনা-চিন্তার কোন কারণ বা য‍ুক্তি নেই। হয়ত প্রয়োজনও নেই। কিন্তু তব‍ু না ভেবে পারলাম না।

পট‍ুয়াটোলা থেকে ছাত্র পড়িয়ে কল্পনাদের বাড়ি যেতে লজ্জায়, দ্বিধায় পা দ‍ুটো যেন চলছিল না কিন্তু তব‍ু গেলাম। না গিয়ে পারলাম না। কিন্তু কেন? বোধহয় শ‍ুধ‍ু কর্তব্যের তাগিদে নয়, হৃদয়ের তাগিদেই গেলাম। মনে হল, আর কিছ‍ু না হোক অন্তত একবার ওকে দেখতে পাব।

দরজায় কড়া নাড়তে আলপনা বা কল্পনা দরজা খ‍ুলল না। যে মহিলা ওদের বাড়িতে কাজকর্ম করেন, তিনি দরজা খ‍ুলে দিয়ে বললেন, মা দিদিদের নিয়ে একট‍ু দোকানে গিয়েছেন। এখ‍ুনি আসবেন।

আচ্ছা।

আমি সোজা কল্পনার পড়ার ঘরে চলে গেলাম। চেয়ার টেনে বসলাম। কল্পনার হোম টাস্কের খাতাটা টেনে নিয়ে দেখতে শ‍ুর‍ু করলাম। পাঁচ-দশ মিনিট পরেই ভদ্রমহিলা নিঃশব্দে আমার সামনে এক কাপ চা রেখে গেলেন। চায়ের কাপে চুম‍ুক দিতেই চমকে উঠলাম—

আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন?

হঠাৎ আলপনাকে দেখে খ‍ুশী হলেও জিজ্ঞাসা করলাম, কল্পনা আসে নি?

ওরা একট‍ু পরে আসবে।

আপনি আগে চলে এলেন কেন?

একগাদা প্যাকেট নিয়ে আর ঘ‍ুরতে পারছিলাম না বলে চলে এলাম। তাছাড়া···

ও একট‍ু থামল। আমার দিকে দেখল। বললো, তাছাড়া ভাবলাম আপনি বসে আছেন নিশ্চয়ই, তাই···

হাসতে হাসতে আমি বললাম, তাই কি ল‍ুকিয়ে ল‍ুকিয়ে দেখতে এলেন আমি কি করছি?

দ‍ুদিন পরেই ত চলে যাচ্ছেন। তব‍ু এখনও ঝগড়া করছেন?

কাল দ‍ুপ‍ুরে আসছেন?

আসব?

আপনি বলেছিলেন আসবেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

আমি বলেছি ঠিকই কিন্তু আপনি ত কিছ‍ু বলেন নি।

আমি ম‍ুখ নীচ‍ু করে বললাম, আমি অনেক কিছ‍ুই বলতে পারি না।

কী বলতে পারেন না?

যা ভাবি, যা বলতে চাই।

কেন?

সারা জীবনে ত কার‍ুর সঙ্গে মনের কথা বলি নি, তাই অভ্যাস নেই।

আমাকে কিছ‍ু বলতে চান?

অনেককেই অনেক কিছু বলতে চাই।

সেই অনেকের মধ্যে আমিও আছি?

নিশ্চয়ই।

আমার কথা শুনে আলপনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বললো, কাল দুপুরে নিশ্চয়ই আসব।

হঠাৎ অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেললাম, শুধু আপনার জন্যই কলকাতা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না।

ও সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল, কিন্তু কেন? আমি আপনার কে?

জানি না।

আর কোন কথা বলার আগেই কল্পনা আর ওর মা ফিরে এলেন। আলপনা ভেতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ কল্পনাকে পড়াবার পর ওর মা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কবে বেনারস যাবে?

হাতে কিছু কাজকর্ম আছে। সে সব শেষ হলেই চলে যাব।

কাল-পরশু যাচ্ছো কি?

কাল যাচ্ছি না। তবে পরশু যেতেও পারি।

তুমি ত ওখানে পিসীর কাছেই থাকবে?

হ্যাঁ।

ঠিকানাটা রেখে যেও। যদি আমরা এর মধ্যে কাশী যাই তাহলে…

আপনারা কাশী যাবেন?

অনেক দিন ধরেই ত যাবার ইচ্ছা। তাই ভাবছিলাম এর মধ্যে কদিনের জন্য ঘুরে আসব।

কিন্তু এখন ত কল্পনার স্কুল খোলা।

কিন্তু এর পরে গেলে ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

আমি হেসে বললাম, আমাকে আর নতুন করে দেখার কি আছে?

আর কিছু নয়। তুমি থাকলে তোমাকে নিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করা যাবে।

আমি কাশীর বিশেষ কিছু চিনি না।

তুমি যা চেনো, আমরা ত তাও চিনি না।

আমি আর কিছু বলি না।

এবার উনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আজ মাস্টার মশায়ের ওখানে যাবে?

কলকাতা ছাড়ার আগে একবার নিশ্চয়ই দেখা করব।

উনি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই একবার মনে হল, উনি আবার আলপনার সম্পর্কে কিছু বলবেন না ত? যদি বলেন, তাহলে আমি কি জবাব দেব? আবার মনে হল, না, না, ঐ বিষয়ে নিশ্চয়ই কিছু বলবেন না। হয়ত অন্য কিছু বলবেন। অথবা এ মাসের মাইনে দেবেন।

পড়ান শেষ হবার পর কল্পনাকে বললাম, মাকে বলো আমি বসে আছি।

একটু পরে কল্পনার মা এসে কয়েকটা দশ টাকার নোট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা ধর। আর একটা কথা বলব।

আমাকে আর টাকা দিতে হবে না।

উনি অবাক হয়ে বললেন, সেকি।

যে কদিন পড়িয়েছি তার চাইতে বেশী দিন ত কামাই করেছি।

তুমি ত আর ইচ্ছে করে কামাই কর নি। উনি আমার হাতের মধ্যে টাকাগুলো গুঁজে দিয়ে বললেন, আর বলছিলাম আমার উপর রাগ করো না। যদি কোন কারণে...

না, না, রাগ করবো কেন?

যদি কোন কারণে দুঃখ দিয়ে থাকি ভুলে যেও।

আপনি এসব কথা বলছেন কেন?

কেন বলছি তা ত তুমি জানো। তোমাকে ভাল লেগেছে বলেই মনে মনে অনেক কিছু ভেবেছিলাম। তাছাড়া...

আমি মুখ নীচু করে ওর কথা শুনছিলাম। হঠাৎ থামতেই আমি এক মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকালাম।

তাছাড়া তোমাকে বোধহয় আলপনার খুব পছন্দ।

ওর কথাটা শুনেই আমার মাথাটা ঘুরতে শুরু করল। মনে হল ঘরের সর্বকিছু দুলছে, কাঁপছে।

তোমাকে জোর করব না। তবে আমাদের কথাটা একটু ভেবে দেখো।

আমি কোন কথা না বলে হঠাৎ ওকে একটা প্রণাম করেই ঘর থেকে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রায় মাতালের মতো টলতে টলতে মেসে ফিরলাম। খাবার ইচ্ছা না থাকলেও খেলাম। তারপরই শুয়ে পড়লাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম এলো না। প্রায় সারা রাতই জেগে রইলাম। বোধহয় একেবারে শেষ রাত্তিরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখলাম, আমি আর আলপনা কলেজ স্কোয়ারের পুকুরে সাঁতার কাটছি। ঐ স্বপ্নটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুমুতে পারলাম না।

আজ মাসের শেষ দিন। ইচ্ছে না থাকলেও পড়াতে বেরুলাম। আজ বিদায় নেবার পালা। বিশেষ পড়ালাম না। মামুলি কিছু উপদেশ দিলাম। ওদের বাবা-মার কাছ থেকেও বিদায় নিলাম। একজন মাইনেও দিয়ে দিলেন। শিউলির বাবা বললেন, কাল তোমার মেসে মাইনে পাঠিয়ে দেব। শিউলি আমাকে প্রণাম করল। আমি আশীর্বাদ করলাম।

দায়িত্ব কর্তব্য সামাজিকতা করলাম ঠিকই কিন্তু মনে মনে সব সময় শুধু আলপনার মার কথাই মনে পড়ছিল, তোমাকে আলপনার খুব পছন্দ।

জাপানী পুতুলের মতো নির্দিষ্ট পথে মেসে ফিরে এলাম। নিজের ঘরে এলাম, বসলাম, শুয়ে পড়লাম। তাও ঐ একই চিন্তা। একই ভাবনা।

কী এত ভাবছেন ?

ভূত দেখার মতো চমকে উঠে দেখি আলপনা। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললাম, আসুন, আসুন।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে আছি জানেন ? আলপনা হাসতে হাসতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন ?

দশ-পনের মিনিট।

দশ-পনের মিনিট ?

চেয়ারে বসতে বসতে ও শুধু মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

ডাকলেন না কেন ?

এত বিভোর হয়ে ভাবছিলেন যে···

জিভ ফসকে বলে ফেললাম, আপনার কথাই ত ভাবছিলাম।

কথাটা বলেই ভীষণ লজ্জিত বোধ করলাম, কিন্তু—।

আলপনা বেশ একটু বিস্মিত হয়ে বললো, আমার কথা ভাবছিলেন ?

হ্যাঁ।

আমার এই সৌভাগ্যের কারণ ?

কেন আমাকে আরো লজ্জা দিচ্ছেন ? হঠাৎ আমি গম্ভীর হয়ে ওর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললাম, কাল আপনার মার কাছ থেকে কথাটা শোনার পর শুধু আপনার কথাই ভাবছি। সারা রাত্তির ঘুমুতে পারি নি।

সে আপনার চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি।

একেবারে শেষ রাত্তিরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু তাও এক স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল!

অত ভাববেন না!

কিন্তু না ভেবে যে পারছি না।

ভেবে আর লাভ কি ? আপনি ত আপনার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু যখন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলাম তখন ত আপনার সিদ্ধান্তের কথা জানতাম না।

কিছুক্ষণ দু'জনের কেউই কোন কথা বললাম না। চুপ করে বসে রইলাম। তারপর আলপনা বললো, আপনার জন্য বড় চিন্তা হয়।

কেন ?

আমার বয়স বা অভিজ্ঞতা বেশী না হলেও সংসার দেখে দেখেই এতগুলো বছর কাটালাম কিন্তু আপনি এ সংসারে বাস করেও সংসার দেখার সুযোগ পেলেন না।

তা ঠিক।

আপনার মতো সহজ সরল মানুষের জায়গা এ সংসার না।

তাই বুঝি আমার জন্য চিন্তা হয় ?

চিন্তা হবে না ?

কিন্তু আমার মতো একজন অতি সাধারণ ছেলেকে নিয়ে চিন্তা করা কি আপনার উচিত ?

জানি না।

আপনারা কবে কাশী যাচ্ছেন ?

ঠিক জানি না, তবে মা দু-পাঁচ দিনের মধ্যেই যেতে চান বলে মনে হয়।

আমার বুঝতে অসুবিধা হল না পিসীর দরবারে আর্জি পেশ করার জন্যই ওর মা কাশী যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওরা জেনে গেছেন এই সংসারে পিসী ছাড়া আমার কোন আপনজন নেই, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম ওরা ত জানেন না ঐ কাশীতেই আরেকটা বিধবা আছে যে হরসুন্দরীর ধর্মশালায় আমার মার বিদেহী আত্মার সামনে আমার সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। তার ভালবাসার কথা আমি কাউকে বলতে পারব না, বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমি তো জানি তার গভীরতা, আন্তরিকতা। আলপনার মতো সুন্দরী শিক্ষিতা দরদী মেয়েকে নিশ্চয়ই আমার ভাল লাগে। ওর মতো স্ত্রী পেলে আমি নিশ্চয়ই সুখী হবো কিন্তু দেবীকে প্রতারণা করে কিভাবে আমি ওকে বিয়ে করব ? না, না প্রতারণার উপর ভিত্তি করে আমি নতুন জীবন শুরু করতে পারি না।

কবে কাশী যাচ্ছেন ?

সামনের সাদা কাগজে হিজিবিজি কাটতে কাটতে বললাম, ভাবছি কাশী যাব কিনা।

তার মানে ?

ঠিক বুঝতে পারছি না কাশী যাওয়া ঠিক হবে কিনা।

আপনার পিসী, দেবী, দিদি কিভাবে আপনার পথ চেয়ে বসে রয়েছেন আর আপনি বলছেন যাব কিনা ঠিক নেই।

ওরা অত্যন্ত বেশী ভালবাসেন বলেই ত…

না না পাগলামী করবেন না। আপনি কাল-পরশু রওনা দিন।

কিন্তু আপনি জানেন না…

আমি কিছু জানতে চাই না। আমি হলে দেবীদির ঐ মনিঅর্ডার পাবার দিনই রওনা হতাম।

ওর কথা শুনে আমি একটু হাসি।

আপনি হাসছেন ? কিন্তু মনি-অর্ডার কুপনে ঐ এক লাইন লেখার মধ্যে কি অদ্ভুত আন্তরিকতা ছিল, তা ভেবে দেখেছেন কি ?

আমি কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না। শুধু বললাম, ওর আন্তরিকতার কোন তুলনা হয় না।

তবে ?

আমি আর কোন কথা বলতে পারলাম না। চুপ করে মুখ নীচু করে কাগজে হিজিবিজি কাটছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আলপনা বললো, আপনি না গেলেও আমাকে কাশী যেতেই হবে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ?

দেবীদিকে দেখতে।

কেন ?

সাদা কাগজে হিজিবিজি কেটে কি লিখেছেন জানেন ?

আমি চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি সারা কাগজে শুধু দেবীর কথা লিখেছি। নানা কথা। মনের কথা, প্রাণের প্রশ্ন। অনেক কিছু। আমি লজ্জায়, দ্বিধায়, সঙ্কোচে হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই ও হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েই আমাকে প্রণাম করে বললো, চলি।

আমি রাত্রেই বোম্বে মেলে চড়লাম কিন্তু মোগলসরাইয়ে নামলাম না। মোগলসরাই পেরিয়ে চলে গেলাম এলাহাবাদ।

একটু ঘোরাঘুরি করার পরই একটা ধর্মশালায় জায়গা পেয়ে গেলাম। প্রথম কটা দিন নিজেকে নিয়ে বেশ মেতে ছিলাম। প্রয়াগে গেলাম। স্নান করলাম। পাতালপুরীর মন্দির দেখলাম। অক্ষয় বটের নীচে বসলাম। আকবরের ফোর্ট দেখলাম। একদা যেখানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল, সেই ঐতিহাসিক জায়গায় গড়ে ওঠা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম। চলে গেলাম খসরু বাগ। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্রের এই সমাধি দেখতেই পুরো একটা দিন কেটে গেল।

শহরের যত্র-তত্র বিচরণ করে আরো কটা দিন কেটে গেল।

তারপর ?

পনেরই'এর আগে পাটনা পৌঁছবার কোন প্রয়োজন বা তাগিদ নেই কিন্তু তার ত এখনও দশ দিন দেরী। এক একটা দিন যেন এক এক যুগ মনে হচ্ছিল। আরো দশ দিন এখানে থাকার কথা ভাবতে গিয়েই গা শিউরে উঠল কিন্তু মনে মনে সংকল্প করে এসেছি কাশীতে যাব না। এলাহাবাদ থেকেই সোজা পাটনা যাব। পিসীকে আর দেবীকে একটু কাছে পাবার জন্য মনে মনে ছটফট করলেও কাশী যেতে ভয় করছে। সঙ্কোচ হচ্ছে। এতদিনে আলপনা নিশ্চয়ই মার সঙ্গে কাশী এসেছে। পিসী বা দেবীর সঙ্গেও দেখা হয়েছে। হয়ত···

ভাবতে গিয়েও আমি থমকে দাঁড়াই। হঠাৎ মনে হল কলকাতা থেকে পিসীকে, দেবীকে জানিয়েছিলাম কাশী আসছি কিন্তু তারপর কোন খবর না

দিয়ে এলাহাবাদ এসেছি। ওরা নিশ্চয়ই আমার জন্য খুব চিন্তা করছে। আলপনারা কাশী গিয়ে যখন বলবে আমি ওদের আগেই রওনা হয়েছি, তখন দুশ্চিন্তায় হয়ত পিসী ঠিক মত খাওয়া-দাওয়াও করতে পারবে না। আর দেবী? সে তার বেদনার কথা কাউকে জানাতে পারবে না। শুধু রাতের অন্ধকারে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দেবে। হয়ত হরসুন্দরী ধর্মশালার ঐ ঘরে গিয়ে…

না, না, ওদের কাউকে এভাবে যন্ত্রণা দেবার অধিকার আমার নেই। সঙ্গে সঙ্গে জামাটা চড়িয়ে পায়ে চটি দিয়েই পোস্টাপিস গেলাম। খাম কিনে এনেই চিঠি লিখতে বসলাম। পিসীকে লিখলাম, অনেক আশা করেছিলাম কটা দিন তোমাদের ওখানে কাটিয়ে পাটনায় চাকরি করতে যাব কিন্তু তা আর হল না। পারলাম না। প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদের জন্য ছটফট করছি কিন্তু তবু যেতে পারছি না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। দিদিকে বলো তিনি যেন রাগ না করেন। আর দেবীকে বলো, হরসুন্দরী ধর্মশালার ঘটনা আমি ভুলি নি, ভুলব না।

একবার মনে হল ঠিকানা দেব না। পরে মনে হল, অন্তত একটা চিঠি লেখার সুযোগ ওদের দেওয়া উচিত। তাই শেষ পর্যন্ত চিঠির উল্টো দিকে ঠিকানাটা লিখেই দিলাম।

দেরী করলাম না। চিঠিটা পোস্টাফিসের ডাকবাক্সে ফেলার জন্য তক্ষুনি বেরুলাম। চিঠিটা পোস্ট করেই খোঁজ করলাম. কাশীর চিঠি কবে পেঁছিবে। জানলাম কাল দুপুরের মধ্যে নিশ্চয়ই পেঁছিবে। মনে মনে হিসেব করে নিলাম যে পরশু বা তার পরের দিন নিশ্চয়ই একটা চিঠি আসবে। চিঠিতে কি লেখা থাকবে তা আমি জানি। জানি সে চিঠি পেয়েই আমাকে কাশী ছুটতে হবে। না গিয়ে পারব না। কিন্তু…

ঐসব কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়েছে। চৌকিদার বারান্দার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ অন্ধকার ঘরেই শুয়ে রইলাম কিন্তু তারপর ঘরের আলোটা জ্বালাবার জন্য উঠতে গিয়েই মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। তাড়াতাড়ি বিছানার উপর বসে পড়লাম। বেশীক্ষণ বসতে পারলাম না। শুয়ে পড়লাম। এতক্ষণে বুঝেছি আমার জ্বর হয়েছে। সপ্তাহ দুয়েক আগেই প্যারা-টাইফয়েড থেকে উঠেছি। এ ক'দিন ধরে এত রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করা ঠিক হয় নি। একবার মনে হল মাথা ধরার বা গা-হাত ব্যথার একটা ট্যাবলেট এনে খাই কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারলাম না। ঐ অন্ধকার ঘরে বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এই নির্জন ধর্মশালার দোতলায় একলা একলা কিভাবে যে রাত কাটিয়ে দিলাম, তা আমি জানতেই পারলাম না। পরের দিন সকালবেলায় বুড়ো চৌকিদারের কাছে শুনলাম আমি নাকি সারা রাত চিৎকার করেছি। ও তিন-চারবার আমাকে জল খাইয়ে গিয়েছে। আমি নাকি এক গেলাস দুধও খেয়েছি কিন্তু আমার কিছু মনে নেই।

সকালবেলায় চৌকিদারের কাছে এসব শুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। মনে হল, যদি আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে কে আমাকে দেখবে? কে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে? চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখান থেকে বাসে কাশী যাওয়া যায়?

বাস ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় যায় কিন্তু এই জ্বর নিয়ে তুমি যাবে কি করে?

কিন্তু ভাইসাব, যদি শরীর আরো খারাপ হয় তাহলে এখানে আমাকে কে দেখবে? এখানে ত আমার কেউ নেই।

কাশীতে কোন রিস্তেদার আছেন?

আমার সব আত্মীয়-স্বজনই কাশীতে।

তাহলে সেখানে চলে যাওয়াই ভাল কিন্তু তুমি কি যেতে পারবে?

তুমি যদি বাসে বা ট্রেনে চড়িয়ে দাও তাহলে আমি ঠিক পৌঁছে যাবো।

তোমাকে ট্রেনে বা বাসে চড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেব কিন্তু···

বুড়ো চৌকিদারের আর কোন কিন্তু আমি শুনলাম না। কোনমতে নিজের বিছানাটা বেঁধে নিয়ে আর জামা-কাপড়গুলো বাক্সে ফেলেই রওনা দিলাম। যে লোকটি আমাকে বাসে চড়িয়ে দিতে এসেছিল সে কণ্ডাক্টর ছাড়াও আশেপাশের ক'জন প্যাসেঞ্জারকে আমার অসুস্থতার কথা বলে গিয়েছিল। কিভাবে যে তিন-চার ঘণ্টা বসে ছিলাম তা জানি না। শুধু জানি অসহ্য যন্ত্রণায় সারা রাস্তা ছটফট করেছি। কাশীতে পৌঁছবার পর কণ্ডাক্টর আর দু-তিনজন প্যাসেঞ্জার আমাকে রিকশায় বসিয়ে দিলেন। গোধুলিয়ার মোড়ে পৌঁছবার পর মনে হল আর এক মুহূর্ত রিকশায় বসে থাকতে পারব না; এবার নিশ্চয়ই আমি পড়ে যাবে। একবার ভাবলাম, হরসুন্দরী ধর্মশালায় গিয়ে শুয়ে পড়ি কিন্তু না, নামলাম না। বাঙালীটোলার গলির মুখ অবধিই গেলাম। একটা কুলির মাথায় আমার বাক্স-বিছানা চাপিয়ে রিকশাওয়ালা আমাকে ধরে ধরে কোনমতে পিসীর বাড়ির দরজায় পেঁছে দিল।

আমাকে দেখেই সুধাপিসী চমকে উঠলেন, কি সর্বনাশ! তোমার গায় ত ভীষণ জ্বর।

পিসী কোথায়?

সুধাপিসী কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। এক মুহূর্তের জন্য কি ভেবে বললেন, দেবীদের বাড়ি আছেন।

সুধাপিসী বারবার বলা সত্ত্বেও আমি দাঁড়ালাম না। ঐ রিকশাওয়ালাকে সম্বল করেই দিদির বাড়ির দরজায় পৌঁছেই প্রায় অজ্ঞান হয়ে সিঁড়ির উপর বসে পড়লাম। রিকশাওয়ালার ডাকাডাকিতে দেবী নেমে এসেই একটা চিৎকার করেছিল মনে আছে কিন্তু তারপর আর কিছু মনে নেই। তবে অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে পিসী আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন।

অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙেছিল। ভীষণ পিপাসা পেয়েছিল। কে যেন আমাকে জল খাইয়ে মাথায় হাত দিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিল।

সকালবেলায় যখন চোখ মেলে তাকালাম তখন বেশ বেলা হয়েছে।

জানালার পর্দা টানা থাকলেও রৌদ্রের তেজ বুঝতে কষ্ট হলো না। দেবী আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়তেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কি খুব জ্বর হয়েছে ?

খুব জ্বর নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু এখন বেশী জ্বর নেই।

রাত্রে খুব জ্বালাতন করেছি ?

ও একটু ম্লান হাসি হেসে মাথা নেড়ে বললো, না।

কিন্তু জ্বর হলে আমি ত খুব চিৎকার করি।

কে বললো, তুমি চিৎকার করো ?

এটা কি পিসীর বাড়ি ?

না, এটা আমাদের বাড়ি।

আমি পিসীর বাড়ি যাই নি ?

এখন এত কথা বলো না। আমি মুখ ধুইয়ে দিচ্ছি। তারপর চা-বিস্কুট খেয়ে ওষুধ খেয়ে নাও।

কি ওষুধ ? আমার সঙ্গে তো কোনো ওষুধ ছিল না।

আমার কথা শুনে দেবী হাসল। বললো, না, ডাক্তারবাবু যে ওষুধ দিয়েছেন সেই ওষুধ খাবে।

দেবী দরজার কাছে গিয়ে বামুনদিদিকে ডেকে কি যেন বললো। একটু পরেই বামুন দিদি আমার মুখ ধোবার জলটল এনে দিলেন। দেবী পেস্ট দিয়ে আমার দাঁত মেজে মুখ ধুইয়ে দিল। চা-বিস্কুট খেতে খেতেই পিসী ঘরে ঢুকে দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, জ্বরটা ছেড়েছে ?

দেবী বললো, একেবারে না ছাড়লেও খুব সামান্য জ্বর আছে।

পিসী আর কোন কথা না বলে আমার মাথায় কতকগুলো ফুল-বেলপাতা ছুঁইয়ে মনে মনে অনেকক্ষণ বিড়বিড় করলেন। তারপর ফুল-বেলপাতা আমার মাথায়, কপালে, বুকে ছুঁইয়ে বালিশের তলায় রাখতে রাখতে আপন মনে বললেন, বাবা ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি ভাল করে দাও।

আমি একটু শুকনো হাসি হেসে দু'হাত দিয়ে পিসীর গলা জড়িয়ে ধরতেই ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আমারও দুটো চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। বললাম, পিসী, তোমাকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না।

আর তোকে আমি ছাড়ছি ?

দেবী হঠাৎ উঠে যেতেই আমি বললাম, পিসী, দেবী আমাকে ছেড়ে গেল কেন ?

না, না, ছেড়ে যাবে কেন ? ও ওষুধ দিতে উঠেছে।

পিসীর উৎকণ্ঠা দেবীর সেবা, ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা দেখেই বুঝলাম আমার অসুখটা বেশ কঠিন। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে থাকলে আমি কিছুই জানতে পারি না, কিন্তু জ্বর কমলেই দেখতে পাই পিসী আর দেবী আমাকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ও চিন্তিত। কোথা দিয়ে কেমন করে দিন-রাত্রি কেটে যায় তা টের পাই না। কখন ডাক্তারবাবু ইনজেকশন দিয়ে যান, তাও সব সময়

জানতে পারি না, তবে পাশ ফিরে শ‍ুতে গেলেই ব্যথা লাগে। কখনও কখনও বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে উঠি। পিসী তাড়াতাড়ি ব‍ুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করে, দেবী আস্তে আস্তে ব্যথায় জায়গা মালিশ করে দেয়। আমি আবার ঘ‍ুমিয়ে পড়ি।

দিনে বা রাত্রে শরীর একট‍ু ভাল লাগলে আমি কত কথা বলি, পিসী দিদি কোথায় ?

উনি কলকাতায় গিয়েছেন।

কবে ফিরবেন ?

ফিরতে দেরী আছে।

হঠাৎ কলকাতায় গেলেন কেন ?

অনেককাল যান না, তাই একট‍ু ঘ‍ুরতে গিয়েছেন।

তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না ত ?

না, না, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

আমি পিসীর একটা হাত নিজের দ‍ুটো হাতের মধ্যে নিয়ে বলি, তোমার চাইতে কেউ আমাকে বেশী ভালবাসে না।

পিসী চুপ করে থাকেন।

পিসী, দেবী কোথায় ?

ও একট‍ু ঘ‍ুম‍ুচ্ছে।

আচ্ছা পিসী ও কি সারারাত জাগে ?

তুই সারারাত এত ছটফট করিস যে ওকে প্রায় সারারাতই জাগতে হয়।

আমার জন্য তোমাদের কত কষ্ট করতে হচ্ছে।

খ‍ুব কষ্ট করছি। তুই এবার চুপ কর।

রোজ বিকেলের দিকে স‍ুধা পিসী দলবল নিয়ে আমাকে দেখতে আসেন। কিছ‍ুক্ষণ আমার গায়-মাথায় হাত ব‍ুলিয়ে দেন। তারপর যাবার সময় সামান্য কিছ‍ু ফল রেখে দিয়ে বলেন, আজ চলি। কাল আবার আসব। ওরা চলে যাবার পরই পিসী আহ্নিক করতে বসেন।

দেবী আমার পাশে বসে মাথায় হাত দিতে দিতে বলে, ডাক্তারবাব‍ু বলেছেন আর তিন-চারদিনের মধ্যেই তুমি ভাল হয়ে যাবে।

না, না, টাইফয়েড কখনও এত তাড়াতাড়ি সারে না। তোমার কপালে আরও কষ্ট আছে।

কে বলল আমার কপালে আরও কষ্ট আছে ?

আমি বলছি।

কেন, তুমি ব‍ুঝি আবার পালিয়ে গিয়ে এলাহাবাদে···

সত্যি ভেবেছিলাম পালিয়ে যাব কিন্তু ভগবান ত তোমার কাছেই ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

কোনমতে হাসি চেপে একট‍ু গম্ভীর হয়ে ও বলল, এবার তোমায় একটা রাঙা বউ এনে দেব। তাকে ছেড়ে তুমি আর···

আমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলি, আলপনারা এসেছিল বুঝি ?

কে আলপনা ?

আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলি, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করো না। আমি আলপনাকে বিয়ে করতে পারব না।

কেন, আলপনাকে তুমি ভালবাস না ?

কচু ভালবাসি।

দেবী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, তবে তুমি কাকে বিয়ে করবে ?

তোমাকে।

আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে।

তা হোক।

কেন, আলপনা কি দোষ করল ?

কিছু দোষ করে নি।

তবে তুমি ওকে বিয়ে করবে না কেন ?

তুমি জোর করে আমার বিয়ে দিতে চাও ?

বিয়ে যখন তোমাকে করতেই হবে তখন…

এইসব আজেবাজে কথা বললে আমি সত্যি এখান থেকে চলে যাব।

কোথায় যাবে ?

যেখানে ইচ্ছে চলে যাব। আর কোনদিন তুমি আমাকে দেখতেও পাবে না।

দেবী আলতো করে আমার কপালের উপর মুখখানা রেখে বলল, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। তুমি আমার কাছেই থাকবে।

সত্যি তুমি আমার কাছে থাকবে ?

সত্যি। তোমাকে ছুঁয়ে বলছি আমি তোমার কাছেই থাকব। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে দেবী বলল, এতদিন না হয় দিদি ছিলেন কিন্তু এখন ত তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

দিদি কোথায় ?

দিদি নেই।

নেই ?

না। গত পয়লা দিদি হঠাৎ হার্টফেল করে…

সে কি ?

হ্যাঁ দীপ, দিদি নেই। তাই তো তোমাকে সত্যি আর ছাড়তে পারব না।

আমি তাড়াতাড়ি ওর দুটো হাত টেনে নিয়ে আমার বুকের উপর চেপে ধরে বললাম, আমি ত তোমারই।

আমি তা জানি দীপ।

কটা দিন কোথা দিয়ে কিভাবে কেটে গেছে। কিছু জানতে পারি নি। এখনও আমি অসুস্থ হলেও আগের মতো অসুস্থ না। এখন আর আমি অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকি না। এই বিছানায় শুয়ে শুয়েই সবকিছু জানতে পারি, বুঝতে পারি। সত্যি, পিসী আর দেবী যে আমার জন্য কি করছে, তা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

সকালবেলায় যখন ঘুম ভাঙে তখন পিসীকে দেখতে পাই না। গঙ্গা স্নান, আহ্নিক, বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল দেওয়া, সব্জী বাজার করা ছাড়াও এই সকালবেলায়ই একবার নিজের বাড়ি যান। আমি চোখ মেলে তাকাতেই দেখি, দেবী আমার মাথায়, মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমাকে চোখ মেলতে দেখেই ও হেসে জিজ্ঞাসা করে, শরীর কেমন লাগছে?

ভাল।

মুখ ধোবার জল আনি?

না।

কেন?

তোমাকে একটু দেখি।

ও হেসে বলে, পরে দেখো। এখন মুখ ধুয়ে চা-বিস্কুট খাও।

ক'টা বাজে?

সাড়ে সাতটা-পোনে আটটা হবে।

পিসী ফেরেন নি?

পিসী ত একটু আগেই গেলেন।

এত দেরীতে?

উনি ত তোমার জামা-কাপড় আমাকে কাচতে দেন না। রোজ সকালে বেরুবার আগে তোমার সব ছাড়া জামা-কাপড় কাচাকুচি করে…

শুনেও লজ্জা লাগে। বলি, ছি, ছি, পিসীকে কত কষ্ট দিচ্ছি।

দেবী আমার হাত টিপে দিতে দিতে বলে, তোমার কোন কাজকেই পিসী কষ্ট বলে মনে করেন না। বরং সব সময় বলেন, তোমার জন্য কিছুই করতে পারলেন না।

তোমরা যা করছ তার কোন তুলনা হয় না।

তোমরা মানে?

পিসী আর আমার বউ।

আমি হাসি চেপে বললেও ও না হেসে পারে না। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, দীপ, কোথায় তোমার বউ?

তুমি দেখতে পাবে না।

কেন ?

একটু অসুবিধে আছে।

কিন্তু কবে তোমার বিয়ে হল, তা ত জানতে পারলাম না ?

বেশ কিছুদিন আগে হরসুন্দরী ধর্মশালায় আমার বিয়ে হয়েছে।

তাই নাকি ?

তোমার বউকে দেখতে কেমন ?

একটু মোটা, একটু চাপা রং কিন্তু আমাকে যে কী দারুণ ভালবাসে আর আমার সেবা-যত্ন করে, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

তোমার বউ তোমাকে খুব ভালবাসে ? খুব আদর করে ?

বলছি ত তুমি কল্পনা করতে পারবে না।

এমন বউ তোমাকে কে জুটিয়ে দিল ?

কোন আত্মীয়-স্বজন বা ঘটক এ বিয়ের ব্যবস্থা করে নি…

তবে ?

স্বয়ং বিধাতাপুরুষ এ বিয়ের ঘটকালি করেছেন।

এমন বিয়ের কথা ত কখনো শুনি নি।

এমন বউ অন্য কারুর অদৃষ্টে জুটলে ত শুনবে।

দেবী এবার আমার মুখের সামনে মুখ এনে মিটমিট করে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, তোমার বউ তোমাকে কি বলে ডাকে ?

তাও শুনতে চাও ?

ও মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

এমনি আমাকে দীপ বলে ডাকে ; তবে বেশী আদর করার সময় সোনা বলে ডাকে।

ও হাসতে হাসতে আমার বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে বললো, কি অসভ্য ! তার মানে তুমি জেগে থেকেও ঘুমের ভান করো ?

আমি দু'হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বলি, সত্যি, তুমি আমাকে ভরিয়ে দিচ্ছ। এই এত বড় পৃথিবীতে আর কেউ নেই যে আমাকে তোমার মতো ভালোবাসতে পারে।

ও হঠাৎ আমার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, চলো, বাথরুমে চলো।

একটু পরে।

আর এক সেকেণ্ড দেরী করবে না।

সত্যি, ও আর এক সেকেণ্ড দেরী করতে দেয় না। আমাকে টেনে তুলে দেয়। হাত ধরে বিছানা থেকে নামায়। ধরে ধরে বাথরুম পর্যন্ত নিয়ে যায়। বলে, বাথরুম করেই বেরিয়ে আসবে।

আমি এখানেই মুখ ধুয়ে নিই।

না, না, এই ঠাণ্ডা বাথরুমে এক ঘণ্টা কাটাতে হবে না।

কিচ্ছু হবে না। আমি ত চটি পায় দিয়ে আছি।

অনেক অনুরোধ-উপরোধ করার পর ও রাজী হয় কিন্তু বলে, তাহলে আমি টুল এনে দিচ্ছি। তুমি তার উপর বসে বসে মুখ ধোবে।

আমি বাথরুম করে দরজা খুলতেই দেবী টুল রেখে আমাকে বসায়। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দেয়। আমার দাঁত মাজা হতেই ও অতি সন্তর্পণে আমার হাতে জল ঢেলে দেয়। মুখ ধোয়া হতেই ও আমার হাত-মুখ-পা মুছিয়ে দেবার পর ধরে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বামুনদিদি চা-বিস্কুট এনে দেবীর হাতে দিয়ে যান।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতেই ও বললো, আবার খালি পেটে চা খাচ্ছ? আগে বিস্কুট খাও।

তুমি চা খাবে না?

হ্যাঁ আনছি।

দেবী সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে চা এনে আবার আমার পাশে বসল। চা খেতে খেতে বললে, আজ তোমাকে দেখে বেশ ভাল লাগছে।

ভাল লাগছে মানে?

মনে হচ্ছে এবার তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, আগে কি মনে হয়েছিল আমি আর সুস্থ হবো না?

তা না তবে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমার হাত থেকে খালি চায়ের কাপ নিয়ে নীচে রেখে বললো, তুমি যখন এসেছিলে তখন তোমার কত জ্বর ছিল জান?

কত?

একশ চার।

এত জ্বর ছিল?

তা না হলে এমনি এমনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলে?

তুমি আমাকে দেখেই খুব জোরে একটা চিৎকার করেছিলে, তাই না?

হ্যাঁ, কিন্তু কি বলে চিৎকার করেছিলাম জান?

না, তা মনে নেই।

বলেছিলাম দীপ অজ্ঞান হয়ে গেছে।...

পিসী জানেন না তুমি আমাকে দীপ বলে ডাকো?

তোমার-আমার কোন কথাই কাউকে বলতে পারি না। দেবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললো, সেইটাই ত আমার সব চাইতে বড় দুঃখ।

আমার কথা কি সবাইকে বলতে ইচ্ছা করে?

করবে না? দেবী হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে সামনের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে, ইচ্ছে করে সবার সামনে তোমাকে দেখিয়ে বলি, এই হচ্ছে আমার দীপ, আমার সোনা, আমার দেবতা কিন্তু সে সৌভাগ্য ত এ জীবনে হবে না।

সবাইকে দেখিয়ে বা বলে কি লাভ ? আমি ত তোমারই আছি, তোমারই থাকব।

লাভ-লোকসান জানি না ; তবে সবার সামনে মাথা উঁচু করে তোমার পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। দেবী আমার সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ইচ্ছে করে না সবাইকে বল আমি তোমার বউ ?

এবার বলব।

একটু বিচিত্র হাসি হেসে ও বললো, পারবে না দীপ, পারবে না। বড় কঠিন কাজ।

নিশ্চয়ই পারব।

কিন্তু কি পরিচয় দেবে ?

বলব, আমার বউ।

বিষণ্ণ করুণ সুরে বললো, বউ বললেই কি বউ হওয়া যায় ?

শুধু বলব কেন, তোমাকে স্ত্রীর মতো ভালবাসব, মর্যাদা দেব।

আমি জানি তুমি আমাকে সবকিছুই দেবে কিন্তু তুমি দিলেই ত আমি তোমার স্ত্রী হতে পারি না। আরো দশজনে স্বীকৃতি না দিলে ত···

আমি ওর হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ডাকলাম, দেবী।

বল।

ভয় নেই, আমি তোমাকে বিয়ে করবই।

ও একটু হেসে বললো, তুমি যে বলছিলে হরসুন্দরী ধর্মশালায় তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। তবে কি দুটো বিয়ে করবে ?

আমার বউকে আমি আবার বিয়ে করব। তাতে তোমার কি ?

দেবী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, খুব ভাল কথা। এবার উঠে বসো। ওষুধ খেতে হবে।

আমি উঠে বসতেই ও আমাকে একটা ক্যাপসুল আর একটা বড়ি দিল। জলের গেলাস মুখের কাছে ধরল। আমি ওষুধ খেলাম।

তুমি শুয়ে থাকো। আমি একটু রান্নাঘর থেকে আসছি।

আচ্ছা।

পাঁচ-দশ মিনিট পরে ও রান্নাঘর থেকে আসতেই ডাকলাম, আমার কাছে বসো।

কেন ?

কথা আছে।

ও আমার পাশে বসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, পিসী কি আজকাল তোমার কাছেই থাকেন ?

দিদি মারা যাবার দিন থেকেই আছেন।

পিসী কি এবার থেকে তোমার কাছেই থাকবেন ?

কিছু কথা হয় নি তবে পিসী আমাকে একলা ফেলে যাবে বলে মনে হয় না।

তুমি আমার সঙ্গে পাটনা যাবে না ?

তুমি পাটনা যাচ্ছ নাকি ?

চাকরি পেয়েছি, যাব না ?

কে তোমাকে যেতে দিচ্ছে ?

সেকি ? চাকরি পেয়েছি তবু যেতে দেবে না ? কি বলছ তুমি ?

আমি ঠিকই বলছি।

আমি কি তোমাদের ঘাড়ে বসে বসে দিন কাটাব ?

ঘাড়ে বসে কেন কাটাবে চেষ্টা করলে এখানেও তুমি চাকরি পেয়ে যাবে।

কিন্তু…

শুধু নিজের দিকটাই দেখছ কেন ? আমার আর পিসীর কথা ভেবে দেখেছ ? তুমি না থাকলে আমরা কিভাবে থাকব বলতে পারো !

আমি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারলাম না।

একটু চুপ করে থেকেই দেবী বললো, পিসীর শরীরও বিশেষ ভাল না। এখন একলা একলা থাকতে ভয় পান। তাই তো উনি তোমাকে কাছে রাখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু…

আমি কিছু বলার আগেই দেবী বললো, তাছাড়া এই ক'দিনের মধ্যে তুমি যেভাবে দু'বার টাইফয়েডে পড়লে, তাতে তোমাকে আর আমিও একলা ছেড়ে দিতে পারব না।

আমি ত ভেবেছিলাম আজ পাটনায় টেলিগ্রাম করে জানাব, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছি বলে কয়েকদিন পরে আসছি।

জানিয়ে দাও অসুস্থ হয়েছ কিন্তু যাবার ব্যাপারে কিছু জানাতে হবে না। দুপুরের দিকে পিসীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কবে নাগাদ পাটনা যেতে দেবে ?

না, না, বাপু, তুই আর একলা কোথাও থাকবি না।

তাই বলে কি আজকালকার বাজারে চাকরি পেয়েও চাকরি করব না ?

এখন ত তোকে কিছুতেই ছাড়ছি না।

এখন ছাড়বে না, তা ত জানি কিন্তু কবে ছাড়বে ?

তোর বিয়ে না দিয়ে আর…

আমি চমকে উঠে বললাম, তুমি কি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছ ?

পিসী হেসে বললেন, বিয়ের কথা শুনে চমকে উঠছিস কেন ? আজ না হোক কাল ত তোকে বিয়ে করতেই হবে।

আমি পিসীর দুটো হাত চেপে ধরে বললাম, পিসী আমি তোমার সব কথা শুনব কিন্তু দোহাই তোমার ! তুমি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো না।

কেন রে ?

আমি বিয়ে করতে পারব না।

সেকি ? বিয়ে করবি না কেন ?

তুমি সেকথা জানতে চেও না।

কিন্তু তোর মা-বাবা ভাই-বোন যখন নেই তখন আমার ত একটা দায়িত্ব আছে।

সব দায়িত্ব পালন করো কিন্তু বিয়ের কথা বলো না।

এমন সময় দেবী ঘরে ঢুকতেই পিসী বললেন, তুই প্রদীপের কথা শুনেছিস ?

কি কথা পিসী ?

পিসী জবাব দেবার আগেই আমি বললাম, আমি বলেছি আমি বিয়ে করতে পারব না।

পিসী বললেন, পাগলের কথা শুনেছিস ?

দেবী হাসতে হাসতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বিয়ে করবে না কেন ?

বিশেষ কারণ আছে।

নিজে কোন মেয়ে পছন্দ করেছ ?

করেছি।

পিসী হাসলেন।

দেবী হেসে জানতে চাইলে, কে সেই মেয়ে ?

বলব না।

পিসী হাসতে হাসতে দেবীকে বললেন, ও আবার নিজের মেয়ে পছন্দ করবে ? তাহলে আর দুঃখ কি ছিল।

দেবী একটু গম্ভীর হয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ঠাট্টা না করে ঠিক করে বলো কি ব্যাপার।

বলছি ত একজনকে পছন্দ করেছি কিন্তু তার সঙ্গে বিয়ে হবে না।

কেন ?

অসুবিধে আছে।

সে অসুবিধে যদি পিসী সরিয়ে দেন ?

পিসী পারবেন না।

পিসী হাসতে হাসতে দেবীকে বললেন, তুই ওর পাগলামী বুঝতে পারছিস না ?

আমি বললাম, না পিসী, পাগলামী করছি না।

দেবী বললো, তাহলে বল কাকে তুমি বিয়ে করতে চাও ?

বলছি তো তাকে বিয়ে করার অসুবিধে আছে।

কেন ?

তাকে বিয়ে করলে পিসী গলায় দাড়ি দেবে।

পিসী হাসতে হাসতে বললেন, তুই মুসলমান মেয়ে বিয়ে করলেও আমি তাকে বরণ করে ঘরে তুলতে পারব।

না পিসী পারবে না। মুশকিল আছে।

আমি হিন্দু ঘরের বিধবা ঠিকই কিন্তু যতটা গোঁড়া ভাবিস ততটা গোঁড়া আমি না।

তা আমি জানি পিসী কিন্তু যাকে আমি বিয়ে করতে চাই তার সঙ্গে তুমি আমাকে বিয়ে দিতে পারবে না।

একশবার পারব।

বোধহয় পারবে না পিসী।

ত্রিভুবনে তুই ছাড়া আর কাউকে আপন মনে হয় না। আর তোর জন্য আমি এইটুকু পারব না?

পারবে?

পারব। মেয়েটা কে, তাই বল।

আমি পিসীকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, পিসী, আমি তোমাদের দেবীকে ভালবাসি। আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।

কিছুক্ষণ পিসী কথা বলতে পারলেন না। তারপর আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, কাঁদিস না বাবা, কাঁদিস না। সারা জীবনই ত কেঁদেছিস; এখন আর কাঁদিস না।

একটু পরে আমার কান্না থামল। আমার হুঁস ফিরে এলো। লজ্জায়, দ্বিধায়, সংকোচে আমি একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারলাম না। পিসীকে ঐভাবে জড়িয়েই বসে রইলাম।

তুই দেবীকে বিয়ে করতে চাস?

জানি না।

দেবী বিয়ে করতে রাজী আছে?

জিজ্ঞাসা করি নি।

পিসী ডাকলেন, দেবী শুনে যা।

দেবী এলো না, কোন জবাবও দিল না।

পিসী আরো একটু জোরে ডাকলেন, দেবী শুনে যা মা।

তবু দেবী এলো না।

আমি বুঝলাম, দেবী আসতে পারছে না। অথবা আশেপাশে নেই।

দু-পাঁচ মিনিট পিসী আমাকে বললেন, তুই একটু শুয়ে থাক। আমি আসছি।

আমি নিঃশব্দে ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

আমি শুয়ে শুয়েই শুনলাম পিসী ডাকছেন দেবী দরজা খোল। লক্ষ্মীটি দরজা খোল। আমার কাছে লজ্জা কি? শোন কথা আছে।

কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে পিসী বললেন, আমি তোর দুঃখ বুঝি না যে আমার কাছে এত লজ্জা পাচ্ছিস। চল, ও ঘরে যাই।

ও ঘরে গিয়ে কি হবে ?

ও ঘরে ছেলেটা একলা একলা রয়েছে, চল ও ঘরে গিয়েই কথা বলি।

পিসী ওকে হাত ধরে আমার ঘরে এনে বসালেন। ওর মাথায় মুখে হাত দিয়ে আদর করে বললেন, আমি তোর আপন পিসী না বলে কি আমি তোকে ভালবাসি না ? যেমন প্রদীপকে ভালবাসি তেমন তোকেও ভালবাসি।

দেবী মুখ নীচু করে বসে রইল। কোন কথা বললো না।

এবার পিসী ওকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোরা বিয়ে করবি ?

দেবী শুধু বললো, না।

কেন, তুই প্রদীপকে ভালবাসিস না ?

না।

পিসী হেসে বললেন, ভাল না বাসলে এই এতদিন ধরে পাগলের মত দিনরাত্তির ওর সেবা করলি কেন ?

অসুস্থ হয়ে এলো কেন ?

পিসী আবার হেসে বললেন, অসুস্থ হয়ে এলো বলেই তুই অমন করে সেবা করবি ? হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলি না কেন ?

দেবী কোন কথা বলে না।

এবার পিসী ওকে আদর করতে করতে বললেন, আমি তোর সেবা-যত্ন দেখেই বুঝেছিলাম, তুই প্রদীপকে কত গভীরভাবে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসিস। কিন্তু হতভাগী তুই আমাকে আগে বলিস নি কেন ? আমি তাহলে আলপনার মাকে কথা দিতাম না।

দেবী কাঁদতে কাঁদতে বললো, না না পিসী আমি কাউকে ভালবাসি না ভালবাসতে পারি না। আমি বিধবা।

আমি পাশ ফিরে শুয়েথাকলেও আমার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

পিসী একটু গলা চড়িয়েই বললেন, একদিনের জন্যও কি স্বামীর ঘর করেছিস যে নিজেকে বিধবা বলছিস ? তুই শাঁখা-সিন্দুর পরিস না বলে কি তোর সব সাধ-আহ্লাদ মরে গেছে ? আমি তোদের বিয়ে দেব।

মিনিট খানেক পরে দেবী আমাকে ডাকল, ওঠ ওষুধ খাও।

বললাম, রেখে দাও পরে খাব।

চারটেয় খাবার কথা ; সওয়া চারটে বেজে গেছে। নাও খেয়ে নাও।

বলছি তো পরে খাব।

পিসী বললেন, প্রদীপ ওষুধ খেয়ে নে বাবা। শেষে আবার জ্বর-টরহলে···

ভয় নেই ; আমার আর কিছু হবে না।

দেবী আবার বললো, নাও ওষুধটা খেয়ে নাও।

রেখে দাও। আমি নিজেই পরে খেয়ে নেব।

বেশী দেরী করো না। ছ'টায় আবার অন্য ওষুধ খেতে হবে।

পিসী বললেন, কেন রাগ করছিস বাবা ?

বললাম, কার উপর রাগ করব ?

এই ত দেবীর উপর রাগ করে ওষুধ খাচ্ছিস না।

ও যতটুকু দয়া দেখিয়েছে, আমি তাতেই কৃতজ্ঞ। রাগ করব কোন অধিকারে ?

দেবী একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, আজ রাত্রেই কলকাতা ফিরে যাবে না ?

আজ রাত্রে যাব না ঠিকই তবে বোধহয় কালই পাটনা চলে যাব।

পিসী একটু রেগেই বললেন, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে ? তুই এই শরীর নিয়ে কোথায় যাবি ?

আমি বললাম, পিসী বিনা অধিকারে অনেক কৃপা উপভোগ করেছি। আর না তোমাদের কাশী থেকে আমার ছুটি নেবার সময় এসে গেছে।

পিসী তাড়াতাড়ি আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই এই শরীর নিয়ে চলে গেলে আমরা কি দুঃখ পাব তা ভেবে দেখেছিস ? না না বাপু তুই কোথাও যেতে পারবি না।

আমি একটু ম্লান হাসি হেসে বললাম, তোমাদের দুজনের মত আমিও এই পৃথিবীতে শুধু দুঃখ পেতেই জন্মেছি। বোঝার উপর শাকের আটির মত আমার চলে যাবার দুঃখ আমরা তিনজনে বেশ ভাগ করে নিতে পারব।

দেবী পিসীকে বললো, পিসী, তুমি রাণু মাসীর বাড়ী যাবে না ?

পিসী বললেন, হ্যাঁ এবার যাব। সুষমা এসেছে ?

দেবী বললো, না বামুনদিদি আসেন নি। বোধহয় ওঁর জ্বর বেড়েছে।

পিসী বললেন, তাই হবে। তা না হলে এতক্ষণে এসে যেতো। তাহলে তুই বরং একটু চায়ের জল স্টোভে বসিয়ে দে।

দেবী বললো, ওষুধটা খেয়ে নিলেই চায়ের জল চাপাব।

আমি কোন কথা না বলে বিছানা থেকে নেমে ওষুধ খেয়ে নিলাম। বুঝলাম, দেবী আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল কিন্তু আমি কিছু বললাম না।

দেবী চা করতে গেলে পিসী আমাকে বললেন, লক্ষ্মীটি বাবা আমার, তুই দেবীর উপর রাগ করে চলে যাস না ও সে আঘাত সহ্য করতে পারবে না।

আমি চুপ করে থাকি। কোন কথা বলি না।

পিসী চুপ করে থাকেন না। বলেন, ও যে তোর কি সেবা করেছে, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। একনাগাড়ে মেয়েটা পনের দিন ঘুমোয় নি। সত্যি কথা বলতে কি, দেবী না থাকলে আমি তোকে বাঁচাতে পারতাম না।

শুনে আমার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লেও মুখে কিছু বললাম না।

পিসী আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, মেয়েটা ক'দিন আগেই এতবড় একটা শোক পেল। তারপর যদি তুই রাগ করে চলে যাস, তাহলে ও যে কি করবে, কিছুই বলা যায় না।

দেবী আমাদের চা নিয়ে এলো। চা খেতে খেতে পিসী ওকে বললেন, আজ তো আমার বাড়ীর সবাই রাণুর বাড়ী যাবে। তুই সাবধানে থাকিস।

দেবী একটু হেসে বলল, কতকাল আর তোমরা আমাকে পাহারা দেবে ? এবার আমাকে একলা একলা সবকিছু সামলাতে দাও।

ওসব কথা রাখ তো। আর শোন, আমার আসতে দেরী হলে তোরা খেয়ে নিস।

ভয় নেই, উপবাস করব না।

পিসী যাবার সময় বার বার করে আমাকে বলে গেলেন, ঠিক মত ওষুধপত্র—খাওয়া-দাওয়া করিস।

করব।

আর এসে যদি দেখি কান্নাকাটি হচ্ছে, তাহলে কিন্তু আমি দুজনকে ধরেই মার লাগাব।

আমি হাসি।

দেবী বললো, আমি নিশ্চয়ই বেশী করে মার খাব।

কেন?

আমি কি জানি না, তুমি আমার চাইতে ওকে অনেক বেশী ভালবাস।

তোকে আমি একটুও ভালবাসি না।

দেবী পিসীকে জড়িয়ে ধরে বললো, না, না, তুমি আমাকে খুব ভালবাস।

আচ্ছা ছাড়। আমি যাই।

পিসী সহস্র কোটি দেবতার নাম স্মরণ করতে করতে চলে গেলেন।

পিসী বোধহয় তখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামেন নি। দেবী হঠাৎ আমার দুটো পা জড়িয়ে ধরে বললো, সোনা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে যাবে না।

আমি ওর হাত দুটো ধরে টানতে টানতে বললাম, একি করছ? পা ধরো না।

আগে বল তুমি যাবে না।

কাল পরশু না গেলেও আমাকে তো যেতেই হবে।

না, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না। কোনদিন যাবে না। কিছুতেই যাবে না।

কথাগুলো বলতে বলতে দেবী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আমি তাড়াতাড়ি ওকে একটু টেনে নিয়ে বললাম, তুমি অমন করে চোখের জল ফেলবে না।

কিন্তু সোনা, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না।

কিন্তু—

না, না, কোন কিন্তু আমি শুনব না। তুমি চলে গেলে আমি বাঁচব না, কিছুতেই বাঁচব না।

আমি কোন অধিকারে কি পরিচয় নিয়ে এখানে থাকব, তুমি বল।

লোকে যা ইচ্ছে বলুক কিন্তু আমি একলা একলা বাঁচব কি করে?

তুমি আমাকে বিয়ে করব না?

আমাকে বিয়ে করলে আত্মীয়-বন্ধুরা তোমাকে যা তা বলবে, হাসি-ঠাট্টা করবে। আমি তা কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

শুধু কি তাই? নাকি সংস্কার তোমাকে…

আমি সংস্কারমুক্ত না, কিন্তু জেনে রেখো, আমার কাছে সংস্কারের চাইতে তুমি অনেক বড়।

আমি চুপ করে বসে বসে ভাবি।

দেবী আমার মুখের সামনে মুখ এনে বলে, সোনা, কি এত ভাবছ?

কি ভাবছি তা আমিও জানি না।

একটা কথা বলব?

বল।

আমি কোনদিন বিবাহিত জীবনের সুখ পাব না।

কে বললো?

ভানুদা বলেছেন।

আমি অবাক হয়ে বলি, ভানুদা?

হ্যাঁ, ভানুদা।

ভানুদা কি করে জানলেন?

ভানুদা খুব ভাল জ্যোতিষ ছিলেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমার জীবনে ওঁর প্রতিটি কথা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে।

যেমন?

দেবী একটু হেসে বললো, শুনতে চাও?

চাই বৈকি।

তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, তাও উনি আমাকে বলেছিলেন।

সত্যি?

তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।

কি বলেছিলেন?

বলতে গিয়ে খুশীতে ওর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললো, ভানুদা বলেছিলেন এই সময় থেকে এই সময়ের মধ্যে একটি ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হবে এবং আমি তাকে ভালবাসব। তাকে পাবার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠব কিন্তু ছেলেটি নেহাতই ভাল হবে বলে আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েও সে কোন ক্ষতি করবে না।

শুনে আমিও হাসি। জিজ্ঞাসা করি, সত্যি এসব বলেছিলেন?

উনি বলেছিলেন বলেই ত আমি তোমাকে ভানুদার কাছে নিয়ে যাবার জন্য অত আগ্রহ দেখিয়েছিলাম।

আর কি বলেছিলেন?

তোমাকে দেখে উনি কি বলেছিলেন জান?

কি?

দেবী না হেসে পারে না। বলে, ভানুদা বলেছিলেন, জননী, এই তোমার ভাগ্য-বিধাতা এই তোমার শেষ পারানির কড়ি।

তুমি বোধহয় একটু ভুল করছ। ভানুদা নিশ্চয়ই বলেছিলেন, তুমিই আমার ভাগ্যবিধাতা হবে।

আমি তোমার ভাগ্যবিধাতা বলেই তো একটু আগে আমার হাতে ওষুধ পর্যন্ত খেলে না।

আমি তো তোমাকে কিছু বলি নি। আমি আমার বউয়ের উপর অভিমান করেছি।

কেন, তোমার বউ কি করেছিল ?

হাজার হোক সুন্দরী। তার উপর জানে ওর ফিগারটাও দারুণ! ওকে দেখলেই আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। তাই…

অনেক কষ্টে হাসি চেপে বললো, আগে ভেবেছিলাম, তুমি বেশ ভাল ছেলে কিন্তু এখন দেখছি তোমার মত অসভ্য লোক আর দ্বিতীয় নেই।

অসভ্য বলেই তো সারা রাত আমার কাছে কাটিয়েও তুমি অক্ষত থেকে গেছ।

দেবী দুহাত তুলে বললো, সত্যি বলছি সোনা, সেদিন রাত্রির পর থেকেই তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হাজার গুণ বেড়ে গেছে।

চোখ দুটো বড় বড় করে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে আমি বললাম, হাজার গুণ শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ?

বাড়বে না ? তুমি পুরুষমানুষ। তুমি বুঝবে না কিন্তু আমি ত জানি, পুরুষরা শুধু মেয়েদের দেহটাই চায়।

তাই নাকি ?

একশ'বার। চাল-কলা দিয়ে পূজা-আচার নৈবেদ্য সাজাবার মত মেয়েদের এই দেহের নৈবেদ্যই সব পুরুষের একমাত্র কামনা।

শুনে আমি একটু হাসি।

দেবী আপন মনে বলে যায়, শুনলে হয়ত তুমি হাসবে কিন্তু তবু বলছি, সেদিন রাত্রে তোমাকে একটু কাছে পাবার জন্য ছটফট করছিলাম কিন্তু ভয়ে আসতে পারছিলাম না।…

কিসের ভয় ?

ভয় হচ্ছিল এই ভেবে যে যদি তুমি নিজেকে সংযত রাখতে না পার, যদি তুমি কিছু দাবী কর তাহলে কি আমি…

দেবী কথাটা শেষ না করেই লজ্জায় আমার পিঠের উপর মুখখানা লুকিয়ে রাখল।

কথাটা শেষ করবে না ?

না।

কেন ?

তোমার প্রশংসা করতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

আমি তো আমার প্রশংসা শুনতে চাই না।

তবে কি শুনতে চাও ?

সে রাত্রে আমি যদি কিছু দাবী করতাম, তাহলে কি তুমি ফিরিয়ে দিতে ?
সেদিন হয়ত ফিরিয়ে দিতাম কিন্তু এখন আর ফিরিয়ে দিতে পারব না।
কি বলছ তুমি ?
ঠিকই বলছি সোনা। তোমাকে না দেবার আমার কিছুই নেই। আমার সব কিছুই আমার সোনার।

অনেকক্ষণ ও আমার পিঠের উপর মুখখানা রেখে চুপ করে বসে রইল। আমিও কোন কথা বলতে পারলাম না। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অনেক কিছু বললাম। বললাম—দেবী আমি শাস্ত্র পড়ি নি ধর্মের নির্দেশ আমি জানি না কিন্তু মনে মনে বেশ উপলব্ধি করতে পারি স্ত্রীরত্ন বলতে যদি কিছু বোঝায় তা তোমারই মত মেয়েকে বলা যায়। তোমার মত আমিও অনেক কথা তোমাকে বলি নি। বলতে পারি নি। লজ্জায় দ্বিধায় চুপ করে থেকেছি। আজ তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে, বউ সেদিন রাত্রে বা তারপরে অনেকবারই তোমার ভালবাসার জোয়ারে ভেসে যেতে যেতে তোমার ঐশ্বর্যময় লালিত্যপূর্ণ অপরূপ দেহ আমাকে পাগল করে তুলেছে কিন্তু পারি নি। আর এগুতে পারি নি। পিছিয়ে এসেছি। মনে হয়েছে যে আমাকে এত ভালবাসে এত বিশ্বাস করে এত আপন মনে করে যে তার সমস্ত ঐশ্বর্যের চাবিকাঠিটি হাসতে হাসতে আমার হাতে তুলে দিয়েছে তার কাছ থেকে কিছুই আমি কেড়ে নিতে পারিনি। পারব না। অপরূপা, অনন্যাকে কোন কালিমার স্পর্শে আমি লাঞ্ছিত করব না।

বউ।

বল সোনা।

পিসীকে ঐসব কথা না বললেই ভাল করতাম।

হঠাৎ একথা মনে হল কেন ?

এসব কথা বলার ত কোন দরকার ছিল না। তুমি আর আমি যেমন ছিলাম তেমনই থাকব।

বলে ভালই করেছ।

কেন ?

পিসী তোমার বিয়ে দেবার জন্য হঠাৎ এত বেশী মেতে উঠেছিলেন যে···

পিসী কি ওদের কথা দিয়ে দিয়েছেন ?

পিসী বলেছেন যে ও যদি বিয়ে করে তাহলে এখানেই বিয়ে করবে।

হঠাৎ এরকম কথা দিলেন কেন ?

আলপনাকে দেখে ও'র খুব ভাল লেগেছে। তাছাড়া পিসী দেখলেন ওদের বাড়িতে যখন কোন ছেলে নেই তখন তুমি ও বাড়িতে ছেলের মর্যাদা পাবে।

আলপনাকে তোমার কেমন লাগল ?

আলপনাকে আমার বেশ ভালই লেগেছে কিন্তু ওর মাকে আমার বিশেষ ভাল লাগে নি।

কেন বলো ত ?

ভদ্রমহিলা বোধহয় একটু অহংকারী।

একটু নয় যথেষ্ট।

তাছাড়া উনি বোধহয় তোমাকে ঘরজামাই করে রাখতে পারলেই···

তুমি ঠিক ধরেছ।

আচ্ছা আলপনা কি তোমাকে ভালবাসে ?

তা বলতে পারব না ; তবে ও যে আমাকে যথেষ্ট পছন্দ করে বা হয়ত একটু ভক্তি-শ্রদ্ধাও করে তা বুঝতে পেরেছি।

তোমাকে কি ওরা বিয়ের কথা কিছু বলেছিলেন ?

কাকাবাবু বলেছিলেন।

তুমি কি জবাব দিয়েছিলে ?

বলেছিলাম, অত অহংকারী মহিলার মেয়েকে বিয়ে করব না।

সে কথা বোধহয় আলপনা জানে তাই না ?

হ্যাঁ, জানে।

তাই ও বললো— তুমি ওর মাকে বিশেষ পছন্দ করো না।

আলপনা মেয়েটি বেশ ভাল কিন্তু আমার ত কিছু করার নেই। তুমি যদি আমার জীবনে না আসতে তাহলে হয়ত ওকে বিয়ে করতাম।

তার মানে তোমার ওকে ভাল লাগে।

নিশ্চয়ই ভাল লাগে কিন্তু ভাল লাগা মানেই ত বিয়ে করা নয়।

দেবী দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা খুব জোরে চেপে ধরে বলে, আমি জানি আমার সোনাকে আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

সত্যি জানো ?

দেবী হঠাৎ যেন কোথায় তলিয়ে গেল। আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে বললো, আমি জানি সোনা আমি মরে গেলেও তুমি কাউকে বিয়ে করে সংসারী হতে পারবে না। অথচ···

ও আর বলে না। চুপ করে যায়।

অথচ কি ?

অথচ আমি বোধহয় খুব বেশী দিন তোমার দেখাশুনা করতে পারব না।

আমি ওকে একটু বকুনি না দিয়ে পারলাম না। বললাম, কেন আজেবাজে কথা বলছ ?

আজেবাজে নয় সোনা, ঠিক কথাই বলছি।

তুমি কবে মরবে তাও কি ভানুদা বলে গেছেন ?

ঠিক কবে মরব তা না বললেও বলেছেন আমি খুব বেশীদিন বাঁচব না।
জন্ম-মৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারেন না।
আমিও আগে তাই ভাবতাম কিন্তু এখন সব কথা মিলে যাচ্ছে বলেই মনে হয়…
সব কথা মানে ত আমার সঙ্গে দেখা হবার কথা?
আরো অনেক কিছু।
অনেক কিছু মানে?
যা কিছু ঘটেছে ঘটছে সবকিছুই মিলে যাচ্ছে।
যেমন?
যেমন দিদির মৃত্যু। তোমার-আমার ব্যাপার।
তোমার-আমার ব্যাপারে কি বলেছেন?
এইত যা হচ্ছে তাই বলেছেন।
বিয়ে হবে কিনা কিছু বলেছেন?
বিয়ে করতে ভানুদা বারণ করেছেন।
কেন?
ফল নাকি ভাল হবে না।
একটু চুপ করে থাকার পর বললাম, বউ, আজ থেকে আর তোমাদের এ ঘরে শোবার দরকার নেই।
কেন?
আমি ত এখন অনেকটা ভাল হয়ে গেছি। তাছাড়া তোমাদের মেঝেয় শুতে হবে না।
তাতে কি হয়েছে?
দরকার যখন নেই তখন শুধু শুধু মেঝেয় শোবে কেন?
রাত্রে তোমার যদি কিছু দরকার হয়?
সে রকম দরকার হলে তোমাকে ডাকব। তাছাড়া আমার জন্য আর কত রাত ঘুমোবে না?
সোনা, ঘুমুবার চাইতে তোমার পাশে বসে রাত কাটানো অনেক আনন্দের।
এর পর যদি তুমি অসুস্থ হয়ে পড়?
তুমি আমার পাশে বসে বসে রাত কাটাবে না?
ভয় নেই তোমার জন্য আমাকে কিছুই করতে হবে না। সারা জীবন তুমিই আমার জন্য করবে।
সোনা তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না। ইচ্ছে করে কত কি করি কিন্তু ভগবান ত সে সুযোগ আমাকে দেবেন না।
কোন ইচ্ছে তোমার অপূর্ণ থেকে যাচেছ?
দেবী খুব জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, আমার আসল ইচ্ছাটাই ত জীবনে কোনদিন পূর্ণ হবে না।
কেন?
সে ইচ্ছে পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

কি সেই ইচ্ছে ?

শুনতে চাও সোনা ?

চাই বৈকি।

শুধু ঘরে না এই দোতলায় কোন তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলেও দেবী আমার কানে কানে ফিসফিস করে বললো—আমাদের যদি একটা ছেলে হতো···

ও লজ্জায় সঙ্গে সঙ্গে আমার কোলের মধ্যে মুখ লুকোল।

আমি হাসতে হাসতে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, বিয়ে করতে চাও না কিন্তু ছেলের স্বপ্ন দেখো ?

তুমি আমাকে বকবে না সোনা।

তোমাকে বকলাম নাকি ?

আর কিভাবে বকুনি দেবে ?

তুমি আমার বড় আদরের বউ।

যখন মনের মত স্বামী পেয়েছি তখন আদর পাব না কেন ?

মনের মত স্বামী পেয়েছ ?

নিশ্চয়ই পেয়েছি। আমার সোনার মত স্বামী আর কি কেউ পায় নি।

দেবীর মাথায় মুখে হাত দিতে দিতে সামনের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি রাত্রির অন্ধকার নেমে আসার দেরী থাকলেও সূর্য অস্ত গেছে। চারদিকে গোধূলির মিষ্টি আলো বাঙালীটোলার এই অলি-গলির মধ্যেও উদার পৃথিবীর আনন্দের জোয়ার এনে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর দেবী উঠে বসে আমার কপালের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বললো, তোমাকে যদি এভাবে প্রাণের কাছে পাই তাহলে আমার আর কিছু চাই না।

আমি কিছু বলি না।

ও হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়েই লাফিয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বললো, তোমাকে কিছু খেতেও দিলাম না ওষুধও দিই নি।

ও আমাকে ওষুধ দিয়েই রান্নাঘরে গেল। একটু পরে এক গেলাস গরম দুধ আর বিস্কুট এনে বললো, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিও। আমি গা ধুতে যাচ্ছি।

যাও।

একটু পরে দুধ আর বিস্কুট খেয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে ভাল লাগল না। ঐ ছোট্ট ছাদ আর বারান্দায় পায়চারী করতে করতে দেবীর ঘরের দিকে নজর পড়তেই ওর ঘরে গেলাম। দু-এক মিনিট ঐ অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কে ? একটু ভয় পেয়েই দেবী জিজ্ঞাসা করল।

আমি।

তুমি ?

হ্যাঁ।

এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি করছ ?

কিছু না। এমনি দাঁড়িয়ে আছি আর ভাবছি…ভাবছি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি এ ঘরে আসব বা এ ঘরের মালিককে আমি এমন করে পাব।

ও আমার সামনে এসে দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, সত্যি পেয়েছ ?

নিশ্চয়ই। এখন যেখানেই আমি যাই না কেন এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করব না আমি একা আমি নিঃসঙ্গ।

তুমি কোথাও যাবে নাকি ?

তুমিই বল কাজকর্ম না করে চুপচাপ বসে থাকা কি ভাল ?

তা কেন বলব ?

তাহলে তুমি আমাকে পাটনা যাবার অনুমতি দাও। আমি শনিবারে না পারলেও মাসে দুবার নিশ্চয়ই আসব।

তুমি সত্যি পাটনার চাকরিটা করতে চাও ?

হাজার হোক জীবনের প্রথম চাকরি পেয়েছি।

যদি এখানেই কোন চাকরি পাও তাহলে চলে আসবে ?

নিশ্চয়ই আসব।

তাহলে যাও। আমার কোন আপত্তি নেই।

আজকে ওদের একটা টেলিগ্রাম করা যায় ?

কাল সকালে করে দেব।

কিন্তু ওরা ত জানে না…

তুমি আসার পরদিনই আমি ওদের একটা অর্ডিনারী টেলিগ্রাম করে জানিয়েছি যে… ।

বাচ্চাদের মত ওর গাল টিপে আদর করে বললাম, এই না হলে আমার বউ।—আলো জ্বালো তোমাকে দেখবো।

না না এখন আলো…

কেন কি হল ?

আমি শুধু সায়া-ব্লাউজ পরে আছি।

তাহলে ত আলো জ্বালতেই হবে। এ দৃশ্য না দেখে আমি ঘর থেকে বেরুচ্ছি না।

না না তোমার পায়ে পড়ি আলো জ্বালবে না।

মাত্র এক মিনিটের জন্য…

ও আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললো, লক্ষ্মী সোনা আমার তুমি আমার কথা শুনবে না ?

এভাবে বললে না শুনে পারি ?

আমি আর কোন কথা না বলে হাসতে হাসতে নিজের অন্ধকার ঘরে গিয়ে ইজিচেয়ারে বসলাম। পনের-বিশ মিনিট পরে দেবী আলো জ্বালতেই আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কি হল ? ওভাবে তাকিয়ে দেখছ কি ?

বউ তুমি এভাবে আর আমার সামনে এসো না।

এভাবে মানে ?

তুমি এভাবে আমার সামনে এলে আমি আর সত্যি নিজেকে সামলাতে পারব না।

বাজে বকো না।

সত্যি বলছি ঠিক একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

দেবী ধীর পদক্ষেপে হেলে-দুলে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললো, অসভ্যতা করবে না। চুপ করে বসে থাক।

কেন ?

জবাব দেবার আগেই ও হাঁটু মুড়ে আমার সামনে বসে আমাকে প্রণাম করল।

হঠাৎ প্রণাম করলে কেন ?

কৈফিয়ত চাইবার আগে আশীর্বাদ করবে না ?

ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, আমি যেন তোমার সমস্ত বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার উপযুক্ত হতে পারি।

এটা আশীর্বাদ করা হল ?

মনে মনে ত সব সময়ই তোমার মঙ্গল কামনা করি।

করো ?

হঠাৎ পিসীর গলার আওয়াজ শুনতেই ও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বললো, ও বাড়ির কাজকর্ম মিটে গেল পিসী ?

পরে আবার যেতে হবে।

তাহলে এখন আবার এলে কেন ?

ভাবলাম প্রদীপকে একবার দেখে যাই। আর মনে মনে ভাবছিলাম আবার ঝগড়া বাধিয়ে···

আমি ত তোমার প্রদীপের মত আদুরে ননীগোপাল নই যে···

পিসী আমার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ওকে বললেন, বাজে বকিস না। এবার আমার চিবুক ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছিস বাবা ?

হেসে বললাম, ভাল।

দুধ খেয়েছিস ?

না ত।

পিসী বেশ রেগেই দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, অসুস্থ ছেলেটাকে একটু দুধ পর্যন্ত দিতে পারিস নি ?

দেবী হেসে বললো, যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে আমি দুধ দিতে পারব না।

পিসী একবার আমাদের দু'জনকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন, আমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাব হয়ে গেল ?

আমরা দু'জনে প্রায় একসঙ্গে বললাম, না না পিসী ভাব হয় নি।

পিসী হাসতে হাসতে বললেন, ওরে বাপু আমার বয়স হলেও এসব ভাব-ভালবাসার ব্যাপার বেশ বুঝতে পারি।

আমরা দুজনে হেসে উঠতেই পিসী আমাদের দু'জনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার কাছে লুকোচ্ছিস কেন ? আমি কি তোদের পর ?

আরো এক সপ্তাহ পরে আমি নতুনভাবে কর্মজীবন শুরু করার জন্য পাটনা রওনা হলাম। পিসী আর দেবী হাসিমুখেই আমাকে বিদায় দিল।

পাটনার জীবন বেশ ভালভাবেই শুরু হল। রাজেন্দ্রনগরে বিরাট দোতলা বাড়িতে আমাদের অফিস। একতলার পিছন দিকের তিনখানি ঘরে আমার রাজত্ব। দুখানিতে গুদাম, তৃতীয়টি আমার অফিস-কাম-কোয়ার্টার। কোন অসুবিধে নেই। ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। ঘরের মধ্যে পর্দা দিয়ে পার্টিশন করে পিছন দিকে আমার সামান্য জিনিসপত্র ও খাটিয়া। এই একতলার সামনের তিনখানি ঘরের একটিতে রিজিওন্যাল ম্যানেজার মিঃ মুখার্জি'র চেম্বার। দ্বিতীয়টি অফিস। তৃতীয়টি সেলস রিপ্রেজেনটেটিভদের।

দোতলায় মিঃ মুখার্জি'র কোয়ার্টার ও গেস্টরুম। কলকাতা থেকে কোম্পানীর কেউ এলে ঐ গেস্টরুমে থাকেন। তবে কলকাতা থেকে বিশেষ কেউ আসেন না। দরকার হলে মিঃ মুখার্জি'ই কলকাতা যান। আমি আসার পর উনি বলেছিলেন, প্রদীপবাবু, আপনি একলা একলা নীচে না থেকে গেস্টরুমেই থাকুন। কলকাতা থেকে যখন কেউ আসবেন, তখন দু'এক দিনের জন্য না হয় নীচের ঘরে থাকবেন। আমি রাজী হইনি। বলেছিলাম, স্যার, নীচের ঘরে থাকতে আমার কোন অসুবিধে হবে না।

মিঃ মুখার্জি অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক। এম-এ পাশ করে কোচবিহার জেলার একটা ছোট্ট কলেজে বছর দুই চাকরি করার পর আমাদের কোম্পানীতে চলে আসেন। আমাদের কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেকটর মিঃ কমল রায় বহুদিন নানা কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। তারপর সায়েন্স কলেজের পুরানো দুই বন্ধুকে নিয়ে এই কোম্পানী তৈরী করেন। মিঃ রায়ের ধারণা, সাধারণ শিক্ষিত-সমাজ শিল্প-বাণিজ্যে এগিয়ে না আসায় দেশের সত্যিকার উন্নতি হচ্ছে না। মিঃ মুখার্জি একদিন কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন, এম-এ পাশ করেছেন বলেই এ কোম্পানীতে আপনার চাকরি হয়েছে ও উন্নতি হবে।

যাই হোক আমি বেশ আছি। আমাদের অফিসের বেয়ারা নিত্যহরি আগে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের বাড়িতে রান্না করত। এখানে নিত্যহরিই

আমার খানাদাত্রী। আমি ওকে মাসে মাসে একশ টাকা দিই। মিসেস মুখার্জি ভাল-মন্দ রান্না করলেই আমাকে পাঠিয়ে দেন। দু-একদিন পরপরই উপর থেকে কিছু আসে। আমি বলি বৌদি, ফ্রান্সে ওয়াইন টেস্টার আছে কিন্তু আপনি কি আমাকে ফুড টেস্টার এ্যাপয়েণ্ট করলেন ?

মিসেস মুখার্জি হাসতে হাসতে বলেন, না প্রদীপবাবু, আমি ইনভেস্টমেণ্ট করে যাচ্ছি। এরপর আপনার স্ত্রী এলে আমাকে হয়ত রান্নাঘরেই ঢুকতে হবে না।

আমি হেসে বলি, বৌদি, আমার পত্নীর স্থানে শনির দৃষ্টি। সুতরাং আগামী পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে সে সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

মিসেস মুখার্জি নিরাশ হবার পাত্রী নন। বলেন, দেখুন প্রদীপবাবু, আমিও আপনার মত আশুতোষ-দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর সিঁড়ি ভেঙেছি পুরো দুটো বছর। তাছাড়া প্রেসিডেন্সীতে পড়ার সময় থেকেই আপনাদের মিঃ মুখার্জির সঙ্গে কফিহাউসে আড্ডা দিয়েছি, ওয়াই-এম-সি-এ রেস্টুরেণ্টের কেবিনে বসে প্রাণের কথা বলেছি।···

ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমি হাসি।

উনি এবার আমার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললেন, আপনার রোগ আমি ধরতে পারি নি, তা আপনি ভাববেন না।

আমি খুব জোরে হেসে উঠি।

হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। শেষকালে লুকিয়ে লুকিয়ে আপনার পিছন পিছন কাশীধাম ধাওয়া করে হাতেনাতে ধরিয়ে দেব।

সারা বিহার ও নেপাল আমাদের এই অফিসের অধীনে। নেপালে দু'জন ও বিহারে আটজন সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ ছড়িয়ে আছেন। প্রত্যেক সেলস রিপ্রেজেনটেটিভকে প্রতিমাসে পাটনা আসতে হয়। মিঃ মুখার্জিও মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে ঘুরতে যান। এই রিজিওন্যাল অফিসের ডিপোর দায়িত্ব আমার। কলকাতার সেন্ট্রাল ডিপো থেকে মাল আনিয়ে এখান থেকে নানা অঞ্চলে পাঠানই আমার কাজ। এ-কাজে খুব একটা বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নেই ; তবে খাতাপত্রে ঠিক মত লেখালেখি না করলে বা মালপত্র ঠিকমত আনিয়ে নানা জায়গায় না পাঠাতে পারলে মুশকিলে পড়তে পারি। প্রথম দু-এক মাস খুবই অসুবিধে হয়েছিল। সত্তর-পঁচাত্তরটা ওষুধ আর কেমিক্যালস-এর নাম আর বানান মুখস্থ করতেই পুরো একটা মাস লেগেছিল। এখন সব কাজটাই জলবৎ তরলং মনে হয়। কাজ করে বিশেষ আনন্দ পাই না কিন্তু অফিসের পরিবেশ আর মিঃ মুখার্জির জন্য বেশী মাইনে পেলেও এই কোম্পানী ছাড়তে পারব না।

দিনগুলো বেশ কাটছে। প্রত্যেক মাসে দু'দিনের জন্য কাশী যাই। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে পুরো টাকাটাই পিসীর হাতে দিয়ে বলেছিলাম, হরসুন্দরী ধর্মশালায় গিয়ে দেখলাম মা নেই। পালিয়েছে। তাই তোমার হাতেই মাইনেটা দিচ্ছি।

পিসী কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কোন কথা বলতে পারেন নি। পরে দেবীকে বলেছিলেন, দেবী সোনা বউয়ের ছেলেটাও সত্যি সোনার টুকরো হয়েছে। আজ আমার নিজের ছেলে থাকলেও সে আমাকে এ সম্মান দিত কিনা সন্দেহ।

পিসী পুরো টাকাটাই দেবীর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, ওকে দিয়ে দিস। আর তুই ওকে নিয়ে গিয়ে সংকট মোচনে পুজো দিয়ে আসিস। ওর জীবনে যেন কোন সংকট না আসে।

তারপর থেকে আমি কাশী এলেই দেবী আমাকে নিয়ে সংকট মোচনে যাবে। আমি জানতাম না পিসীর মত ওরও সংকট মোচনে এত বিশ্বাস। পরে ও আমাকে বলেছিল, জান সোনা, তোমার অসুখ যখন খুব বাড়াবাড়ি তখন আমি সংকট মোচনে এসে মহাবীরজীকে বলেছিলাম, আমার সোনার যদি কিছু হয় তাহলে আমি আর কোনদিন তোমার মুখ দেখব না।

ওর কথা শুনে আমি হাসি।

দেবী আমাকে চিমটি কেটে বলে, সোনা, তুমি আমার কথা শুনে হাসবে না।

আমি কি ঠাট্টা করে হাসছি? আনন্দে, খুশীতে হাসছি।

কথা ঘুরাবার চেষ্টা করবে না।

সত্যি বলছি, তুমি আমাকে কত ভালবাসো।

তোমাকে ছাড়া আর কাকে ভালবাসব?

তা ঠিক। পৃথিবীতে ত আমি ছাড়া আর কোন যুবক নেই।

এই জন্যই তোমাকে কোন কথা বলতে চাই না।

আচ্ছা, আচ্ছা, আর এ ধরনের কথা বলব না।

সংকট মোচন থেকে ফেরার পথে রিকশায় বললাম, বউ একটা কথা বলবে?

কী?

আজ সংকট মোচনে গিয়ে কী প্রার্থনা করলে?

দেবী হেসে বললো, তোমাকে বলব কেন?

আমি যে তোমার সোনা। আমাকেও বলবে না?

ও একটু উদাস করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, বললাম, সংকট মোচন, আমি যে সোনাকে ছেড়ে আর থাকতে পারছি না। আমি কি কোনো দিনই আমার সোনাকে···

দেবী কথাটা শেষ করতে পারল না। আমি আলতো করে ওর একটা হাত চেপে ধরে বললাম, বউ, তোমার এ ভালবাসা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না।

জানি না সোনা। বেশী আশা করতে ভয় হয়।

কাশীতে গেলে দুটো দিন যে কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে যায় তা বুঝতেই পারি না। পৌঁছবার পর পরই পিসীর কাছে ঘণ্টাখানেক খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

তুই এ রকম শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন? নিত্য ঠিক করে খেতে দেয় না?

আমি দু'হাত দিয়ে পিসীর মুখখানা ধরে বলি, তোমার চোখে আমার শরীর কোন দিনই ভাল হবে না।

পিসী আমার কথা কানেই তোলে না। বলে, এই ক'মাস আগে এতবড় অসুখ থেকে উঠলি। একটু ভাল-মন্দ খাওয়া-দাওয়া করবি বাবা।

আর বলো না পিসী। আজকাল আবার মাইনে থেকে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও আরো কত কি কেটে নেবার পর যা হাতে পাই, তাতে আর···

আর বলতে হয় না। পিসী সঙ্গে সঙ্গে আমার কান ধরে বলে, ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া না করে আমার জন্য অত দামী চাদর কিনে আনলি কেন?

দেবী বলেছিল।

দেবী দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে সব শুনেছিল। এবার ও ঘরের কাছে এসে বললো, না পিসী আমি কিছু বলি নি। তা ছাড়া তোমার প্রদীপ যেন আমার সব কথা শোনে!

তোরা দুটোই অত্যন্ত বদ হয়েছিস।

যখনই হোক একবার দু-এক ঘণ্টার জন্য পিসীর বাড়িতে গিয়ে সারদা-সুধামণি পিসীদের কাছে যেতেই হয়। প্রতিবারই আমি সামান্য কিছু ফল-মিষ্টি নিয়ে যাই। বঞ্চনা আর উপেক্ষা সহ্য করতে করতে এই পৃথিবীর কারুর কাছেই ওঁদের কোন প্রত্যাশা নেই। তাই আমি সামান্য ফল-মিষ্টি দিলেই ওঁরা যেন হাতে স্বর্গ পান।

বাকি সময়টুকুর মালিক দেবী।

সোনা, চলো ত একটু গোধূলিয়ার মোড় ঘুরে আসি।

কেন?

দরকার আছে।

এখুনি যেতে হবে?

হ্যাঁ।

আমি ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। তারপর গোধূলিয়ার মোড়ে গিয়েই বাটার দোকানে ঢোকে। পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসি। সেলসম্যান আসতেই ও উঠে গিয়ে শো-কেসের কোন একটা জুতো দেখায়। তারপর সেলসম্যান বাক্স থেকে আমার জুতো বের করতেই আমি চমকে উঠি। তুমি আমার জুতো কিনতে এসেছ? আমার ত জুতো আছে।

পায় দিয়ে দেখে নাও, ঠিক আছে কিনা।

দোকানের মধ্যে ঝগড়া করা যায় না। বাইরে বেরিয়ে আসার পর বললাম, প্রত্যেক মাসেই আমাকে কিছু দেবার দরকার আছে কি?

তোমাকে কি আর দিলাম!

যে সিল্কের বুশ সার্ট পরে আছি, সেটা কে দিল?

দেবী আমার দিকে করুণভাবে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, সোনা, তোমাকে আরো কত কি দিতে চাই কিন্তু কিছুতেই পারি না।

আবার কি দিতে চাও?

দেবী আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, অনেক অনেক কিছু।

অনেক কিছু মানে?

সবকিছু। সর্বস্ব।

আমি আর প্রশ্ন করি না। মুখ নীচু করে হাঁটি।

এক মিনিট পরেই দেবী বলে, সোনা, না দেবার যন্ত্রণা যে কি তা তোমাকে বোঝাতে পারব না।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ আমি, পিসী আর দেবী গল্প করলাম। তারপর পিসী শুতে গেলেন। আমরা দু'জনে বসে বসে কথাবার্তা বলছিলাম। নানা কথার পর দেবী বললো, সোনা, তুমি, আলপনাকে বিয়ে কর। ও সত্যিই তোমাকে ভালবাসে।

তুমি সতীন নিয়ে ঘর করতে পারবে?

সতীনদেরও একটা মর্যাদা থাকে কিন্তু আমার সে মর্যাদাও পাবার অধিকার নেই।

সতীনের আবার মর্যাদা? তাও আবার বড় বউয়ের?

যাকগে এ আলোচনা বাদ দাও। তুমি এবার আলপনাকে বিয়ে কর।

এতদিনে বোধহয় আলপনার বিয়ে হয়ে ছেলেও হয়ে গেছে।

দেবী আমাকে একটা চড় মেরে বললো, অসভ্যতা করো না। এর মধ্যেই ওর বিয়ে হয়ে ছেলে হবে, তাই না?

আমি হাসি। তারপর বলি, ছেলে না হলেও বিয়ে ত নিশ্চয়ই হয়ে গেছে।

তোমাকে কে বললো?

কেউ বলে নি। আমার মনে হয়।

ওঁরা ত পিসীর কথার উপর ভরসা করেই এখনো বসে আছেন।

তোমাকে কে বললো?

ক'দিন আগেও পিসীর কাছে আলপনার মার চিঠি এসেছে। তাছাড়া তোমার বাবার বন্ধু কাকাবাবু আর কাকিমা এর মধ্যে কাশী বেড়াতে এসে···

তাঁরাও এসেছিলেন?

দেবী হেসে বললো, সোনার জন্য আসবেন না।

পিসী আলপনার মার চিঠির জবাব দিয়েছে?

না। তবে আমি আলপনার চিঠির জবাবের মধ্যেই লিখেছি পিসী পরে তোমার মাকে···

আলপনা তোমাকেও চিঠি লেখে?

মাসে একটা চিঠি আসেই।

তুমিও জবাব দাও?

দেব না কেন?

এবার লিখে দাও আমি পাটনাতেই একটা মেয়েকে বিয়ে করে সুখে সংসার করছি।

ওসব বাজে কথা বাদ দাও। তুমি আলপনাকে বিয়ে কর। আর কত কাল এভাবে একলা একলা···

আমি দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে বললাম, বউ, আমি জানি আমাদের বিয়ে হবে না। ফুলশয্যার রাতে তোমাকে না পেলেও অনেক দুঃখের রাতে তোমাকে কাছে পেয়েছি। লক্ষ্মী সোনা আমায় তুমি আমাকে বিয়ের কথা বলো না।

বছর খানেকের মধ্যে আমাদের রিজিওন্যাল অফিসের কাজ অনেক বেড়ে গেল। মুঙ্গের, রাঁচী আর কাটমাণ্ডুতে সাব-ডিপো খোলা হল। আমাকে মাসে একবার করে মুঙ্গের আর রাঁচীর সাব-ডিপো দেখতে যেতে হয়। কাটমাণ্ডু যাই না। মিঃ মুখার্জি ইদানীংকালে প্রত্যেক মাসেই দু-একবার করে কাটমাণ্ডু যাচ্ছেন। একটা বড় কনট্রাক্ট সম্পর্কে নেপাল সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেকটর কমল রায়ও দু'বার কাটমাণ্ডু ঘুরে এসেছেন। মিঃ রায়ের এক ছাত্র নেপালের ডেপুটি ডিরেকটর অফ হেল্‌থ। আবার মিঃ মুখার্জিরও এক সহপাঠী আমাদের এম্বাসীতে সেকেণ্ড সেক্রেটারী। সুতরাং ঐ কনট্রাক্ট পাবার সম্ভাবনা আছে এবং ঐ কনট্রাক্ট পেলে হয়ত আমাকে কাটমাণ্ডুতে বদলী করা হবে।

সব মিলিয়ে এত কাজের চাপ বেড়ে গেছে যে আগের মত নিয়ম করে প্রত্যেক মাসে কাশী যেতে পারছি না। আবার মাঝে পরপর দু'মাস ঠিক গিয়েছিলাম কিন্তু মার্চে কিছুতেই সময় হল না।

রাঁচী থেকে বিকালবেলার দিকে ফিরলাম। স্নান করে চা-টা খাবার পর মিঃ মুখার্জি আমার হাতে একটা টেলিগ্রাম দিয়ে বললেন, আপনার পিসীমা খুব অসুস্থ। খাওয়া-দাওয়া করেই তুফানে রওনা হয়ে যান। টেলিগ্রামটা খুলে দেখি দেবী পাঠিয়েছে। সেদিনই সকাল সাড়ে এগারটায় টেলিগ্রাম করেছে দেখে বুঝলাম, সকালের দিকেই কিছু হয়েছে। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। পাথরের মূর্তির মত চুপ করে চেয়ারে বসে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ। দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়তেই মিঃ মুখার্জি বললেন, এত আপসেট হবেন না। অসুখ করেছে, সেরে যাবে। আপনি খেয়ে তৈরী হয়ে নিন।

স্টেশনে রওনা হবার আগে মিঃ মুখার্জি আমার হাতে একশ টাকার পাঁচটা নোট দিয়ে বললেন, রেখে দিন। দরকার হতে পারে। তাছাড়া আমি রাত্রেই পপুলার ফার্মেসীর মিশ্রকে ফোন করে বলে দিচ্ছি। সুতরাং কিছু চিন্তা করবেন না।

তুফান এক্সপ্রেস তিন ঘণ্টা লেট করে পাটনা এলো। মোগলসরাই পৌঁছলাম

একেবারে রাত শেষ করে পৌনে চারটের সময়। বেনিয়াবাগের বাস ছাড়ল সাড়ে চারটেয়। রামকৃষ্ণ হাসপাতালে পেঁছিতে পেঁছিতে প্রায় ছটা হয়ে গেল। আমি ছোট্ট স্যুটকেসটা হাতে করে বারান্দা দিয়ে এগুচ্ছিলাম। হঠাৎ পাশের একটা ঘর থেকে দেবী ছুটে বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেই হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, সোনা, পিসী চলে গেছে।

আমার হাত থেকে স্যুটকেসটা পড়ে গেল।

সোনা, দিদি চলে গেছে, পিসীও চলে গেল। এবার আমার কি হবে?

আমারও চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছিল না। তবু কোনমতে বললাম, আমি তো আছি।

তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, সোনা। তুমি চলে গেলে আমি আর বাঁচব না, কিছুতেই বাঁচব না।

জীবনে কোন দিন এরকম বিপদের মুখোমুখি হইনি। প্রথমে বড় ঘাবড়ে গেলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিশ্রজীর সাহায্যে সবকিছুই ভালয় ভালয় মিটে গেল।

শ্রাদ্ধের পরদিন সারদা পিসীকে দেবীর কাছে রেখে আমি পাটনা রওনা হলাম। আসার আগে বলে এলাম, বউ, অফিসের সব কিছুই তো তুমি জানো। তাই আর দেরী করতে পারছি না। তবে কাজের চাপ কমলেই মাস খানেকের ছুটি নেবার চেষ্টা করব।

দেবী বললো, মাস খানেকের জন্য না পারলে অন্তত দিন দশ-পনেরর জন্য নিশ্চয়ই আসার চেষ্টা করো।

সে মাসে একদিনের জন্যও কাশী যেতে পারলাম না। জুনের প্রথমেই নেপাল গভর্ণমেণ্টের কনট্রাক্ট আমরা পেলাম। এক সপ্তাহ দিনরাত খেটে মালের রিকুইজিশন অর্ডার সেণ্ট্রাল ডিপোতে পাঠিয়ে দিয়েই আমিও মিঃ মুখার্জির সঙ্গে কাটমাণ্ডু রওনা হলাম।

কাটমাণ্ডুতে পেঁছেই দেবীকে চিঠি দিলাম আগামী তিন-চার দিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে লরী এসে পেঁছবে। ছ'লরী মাল ঠিকমত স্টোর করে রাখতেই আরো চার-পাঁচ দিন। স্টোরকিপারকে বুঝিয়ে দিতেও কয়েক দিন সময় লাগবে। তারপর এখান থেকে আমার ছুটি। তবে মিঃ মুখার্জি আমাকে সোজা প্লেনে বেনারস যেতে বলেছেন কিন্তু এক সপ্তাহের বেশী কিছুতেই থাকতে পারব না।

কয়েক দিন পরই জবাব পেলাম। সোনা, তুমি সারা দিন কত কাজে ব্যস্ত থাক। ক্লান্তিতে রাত্রিতে ঘুমোও আর আমি? আমার শুধু একটাই কাজ। শুধু তোমার কথা ভাবা। দিনরাত্তির তোমার কথা ভাবি। ভাবি তুমি কত পরিশ্রম করছ নিশ্চয়ই ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে না কিন্তু আমি এমনই দুর্ভাগা যে তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না। পারব না।

দীর্ঘ চিঠির শেষে লিখেছে এখানে বেশ বর্ষা নেমেছে। এখন গঙ্গার চেহারা দেখলে তোমার ভয় করবে। দশাশ্বমেধ ঘাটের প্রায় সব সিঁড়ি জলের তলায়।

আমি যখন গেলাম তখন গঙ্গার মূর্তি আরো ভয়াবহ। সব সিঁড়ি জলের তলায়। বেশী বৃষ্টি হলেই গঙ্গার জল রাস্তায় ওঠে। অসী ঘাটের দিকে বহু গলি বহু বাড়িতে গঙ্গার জল থৈ থৈ করছে। মাঝে মাঝে কলের জল আসছে না। অনেক সময় কল দিয়েও ভাল জল আসছে না। প্রায় প্রতি বাড়িতেই ডিসেন্ট্রি শুরু হয়েছে। পাটনা রওনা হবার দিন বার বার করে সারদা পিসী আর দেবীকে বললাম, জল না ফুটিয়ে খাবে না। আর দরকার হলে মিশ্রজীকে খবর দিও। প্রয়োজন হলে ওঁকে ট্রাংককল করে আমাকে খবর দিতে বলো।

দেবী হেসে বললো, বুড়োদের মত শুধু উপদেশ দিও না। তুমিও সাবধানে থেকো।

পাটনা এসে জানলাম মিঃ মুখার্জিকে আরো মাসখানেক নেপালে থাকতে হবে। উনি না থাকায় আমার কাজের চাপ আরো বাড়ল। এরই মধ্যে মিঃ মুখার্জির নির্দেশে রাঁচী ও মুঙ্গের ঘুরে এলাম। মুঙ্গের থেকে ফিরে আসার দিনই শুনলাম কাটমাণ্ডু থেকে মিঃ মুখার্জি ফোন করে অন্যান্য কথা বলার পর বলেছেন সোমবার সকালের প্লেনে আমাকে আবার কাটমাণ্ডু যেতে হবে। আমার টিকিট কাটাও হয়ে গেছে। কাশী থেকে ফেরার সপ্তাহখানেক পরে দেবীর চিঠি পেয়েছিলাম। তারপর আর কোন চিঠি পাই নি। তাই কাটমাণ্ডু রওনা হবার আগে শনিবার দেবীকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখলাম।

আটটায় এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে বলে পাঁচটায় এ্যালার্ম দিয়েছিলাম। এ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস মুখার্জি উপর থেকে নীচে নেমে এসে আমাকে বললেন, কে যেন বেল বাজালেন। বারান্দা থেকে একটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম, বোধহয় কেউ এসেছেন।

আমি দরজা খুলেই অবাক, তুমি!

দেবী জবাব দেবার আগেই আমাকে প্রণাম করল।

মিসেস মুখার্জি আমার পিছনে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে প্রদীপবাবু?

আমার স্ত্রী দেবী।

মিসেস মুখার্জি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এমন স্ত্রী ছেড়ে একলা একলা থাকেন কি করে?

ভানুদা ঠিকই বলেছিলেন। দেবী আমাকে পেল না। বাঙালীটোলায় কলেরা শুরু হবার পরও দেবী ঠিক ছিল কিন্তু সারদা পিসী কলেরায় মারা যাবার পর ও আর থাকতে পারল না। ভয়ে আতঙ্কে আমার কাছে পালিয়ে এলো।

আমি আটটার সময় এয়ারপোর্টে রওনা হয়ে গেলাম। মিসেস মুখার্জি বললেন, আমি যখন আছি তখন কোন চিন্তা নেই। তাছাড়া আপনি পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে ফিরে আসছেন।

আমি বললাম, তাই ত কথা আছে।

পরের দিন বিকেলেই মিঃ মুখার্জি আমার হাতে পাটনা ফেরার টিকিট দিতেই আমি অবাক। উনি একটু গম্ভীর হয়েই বললেন, প্রদীপবাবু, আজকে ফিরে যাবার প্লেন নেই। আপনি কালই চলে যান।

কেন স্যার?

মিঃ মুখার্জি হঠাৎ ব্যস্ততার ভাণ করে উঠে গেলেন।

দেবী যেমন আকস্মিকভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার জীবনে এসেছিল ঠিক তেমনভাবেই চলে গেল। যে সর্বনাশা রোগের ভয়ে ও কাশী থেকে পালিয়ে এল, সেই রোগেই ওকে চলে যেতে হলো।

পনের বছর আগেকার কথা। কিন্তু এখনও আমি বাঙালীটোলার গলিতে, গোধুলিয়ার মোড়ে, হরসুন্দরীর ধর্মশালায় ঘুরে বেড়াই। ওকে খুঁজি। পাই না। কোন দিন পাব না। দশাশ্বমেধ ঘাটে একা বসে বসে কাঁদি। দিল্লী ফিরে যাই, কলকাতা চলে যাই কিন্তু আবার আসি। বার বার আসি।

সেই ভোর পাঁচটায় ডিলাক্স এক্সপ্রেসে বেনারস ক্যান্টনমেণ্টে নেমেছি। সকাল দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। এখনও আমি ঘুরছি। না ঘুরে পারছি না। ভেবেছিলাম ঢুকব না, তবু হরসুন্দরী ধর্মশালায় ঢুকলাম। একতলার সেই কোণার ঘরে বসে কিছুক্ষণ কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতেই বললাম, মাগো তুমি নেই, পিসী নেই, দেবী নেই, আমি কাকে নিয়ে কিভাবে বাঁচব বলতে পারো? আমাকে কাছে টেনে নিতে পারছ না? আমাকে এভাবে দুঃখ দিতে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে না?

হঠাৎ কে যেন আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, কাঁদবেন না। এবার বাড়ি যান। সন্ধ্যে হয়ে এল।

আমি উঠলাম। আস্তে আস্তে ধীর পদক্ষেপে বাইরের রাস্তায় বেরুতেই চমকে উঠলাম।

প্রদীপদা, আপনি?

আলপনাকে দেখে আমিও অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এখানে?

আমি এখানেই থাকি। চাকরি করি।

তাই নাকি ? আপনার শ্বশুরবাড়ি এখানে ?

আলপনা শুধু বললো, না।

আপনার মা, কল্পনা…

মা বহুদিন মারা গিয়েছেন। কল্পনা সংসার করছে। এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কবে এখানে এসেছেন ?

আজ ভোর পাঁচটায়।

কোথায় উঠেছেন ?

আমি কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

খাওয়া-দাওয়াও নিশ্চয় হয় নি ?

আমি একথারও কোন জবাব দিলাম না।

চলুন আমার সঙ্গে।

কোথায় ?

আমার বাসায়।

না না আপনার শ্বশুরবাড়ি…

ভয় নেই। আমি বিয়ে করি নি।

বিয়ে করেন নি ?

ও একটু হাসল। কোন কথা বলল না।

আমি বললাম, এই পৃথিবীতে কিছু কীট-পতঙ্গ আছে, যারা শুধু অন্যকে দংশন করতেই জানে। আমিও ঠিক সেই রকম একটা…

আপনি কাউকেই দংশন করেন নি ; বরং আপনি নিজেই…। ও কথাটা শেষ না করেই বললো, যাক গে ওসব। আপনি চলুন।

কিন্তু…

আমার কাছে খাওয়া-দাওয়া করলে দেবীদির আত্মা কষ্ট পাবে না বরং শান্তি পাবে।

আমি আর কোন কথা না বলে ওর সঙ্গে রিকশায় চড়লাম।

শিবালয় তিনতলায় ছোট ছোট দু'খানা ঘর। বাথরুমে যাবার সময় ভিতরের ঘরে ওর টেবিলে দেবীর একটা ফটো চন্দন দিয়ে সাজান দেখে থমকে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ চুপ করে ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললাম, আপনাকে ও সত্যি খুব ভালবাসত।

আলপনা কিছু বলল না।

আপনি ত ওকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন তাই না ?

আমি লিখতাম কিন্তু নিয়মিত নয়। দেবীদি খুব রেগুলারলি চিঠি দিতেন।

ওর শেষ চিঠি কবে পেয়েছিলেন ?

দেবীদির মৃত্যুর দু'তিন দিন আগে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

কি লিখেছিল?

আলপনা কোন কথা না বলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে চিঠিটা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো, পড়ুন।

ভাই আলপনা, তোমাকে অনেক কথাই লিখি কিন্তু একটা জরুরী কথা লিখতেই সব সময় ভুলে যাই। সেই কথাটা লেখার জন্যই তোমাকে এই চিঠি লিখছি। তোমার প্রদীপদার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না, হতে পারে না কিন্তু আমার জীবিত অবস্থায় সে টোপর মাথায় দিয়ে তোমার গলায় মালা দেবে, তা আমি সহ্য করতে পারব না। তবে যদি কোনদিন আমি না থাকি তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ওর দায়িত্ব নেবে। এ দায়িত্ব আমি আর কাউকে দিয়ে মরবার পরও শান্তি পাব না। তোমার প্রদীপদা বড় দুঃখী, বড় নিঃসঙ্গ। জীবনে কোনদিন সুখ পেল না। আমিও ওকে সুখী করতে পারলাম না। আমার অবর্তমানে তুমি ওকে সুখী করবেই। করতেই হবে।

আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।